আল্লামা মনযুর নো'মানী

ইরাণী ইনকেলাব ইমাম খোমেনী ও শিয়া মতবাদ

ইরানী ইনকেলাব ইমাম খোমেনী ও শিয়া মতবাদ

মূল ঃ

আল্লামা মুহম্মদ মনযুর নো' মানী

অনুবাদ

মুহিউদ্দীন খান

ও

মাওলানা মুঃ আবদুল আজীজ

পরিবেশক

মদীনা পাবলিকেশন্স

৩৮/২ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০

ইরাণী ইনকেলাব

প্রকাশক ঃ
তালীমুল কোরআন সমিতি ঢাকা।

মুদ্রনে ঃ
মোস্তফা মঈনউদ্দীন খান
মদীনা প্রিন্টার্স
৩৮/২ বাংলা বাজার,
ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ বাইশ টাকা মাত্র

লখনৌস্থ দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামার প্রধান পরিচালক এবং বর্তমান আলমে-ইসলামের সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধেয় একজন আলেম আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী লিখিত

ভূমিকা

ইসলামের সূচনাকালীন আদর্শ যুগটির চিত্র কেমন ছিল? মহান প্রভুর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবীর (সাঃ) শিক্ষা-দীক্ষা বাস্তবে কতটুকু ফলপ্রসু হয়েছিল? স্বয়ং রসূল (সাঃ)-এর অতি কাছে অবস্থান করে যাঁরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছেন তাঁদের আচার-আচরণ কেমন ছিল? জাতীয়, বংশীয় বা গোত্রীয় রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা ও ক্ষমতা লিপ্সুদের সাথে তাঁদের আদৌ কোন গুণগত পার্থক্য ছিল কি-না? পরিবারের সদস্যদের সাথে চলা-ফেরায় এবং পরিবারের মহৎপ্রাণ ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে উপকৃত হতে তাঁরা কি পদ্ধতি অবলম্বন করতেন? দ্বীনের দাওয়াত, সত্য-ন্যায়ের প্রচার ও তাতে দৃঢ়পদ থাকার ব্যাপারে নবী পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কি পরিমাণ নিষ্ঠা পরিলক্ষিত হয়? প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণ ও নবী (সাঃ)-এর কাছে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সাহাবায়ে-কিরাম ও আহলে-বায়তগণের মধ্যে কি ধরণের পারস্পরিক সৌহার্দ্যভাব বজায় ছিল? খোলাফায়ে-রাশিদিন— যাঁদের হাতে ঐ আদর্শিক যুগের শাসন ক্ষমতার চাবিকাঠি ছিল— আরাম-আয়েশ ও বিলাস সামগ্রীর প্রাচুর্য এবং অসীম কর্তৃত্বের অধিকারী হওয়া সত্বেও তাঁদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন প্রবাহ এবং বিশাল সাম্রাজ্যে খোদার সৃষ্টিকুলের সাথে তাঁদের ব্যবহার, নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্যাবলীর আলোকে কতদূর প্রমাণিত হয়? যে আসমানী কিতাবের ওপর গোটা দ্বীন-ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, তার সত্যতা, নির্ভরযোগ্যতা এবং সেটি সংরক্ষনের জন্য যে সব প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়েছে, সেগুলো কতটুকু ভেজালমুক্ত— এ সমস্ত জিজ্ঞাসার মোকাবেলায় আমাদের সামনে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী দু'টি চিত্র ফুটে উঠে। এক— যা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আক্বীদা-বিশ্বাসের আলোকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা হয়েছে। আর দ্বিতীয় চিত্রটি শিয়া ইমামিয়া ইসনা আশারিয়া (দ্বাদশ ইমামে বিশ্বাসী) সম্প্রদায়ের আক্বীদা-বিশ্বাস, বর্ণনা-বিবৃতি, ইসলাম ও ইসলামী ইতিহাসের পছন্দমত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং তাদের বিশেষ ধরণের আন্দায-অনুমানের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। এ চিত্র দু'টির মাঝে কোন প্রকার সামঞ্জস্যই দৃষ্টিগোচর হয় না।

সমগ্র বিশ্বের জন্যে রহমত ও হেদায়াতরূপে অবতারিত দ্বীন ইসলামের ক্ষেত্রে কোন চিত্রটি যথাযোগ্য ও গ্রহণীয় তা নির্ণয়ে সুষ্ঠু বিবেকসম্পন্ন ও মানব ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন ব্যক্তি মাত্রেরই বিন্দুমাত্র কষ্ট হবে না। যে দ্বীনের আবেদন কালজয়ী, যে দ্বীন সর্বযুগেই সমান ফলদায়ক, যে দ্বীন এ বিশ্বাসের ঘোষণা প্রদান করে যে, এ দ্বীন আনয়নকারী পয়গম্বর (সাঃ) স্বীয় জীবদ্দশাতেই একে পূর্ণত্বে পৌঁছিয়েছিলেন এবং এ দ্বীন ও দাওয়াত তাঁর (সাঃ) যুগেই সর্বাপেক্ষা বেশী প্রাণবন্ত ও ফলপ্রসু হয়েছিল (প্রমাণ এবং যুক্তিও তা-ই বলে) সে দ্বীনের

চাইতে শ্রেয়তর আর কোন রূপটি আছে যাকে অবলম্বন করে দুনিয়ার তাবৎ মানব জাতি ধন্য হবে। ভোগ-বিলাসপূর্ণ জীবন প্রণালী, ব্যক্তিগত ও জাতীয় স্বার্থে যুদ্ধবিগ্রহ, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার উদগ্র লালসা এবং ক্ষমতা হাতে পেয়ে তার অপব্যবহার তথা স্বজনপ্রীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার মত ঘৃণ্য ইতিহাস নিঃসন্দেহে এ পবিত্র দ্বীনের ইতিহাস হতে পারে না। ইসলামের প্রাথমিক যুগে শুধু ব্যক্তি নয় বরং গোটা সমাজ, সভ্যতা, রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও জীবন পদ্ধতি উন্নত মূল্যবোধ, নিষ্কলুষ নীতি-আদর্শ এবং মানব কল্যাণের উপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তা ছিল ন্যায়-নিষ্ঠ খলিফা হযরত উমর ইবনে অবদুল আযীযের উক্তির যথার্থ প্রতিচ্ছবি। তিনি বলেন— হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পথ প্রদর্শকরূপে প্রেরীত হয়েছিলেন; খাজনা সংগ্রাহকরূপে নয়। (কিতাবুল খেরাজ— ইমাম আবু ইউসুফ)

পক্ষান্তরে শিয়া ইমামিয়াদের আক্বীদা ও বর্ণনার আলোকে প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের যে বিকৃতি ছবি আমাদের সামনে ভেসে উঠে, তার পরিপ্রেক্ষিতে যে কোন শিক্ষিত বিবেকবান লোকের পক্ষ থেকে এ প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, ইসলামের উত্থান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ দাওয়াতদানকারীও যখন এর দাওয়াতকে সুদূরপ্রসারী, সুদৃঢ় ও সুশৃংখল করে যেতে পারেননি; রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পরলোকগমনের পর তাঁর দাওয়াতে ঈমান গ্রহণকারী কেউ যখন ইসলাম রক্ষার্থে এগিয়ে আসলেন না এবং রসূল (সাঃ)-এর অনুসারীদের মধ্য থেকে মাত্র চারজন ছাড়া অন্য কেউ যখন তাঁর প্রদর্শিত সিরাতুল মুস্তাকিন দৃঢ়পদ থাকলেন না; তখন আমরা কিভাবে বুঝবো যে এ দ্বীন ও দাওয়াতের মানবাত্মাকে পবিত্রকরণ ও চরিত্র সংশোধনের যোগ্যতা রয়েছে। মানুষকে পাশবিক স্তর থেকে মানবতার চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছে দিতে এ দ্বীন সক্ষম?

ধরুন, পাশ্চাত্যের কোন দেশ কিংবা অমুসলিম কোন দেশের জাতীয় সভায় ইসলামের কোন দূত ইসলামের সত্যতার উপর মর্মস্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করছেন; এমন সময় ইসনা আশারীয়দের বই-পুস্তক পাঠকারী এক লোক দাঁড়িয়ে বক্তাকে উদ্দেশ্য করে বললো, জনাব, র্পথমে নিজের ঘরের খবর নিন, আপনাদের নবী দীর্ঘ তেইশ বছর প্রাণান্ত পরিশ্রম করে মাত্র চার/পাঁচজন লোক তৈরী করতে পেরেছিলেন, যারাই কেবল তার ইন্তেকালের পরও তাঁর প্রদর্শিত নীতিতে দৃঢ়পদ ছিলেন; নিজেদের এই অবস্থা সত্ত্বেও কোন মুখে বিধর্মীদেরে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছেন? এরাও যে সময়ে সুযোগে ধর্মত্যাগ করবে না তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? — এ সব প্রশ্নের জবাব দেওয়া কি সম্ভব?

বিগত বছরগুলোতে আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনী সাহেবের ইসলামী বিপ্লবের ডাক এবং পাহলবী রাজবংশের উৎখাত সাধন করে তথাকথিত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ধরণ দেখে মনে হচ্ছিল তিনি তাঁর দাওয়াতকে সার্বজনীন ও সর্বজনগ্রাহ্য করার লক্ষ্যে বহুকাল ধরে ধারাবাহিকভাবে চলে আসা শীয়া-সুন্নী বিরোধ সম্পর্কিত ইতিহাসের বিতর্কিত পাতাটি খুলতে যাবেন না, সেই বিতর্কিত অধ্যায় বই থেকে মুছে ফেলতে না পারলেও তা খোলার দুঃসাহস করবেন না এবং কোন রাজনৈতিক বা অবস্থানগত স্বার্থের কারণে ইমামিয়া সম্প্রদায়ের আক্বীদা-বিশ্বাস পরিত্যাগ করার ঘোষণা প্রদান করতে না পারলেও অন্ততঃ সেগুলির প্রচারকার্য থেকে বিরত থাকবেন। বরং সামরিক শক্তি ও রাষ্ট্রব্যবস্থার দিকদিয়ে বিশ্ববিশ্রুত পাহলবী

রাজবংশকে যিনি তার অনলবর্ষী বাগ্মিতা ও নির্ভিক নেতৃত্বের মাধ্যমে ধূলিস্যাত করতে সক্ষম হয়েছেন, এমন একজন বিরাট নেতার কাছে এটাই আশা ছিল যে, তিনি চারিত্রিক দৃঢ়তা ও মুসলিম ঐক্যের জন্য স্বীয় গভীর চিন্তা-গবেষণার ভিত্তিতে জনসমক্ষে ঘোষণা করবেন— যে সমস্ত আক্বীদা-বিশ্বাস ইসলামের ভিত্তিমূলে কুঠারাঘাত হানে, যা জগতবাসীর সামনে ইসলামের সুউচ্চভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করে, যা বিধর্মীদেরে দাওয়াত দেওয়ার পথে পাহাড়সম বাঁধার সৃষ্টি করে, যা প্রাথমিক কালে সাহাবায়ে-কেরামের যুগের ইসলামের এক ঘৃণিত ধূর্ত শত্রুর সুপরিকল্পিত চক্রান্তের ফসল। বর্তমানে সে সব অলীক বিশ্বাসের কোন প্রয়োজন নেই, নেই কোন অবকাশ। ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা, ইসলামী দেশসমূহের সংস্কার এবং মুসলিম সমাজ থেকে ফিতনা-ফাসাদের উচ্ছেদকল্পে আজ আমাদেরকে অতীতের বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে নতুনভাবে যাত্রা শুরু করতে হবে, যাতে করে ইসলামের অতীত ও বর্তমানের উজ্জ্বল প্রতিকৃতি দুনিয়াবাসীর সামনে উদ্ভাসিত হবে, আর এভাবেই কেবলমাত্র এ যুগের বিধর্মীগণ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবে।

কিন্তু সকল আশা-আকাংখা ও ইশারা-ইঙ্গিতকে ভূলুণ্ঠিত করে তার লেখনীতে কেবল সে সকল নিবন্ধ ও বই-পুস্তকই স্থান পেয়েছে, যেগুলোতে তিনি স্পষ্টভাষায় ও জোর গলায় শিয়া ধর্ম বিশ্বাসই কেবলমাত্র প্রকাশ করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর লিখিত আল-হুকুমাতুল ইসলামিয়া (বেলায়াতুল ফকীহ) গ্রন্থে ইমামত ও ইমামগণ সম্পর্কে এমন ধারণা পেশ করা হয়েছে যার ফলে ইমামগণ ঐশী মর্যাদায় উপনীত হয়েছেন এবং তাঁরা নবী-রসূল ও ফেরেশতাগণের চাইতেও উচ্চ সম্মানে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, এমনকি গোটা জগতটাই সৃষ্টিগতভাবে তাঁদের অনুগত ও এখতিয়ারাধীন প্রতিপন্ন হয়েছে। (পৃঃ ৫২)

তেমনিভাবে ফারসী ভাষায় লিখিত কাশফুল আসরার গ্রন্থে সাহাবায়ে কিরাম বিশেষতঃ প্রথম তিন খলিফা সম্পর্কে শুধু কটাক্ষ ও সমালোচনাই নয়, বরং গালিগালাজের এমন সব ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে যে, কোন মস্তবড় ভ্রান্ত পথভ্রষ্টকারী, ফাসিক-ফাজির ও দুষ্কৃতকারীর বেলায়ই তা প্রয়োগ করা চলে। (পৃঃ ১১৩—১১৪) এ দু'টি বিষয়ই তাদের দাওয়াতের অঙ্গীভূত। তাও কোন গোপন পরামর্শ বা ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের আকারে নয়, বরং পুস্তকাকারে ছাপিয়েই তা প্রকাশ ও প্রচার করা হয়।

ইমামগণ ও ইমামত সম্পর্কিত ভ্রান্ত বিশ্বাস এবং সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ)কে কটাক্ষ বিদ্রুপ করা— এ দু'টি বিষয় খোমেনী সাহেবের কোন লুকানো ছাপানো ক্রিয়াকলাপ বা ধ্যান-ধারণা নয়। তাঁর উপরোল্লিখিত পুস্তকদ্বয়ের লক্ষ লক্ষ কপি ইরান এবং ইরানের বাইরে সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ণ আশা ছিল, ঈমান-আক্বীদা ও মৌলভিত্তিক এই মতবিরোধ, উম্মতে মুসলিমার মৌলবিশ্বাস তৌহীদকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, নবুওয়তে অংশীদারিত্ব (যা ইমামতের সংজ্ঞা এবং ইমামের বৈশিষ্ট্যাবলীর যুক্তিনিঃসৃত ফল) এবং মুসলিম মন-মানসে সম্মান ও ভালবাসা পাবার যোগ্যতায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পরেই যাঁদের অবস্থান, ইসলামী তথা মানব ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য সূত্রসমূহের আলোকে, অখ্যাত-প্রখ্যাত সকল ঐতিহাসিকের সম্মিলিত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে যাঁদের শাসনকাল ছিল জগতে আদর্শস্থানীয় ও অনুকরণীয়, সাহাবায়ে কিরামের সেই মহান ব্যক্তিবর্গের উপর অহেতুক অপবাদ ও

সমালোচনার বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার পরে অন্তত মুসলিম সংখ্যাগুরু সুন্নীদের কাছে খোমেনীর দাওয়াত ঠাঁই পাবে না এবং অন্তত তারা তাকে ইসলামী বিপ্লবের ধ্বজাধারী, ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ও আদর্শ নেতারূপে আখ্যায়িত করবেন না। কিন্তু বড়ই পরিতাপ ও বিস্ময়ের ব্যাপার যে, ইসলামী গবেষণার পতাকাবাহী এবং ইসলামের বিজয় উত্থানে প্রতিষ্ঠিত আশাবাদী কোন কোন দল ও গোষ্ঠী তাকে ইমামের আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন এবং তার উপর প্রগাঢ় আস্থা ও শ্রদ্ধা সামান্যতম সমালোচনার প্রতিও তাদেরকে চরম অসহিষ্ণু করে তুলেছে।

উপরোক্ত অভিজ্ঞতা ও আলোচনা থেকে দু'টি বিষয় স্পষ্ট হয়ে গেছে—

এক— বর্তমান যামানার অনেক অশুভচক্র কোরআন-হাদীস, পূর্ববর্তী মনীষীদের মতাদর্শ এবং আক্বীদা ও আদর্শের বিশুদ্ধতাকে প্রশংসা, দোষারোপ ও সমালোচনার মানদণ্ডরূপে বিবেচনা করে না। বরং ইসলামের নাম নিয়ে যে কোন একটা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, ক্ষমতা দখল, কোন পাশ্চাত্য শক্তিকে হুমকী প্রদান কিংবা তাকে বেকায়দায় ফেলাটাই প্রিয় ও আদর্শ নেতা হিসাবে বিবেচিত হওয়ার মানদণ্ড বলে গণ্য করা হয়ে থাকে।

দুই— আমাদের নব্য শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর কাছে আক্বীদার গুরুত্ব আশংকাজনকভাবে হ্রাস পেতে শুরু করেছে, এটা অত্যন্ত উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। নবী-রসূল ও অন্যান্যদের দাওয়াত এবং তাদের চেষ্টা-চরিত্রের উদ্দেশ্যে ও চেতনায় এই আক্বীদা-বিশ্বাসই ছিল সর্বপ্রধান পার্থক্য নির্দ্ধারণী প্রাচীর, যাকে অতিক্রম করে যে কোন ধরনের অপোষ রফায় তাঁরা কখনো সম্মত হননি। তাদের কাছে কোন কিছু গ্রহণীয়-পরিত্যাজ্য বা পছন্দনীয়-অপছন্দনীয় হওয়ার মানদণ্ড এবং মিল-অমিলের প্রধান শর্তই ছিল এই আক্বীদা। মুসলমানদের সীমাহীন দুর্বলতা সত্ত্বেও এই আক্বীদাগত দৃঢ়তা, স্থিরতা এবং লজ্জা ও সম্মানবোধের কারণেই ইসলাম আজ পর্যন্ত তার প্রকৃতরূপে বিদ্যমান রয়েছে। দ্বীনের ধারকবাহকগণ এ ব্যাপারে কোন পরাশক্তি বা বিশাল রাজদণ্ডের সামনে নতি স্বীকার করেননি এবং তাদের কোন ভ্রান্ত বিশ্বাস বা দাবীর সামনে নীরবতা পালনকে বৈধজ্ঞান করেননি; মুসলমানদের পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের এবং মত বিরোধ ও বিচ্ছিন্নতা থেকে আত্মরক্ষার লোভে কিংবা হাওয়ার তালে তাল মিলিয়ে তা গ্রহণ করে নেওয়া তো অনেক পরের কথা। খালকে কোরআন সংক্রান্ত আক্বীদার প্রশ্নে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (মৃত্যুঃ ২৪১হিঃ)-এর মত মহামনীষী শুধু মুসলমানদেরই নয় বরং বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দুর্দণ্ড প্রতাপ দু'জন সম্রাট খলিফা মামুনুর রশীদ ও তৎপুত্র মু'তাসিম বিল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন এবং পরিণামে তাঁকে অসংখ্য বেত্রাঘাত ও জেল-জুলুম সহ্য করতে হয়েছিল। সম্রাট আকবরের ইমামত ও ইজতেহাদের দাবী এবং দ্বীনে এলাহীর আক্বীদার বিরোধীতা করেন হযরত মোজাদ্দিদে আলফে-সানী শেখ আহমদ ফারুকী (রহঃ মৃত্যুঃ ১০৩৪হিঃ)। পরবর্তীকালে সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে মোঘল শাসনের ধারা পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি তার আন্দোলন চালিয়ে গেছেন। এখানে মাত্র দু'টি উদাহরণ পেশ করা হলো। তাছাড়াও 'অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্যভাষণ' এবং 'স্রষ্টার বিরোধীতা করে সৃষ্টির আনুগত্য করা চলবে না' প্রভৃতি নীতিবাক্যের

অসংখ্য জ্বলন্ত প্রমাণ ইসলামী ইতিহাসে রয়েছে। ব্যক্তি বাদশা, জনমত, প্রথা, বিভ্রান্তিকর সাফল্য এবং উচ্চৈস্বরের দাবী প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এক একটি অত্যাচারী শাসকের রূপ পরিগ্রহ করে। ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয়, সাময়িক সাফল্য ও জোরগলার দাবী যখন অত্যাচারী শাসকের আনুকূল্য করে তখনকার পরীক্ষাই সবচেয়ে জটিল।

ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও বিশুদ্ধ আক্বীদাকে আদপে এমন একটি অন্তহীন স্রোতস্বীনী নদীর সাথে তুলনা করা চলে, যার গতিপথ কখনো পরিবর্তিত হয় না। রাজনৈতিক শক্তি, সাময়িক বিপ্লব, রাষ্ট্রের উত্থান-পতন এবং দাওয়াত ও আন্দোলন জোয়ার-ভাটার সাথে তুলনীয়। নদীর গতি পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত জোয়ার ভাটাতে কোন বিপদাশংকা নেই। কিন্তু আক্বীদারূপ নদী যখন তার আসল গতিধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে তখন জোয়ার ময়লাযুক্ত ও কর্দমাক্ত পানি ছাড়া আর কি বয়ে আনবে। কাজেই আক্বীদাগত ভ্রান্তি ও বক্রতা থাকলে কোন দাওয়াত-আন্দোলন, কোন দেশের উন্নতি-অগ্রগতি, কোন সমাজের আংশিক সংশোধন অথবা কোন অনিয়ম-বিশৃংখলা দূরীকরণের দাবী ও প্রতিজ্ঞা কোনটাই গ্রহণযোগ্য নয়। মিল্লাতে মুসলিমার স্থায়িত্ব এবং দ্বীন ইসলামের হেফাযত এই আক্বীদার উপরই নির্ভর করে। এরই জন্যে যুগে যুগে দ্বীনের খাদিম আলিম সম্প্রদায় কঠোর ভূমিকা পালন করতে বাধ্য হয়েছেন।

'ইরানী ইনকেলাব, ইমাম খোমেনী ও শিয়ামতবাদ বইখানি সেই ধারারই একজন সংগ্রামী লেখক শ্রদ্ধেয় মাওলানা মুহাম্মদ মনযুর নো'মানী সাহেবের উচ্চ স্তরের চিন্তাধারা ও গবেষণার ফসল। শ্রদ্ধেয় মাওলানা এককালে অন্যতম দার্শনিক এবং ইসলাম ও আহলে সুন্নতের বিশিষ্ট মুখপাত্রের ভূমিকা পালন করেন। তাঁর ঐ সময়কার লিখিত অনেক বইপত্রও রয়েছে। তবে অনেক দিন যাবত তিনি তর্ক ও সমালোচনা বিষয়ক লেখালেখি প্রায় ছেড়ে দিয়ে কেবল দাওয়াতী ও সংস্কারমূলক বিষয়াদির প্রতি মনোনিবেশ করেন। 'আল-ফুরকান' পত্রিকার মুজাদ্দিদে আলফে সানী সংখ্যা, শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ সংখ্যা এবং 'ইসলাম কি ?' 'দ্বীন ও শরীয়ত', 'কোরআন কি বলে', ও 'মা' আরেফুল হাদীসে'র মত বিজ্ঞনোচিত ও নির্ভরযোগ্য বইপুস্তকের নাম এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এসকল গ্রন্থাবলী উপমহাদেশীয় এবং এগুলির ইংরেজী অনুবাদ সারা দুনিয়া বিশেষ করে আমেরিকা, ইউরোপ ও আফ্রিকার লাখকোটি মানুষকে ইসলাম উপলব্ধির ও ধর্মীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ব্যাপকভাবে সহায়তা করেছে। আহলে সুন্নতের ইমাম হযরত মাওলানা আবদুশ শাকূর ফারুকী সাহেবের সাথে তাঁর একান্ত ঘনিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও তিনি শিয়াতন্ত্র সম্পর্কে ইতিপূর্বে তেমন কিছু লিখেননি। কিন্তু, বয়স ও স্বাস্থ্য যখন অবসর যাপনের আহবান জানাচ্ছিল, রায়পুর খানকাহ্ থেকে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ ও উদ্দীপনায় যখন আল্লাহ্র যিকর-আযকার, কোরআন তেলাওয়াত ও আখেরাতের চিন্তায় তিনি মগ্ন, ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি লক্ষ্য করলেন, একদিকে ইরানের সম্রাট রেজা শাহ্ পাহ্লভীর শাসনের মোকাবেলায় আয়াতুল্লাহ্ খোমেনীর বিজয়, ইরানী সমাজ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়নকারী আন্দোলন, কোন কোন ক্ষেত্রে বৃহত্তম পরাশক্তি আমেরিকার ব্যর্থতা, ইরানী যুবকদের আত্মত্যাগী মনোভাব এবং অপরদিকে অপরাপর মুসলিম ও আরব রাষ্ট্রসমূহের ধর্মীয় ও চারিত্রিক দুর্বলতা, সেখানকার অবাঞ্ছিত সামাজিক অবস্থা ইত্যাদি কারণে উপমহাদেশের

ঘুমন্ত ইসলামী উদ্দীপনার ধারক ও পরিবেশের চাপে চরম হতাশাগ্রস্ত যুব সমাজের কাছে খোমেনী সাহেব যেন আধুনিকতাবাদীদের কামাল আতাতুর্ক বা আরব জাতীয়তাবাদীদের জামাল আবদুন্ নাসের-এর স্থান দখল করে বসেছেন। বর্তমানেও কোন কোন জনগোষ্ঠীতে এমনসব রাষ্ট্রনেতারা জনগণের আস্থা ও ভালবাসা অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছেন যারা স্পষ্টভাবে সুন্নত অস্বীকারকারী, হাদীসকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপকারী, পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রচলনকারী এবং সর্বোপরি কমিউনিস্ট ভাবধারার প্রচারক। খোমেনী সাহেবের আন্দোলনে ধর্মীয় রং-রূপ মিশ্রিত হওয়ায় তাঁর জনপ্রিয়তা বরং তাদেরকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। খোমেনী সাহেবের প্রতি আস্থাশীল চক্র এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, কেউ আকীদার প্রশ্ন উত্থাপন করে কুরআন-হাদীস ও ইজমায়ে উম্মতের দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করলে বা ঐ মানদণ্ডে বিবেচনা করার চেষ্টা করলে তা তাদের কাছে শ্রুতিকটু মনে হয়, এমনকি মাঝে মধ্যে তারা রোষানলে জ্বলে উঠেন। দ্বীনের ভবিষ্যত এবং ইসলামের প্রাণশক্তির জন্য এ পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক যা আমাদেরে স্মরণ করিয়ে দেয় হযরত আলীর (কাঃ) মুখনিঃসৃত করুণ ভবিষ্যদ্বানী— 'উচ্চকণ্ঠে বক্তার দল ভারী',— এ পরিস্থিতি যেন তাঁর বাণীর একটি বাস্তব প্রতিচ্ছবি।

উপলব্ধ পরিস্থিতি তার (মাওঃ নো'মানী) দুর্বল ও রুগ্ন দেহে এক নবচেতনা শক্তি এবং চিন্তা-গবেষণার ক্ষেত্রে এক নতুন যোগ্যতা সৃষ্টি করলেন যে ইতিমধ্যে কয়েক বারই তার শারীরিক অবস্থা আশংকাজনকভাবে খারাপ হয়েছিল, এসময় তার আত্মীয়-স্বজনকে তাঁর জন্য চিন্তান্বিত হতে হয়েছিল। কিন্তু মাওলানার গভীর মনোযোগ ও সারা জীবনের অভ্যাস তাঁকে এ থেকে বিরত হতে দেয়নি। শিয়াদের তাকিয়্যা নীতির ফলে অল্প প্রকাশিত অথচ তাদের কাছে নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি ছাড়াও শিয়াদের ইতিহাস সম্পর্কিত আরো অনেক বই-পুস্তক তিনি আগাগোড়া অধ্যয়ন করেছেন। এতদ্ব্যতীত আল্লাহ্র অনুগ্রহে তিনি আরো কিছু নতুন উৎসেরও সন্ধান পেয়ে যান। আল্লামা নূরী তাবিরযীর 'ফাসলুল খিতাব ফী ইসবাতি তাহ্রীফি কিতাবি রাব্বিল আরবাব' এবং আল্লামা খোমেনীর 'কাশফুল আসরার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তিনি অত্যন্ত ধৈর্য ও পরিশ্রম সহকারে এসমস্ত বই-পুস্তক অধ্যয়ন করে উপাদান সংগ্রহ করেছেন। অতঃপর শিয়াদের আপত্তিকর পন্থা সম্পর্কে ব্যাপক ঐতিহাসিক ও যুক্তিভিত্তিক পর্যালোচনা করে তিনি এই গ্রন্থখানি রচনা করেছেন। এই গ্রন্থে শিয়া মতবাদের প্রামাণ্য ইতিহাস, তাদের আকীদা-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার স্বচ্ছ প্রতিচ্ছবি, সেসব বিশ্বাসের জ্ঞানগর্ভ ও যৌক্তিক বিশ্লেষণ, তার ফলশ্রুতি নির্ণয়, কুরআন-সুন্নাহ ও প্রামাণ্য ইতিহাসের সাথে তার তুলনা এবং ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের উপর এর প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। বিশেষ করে ইমামত্ ও কুরআন বিকৃতি সম্পর্কে শিয়াদের গ্রন্থাদির আলোকে এবং তাদেরই উদ্ধৃতি সহকারে এতবেশী পরিমাণ উপাদান সংগৃহীত হয়েছে যা খুব কম বই-পুস্তকেই দেখা যায়। একই সাথে ইসনা আশারিয়া মতাবলম্বীদের আরো বহু বিশ্লেষণযোগ্য ধ্যান-ধারণার উপর আলোকপাত করা হয়েছে যা ইমামত সংক্রান্ত বিশ্বাস ও কুরআন বিকৃতির অতিস্বাভাবিক ফলশ্রুতি।

এমনিভাবে গ্রন্থখানি আলোচ্য বিষয়ের একটি অতি মূল্যবান চিন্তার খোরাকে পরিণত হয়েছে, যা অধ্যয়ন করে যে কোন বিবেকসম্পন্ন পাঠক শিয়াতন্ত্রের তাৎপর্য, ইমামত ও কুরআন বিকৃতি সম্পর্কিত বিশ্বাসের ভীতিপ্রদ ফলাফল এবং ইসলাম ও প্রাথমিককালের মুসলমানদের উপর বিপদজনক অনাস্থার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন। অবশ্য এ সমস্ত ভ্রান্ত বিশ্বাসসমূহ কেবল অবিজ্ঞ তথা অপ্রতুল জ্ঞানের অধিকারী মুসলমান এবং বিধর্মীদের মাঝেই প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হবে।

আসলে এ গ্রন্থটির কোন ভূমিকা বা উপক্রমণিকার দরকার ছিল না। তবে মাওলানা (গ্রন্থকার) সাহেব আমাকেও এই গৌরবে শরীক করতে চেয়েছেন, তাই এর অবতারণা। এতে একটা উপকার হয়ে গেছে, আল্লাহ্ তাআলা আমাকে আলোচ্য বিষয়টি নতুন করে পর্যালোচনা করার এবং এ বিষয়ে নিজস্ব চিন্তাধারা ও মতামত প্রকাশ করার সামর্থ দান করেছেন। যার ফলস্বরূপ "দ্বীন ইসলাম ও প্রারম্ভিককালের মুসলমানদের দুইটি ভিন্নমুখী ছবি, আহলে সুন্নাহ ও ইসনা আশরিয়া সম্প্রদায়ের তুলনামূলক পর্যালোচনা' নামক একখানা স্বতন্ত্র পুস্তিকা প্রণীত হয়ে গেছে।

এ গ্রন্থ যেন দৃষ্টি উন্মোচক ও জ্ঞান-বুদ্ধি সম্প্রসারক হয় এবং এর দ্বারা যেন দ্বীন-ঈমানের উপকার অর্জিত হয় আল্লাহ্ তাআলার কাছে এই মোনাজাত করি। সর্বশেষে আশা করবো, কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত দোআ দুইটির উদ্দেশ্য এর দ্বারা সফল হবে।

'হে আমাদের পালন কর্তা! আমাদেরে হেদায়েত দানের পর আমাদের অন্তঃকরণসমূহে বক্রতা সৃষ্টি করো না এবং তোমার সান্নিধ্য থেকে আমাদেরে অনুগ্রহ প্রদান কর; তুমি তো মহাদাতা।' আলেইমরান-৮।

'হে প্রভু! আমাদের ও আমাদের পূর্ববর্তী ঈমানদার ভাইদের পাপ ক্ষমা কর এবং আমাদের অন্তরে মুমিনদের প্রতি বিদ্বেষভাব সৃষ্টি করো না। হে প্রভু! তুমি তো মহানুভব, দয়ার্দ্র।' —হাশর-১০।

—আবুল হাসান আলী নদভী

৭ সফর, ১৪০৫ হিঃ ২ নভেঃ ১৯৮৪ ইং

অনুবাদকের আরজ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদিগকে আলো-অন্ধকার এবং কুফরী ও গোমরাহীর মধ্যে পার্থক্য করার মত স্বচ্ছ বিবেক এবং ঈমানী আলো দান করেছেন। দরূদ ও সালাম তাঁর সর্বশেষ বাণীবাহক মুহাম্মদ আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি।

মুসলিম সমাজে প্রচলিত হানাফী শাফেয়ী আহলেহাদীছ প্রভৃতি ফেকাহ ভিত্তিক বিভিন্ন দল-উপদলের মতই শিয়ামতবাদও মুসলিম সমাজের মধ্যকার একটি ফেরকা বলে অনেকের ধারণা। শিয়ামতবাদের মূল কেন্দ্রভূমি ইরান থেকে অবস্থানগত দূরত্ব এবং ভিন্ন ভাষায় রচিত ওদের তাত্বিক বই-পুস্তকের দুষ্প্রাপ্যতা ও এরূপ ধারণা সৃষ্টির কারণ। বস্তুতঃ শিয়ামতবাদটি যে সাহাবায়েকেরামের যুগ সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই ইসলামের একটি মারাত্মক বৈরী শক্তিরূপে গড়ে উঠেছিল এবং যুগে যুগেই যে এরা মুসলিম উম্মাহর সামনে একটা মারাত্মক বিভ্রান্তিরূপে চলে আসছে, এ বাস্তব সত্যটুকু এ দেশের অনেকেই জানেন না!

সাম্প্রতিক কালে ইরানের আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনীর নেতৃত্বে সূচিত রাষ্ট্র-বিপ্লবের পর থেকে সমগ্র আলমে-ইসলামেই একটা ইতিবাচক কৌতুহল সৃষ্টি হয়ে গেছে। অনেকেই মনে করতে শুরু করেছেন যে, ইরানের এ বিপ্লব বোধ হয় মুসলিম-উম্মাহর হৃদয়কন্দরে লালিত ইসলামী পুনরুত্থান প্রয়াসেরই একটা শুভ সূচনা! বিশেষতঃ ইরানের বর্তমান বিপ্লবী সরকারের উদ্যোগে পরিচালিত বিপ্লব-রফতানী প্রক্রিয়ার অধীন প্রচার প্রপাগাণ্ডার সয়লাবের মধ্যে অনেকের পক্ষেই ইরানী বিপ্লবের প্রকৃত স্বরূপ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে যাচাই করে দেখার মতও ফুরসত হচ্ছে না!

আসলে ইরানের এ বিপ্লব যে নির্ভেজাল শিয়া বিপ্লব এবং বিপ্লবের প্রধান নেতৃপুরুষ আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনী যে, দ্বাদশ ইমামপন্থী শিয়ামতবাদেরই একজন বলিষ্ঠ অনুসারী ও প্রবক্তা এ তথ্য অনেকের দৃষ্টি থেকেই আজ পর্যন্ত থাকতে ও অগণিত হাফেজের ছিনায় সু-সংরক্ষিত হয়ে আসছে। আড়াল হয়ে রয়েছে।

দ্বাদশ ইমামপন্থী শিয়া মতবাদ কি এবং ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের সাথে এর মিল বা অমিল কতটুকু সে আলোচনা অত্যন্ত দীর্ঘ এবং হযরত আল্লামা মুহাম্মদ মনসুর নোমানীর এ বইটিতে সে সম্পর্কিত আলোচনা রয়েছে।

শিয়া মতবাদ সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য নাজানার কারণে এদেশে যাঁরা "শিয়া-সুন্নী-ভাই ভাই" ধরনের মুখরোচক শ্লোগানে প্রভাবিত হয়েছেন কিংবা ইরানী বিপ্লবের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে যথার্থভাবে অবহিত হতে চান, আমরা তাঁদের জন্যই এ বইটি অনুবাদ করে প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছি।

মুসলমানদের স্থির বিশ্বাস, আল্লাহর কালাম পবিত্র কোরআন সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় দুনিয়াতে রয়েছে। লিখন-সাগগ্রীতে গ্রন্থবদ্ধ হওয়ার আগ থাকতেও অনগণিত হাফেজের ছিনায় সু-সংরক্ষিত হয়ে আসছে। কারোপক্ষে আজ পর্যন্ত এ পবিত্র গ্রন্থের একটি নোক্তাও পরিবর্তন করা সম্ভবপর হয়নি। কিন্তু শিয়া তাত্বিকেরা প্রচার করে এবং তাদের আকীদা-বিশ্বাসের মূল

ভিত্তিই হচ্ছে এই যে, আসল কোরআন একমাত্র তাদের তথাকথিত নিস্পাপ ইমামদের কাছেই রয়েছে, যা বর্তমানে গ্রন্থবদ্ধ কোরআনের চাইতে অনেক বড়। অনেকটা বিভ্রান্ত বাউলপন্থীদের "ষাট হাজার কালাম বাতেনে" থাকার আকীদার মত ব্যাপার! মনে হয়, দুটি মতবাদই যেন পরস্পর একটা গোপন সূত্রে বাঁধা।

শুধু পবিত্র কোরআনই নয়, প্রথম তিন খলীফা, সাহাবায়েকেরামের পবিত্র জামাত এবং উম্মত জননী রসূলে খোদার পবিত্রাত্মা সহধর্মিনীগণ সম্পর্কে এরা যেসব জঘন্য প্রচারনার পুরীষ উদগীরণ করে আসছে, ঈমানের সামান্যতম আলো যাদের অন্তরে রয়েছে, তাঁদের পক্ষে এসব ঘৃন্য প্রচারণা বরদাশত করা সম্ভবপর নয়।

প্রশ্ন হচ্ছে, আয়াতুল্লাহ খোমেনীর সাম্প্রতিক বিপ্লবের সাথে ইসলামী আকীদা বিরোধী সেসব মতবাদের সম্পর্ক কতটুকু? প্রচারণার ময়দানে তো এরা "শিয়া-সুন্নী ভাই ভাই" বলে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলছে! আর ওদের নিকট-সম্পর্ক থেকে যাঁরা দূরে আছেন, তাদের অনেকেই সেসব প্রচারণায় মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন!

উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম হযরত আল্লামা মুহাম্মদ মনযূর মোমানী এ বৃদ্ধ বয়সে বহু শ্রম স্বীকার করে শিয়ামতবাদের প্রকৃত স্বরূপ এবং বর্তমান ইরানী-বিপ্লবের মহানায়ক আয়াতুল্লাহ খোমেনীর প্রকৃত ধর্মবিশ্বাস তাদের নিজেদের বই-পুস্তক থেকেই জাতির সামনে তুলে ধরেছেন! প্রাচীন শিয়া পণ্ডিতদের রচনাবলী থেকে শুরু করে খোদ আয়াতুল্লাহ খোমেনীর লেখা বই-পুস্তক থেকে তিনি যেসব উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন, এগুলি পাঠ করলেই আশা করি যে কোন বিজ্ঞ লোকের পক্ষেই বর্তমান ইরানী বিপ্লবের স্বরূপ এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। এতদ,সঙ্গে হাদীছ এবং বর্ণনা শাস্ত্রকে কলুষিত করার লক্ষ্যে এরা কত বড় জঘন্য ভূমিকা পালন করেছে এবং এখনও করে যাচ্ছে, তাও অনুধাবন করা সহজ হবে।

তাড়াহুড়ার কারণে বইটির অনুবাদের ভাষা কিছুটা দুর্বল হলেও অনুবাদের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ততা ষোলআনা বজায় রাখা হয়েছে।

এ বইটির মাধ্যমে শিয়ামতবাদের সাম্পরতিক প্রচারণার ধূম্রজাল কেটে গিয়ে সকলের নিকট প্রকৃত সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে বলে আশা করি। আল্লাহপাক তওফীক দান করুন। আমীন!!

সূচীপত্র

ইরানী ইনকেলাব
ইমাম খোমেনী
ও শিয়া মতবাদ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى اله واصحابه

والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين

পূর্বকথা

বর্তমান যুগে প্রচারণা একটি অসাধারণ ও প্রভাবশালী শক্তি। যে কোন একটা মারাত্মক ভ্রান্ত বিষয়কেও সত্যরূপে বিশ্বাস করিয়ে দেওয়ারও অভূতপূর্ব ক্ষমতা রয়েছে প্রচারণার মধ্যে। এর সর্বশেষ দৃষ্টান্ত, যা আমাদের চোখের সামনে রয়েছে— বর্তমান ইরান সরকারের পক্ষ থেকে পরিচালিত প্রচারণা অভিযান। ইরান সরকার তাদের বিভিন্ন দূতাবাস ও এজেন্টদের মাধ্যমে অবিরাম প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে যে, ইমাম রুহুল্লাহ খোমেনী (১) একজন খাঁটি মুসলমান এবং তার পরিচালিত ইরানী বিপ্লব একটি খাঁটি ইসলামী আন্দোলন। এ প্রসঙ্গে তারা ইসলামী ঐক্য এবং শিয়া-সুন্নী একতার প্রতিও আহবান জানাচ্ছে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্যে সম্মেলনের পর সম্মেলন ডাকা হচ্ছে, যেগুলিতে দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকা থেকে এমন সব প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ করা হয়, যাদের সম্পর্কে আশা করা যায় যে, তারা প্রভাবিত হবে এবং তাদেরকে এ প্রচারণার ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যাবে। এছাড়া বিভিন্ন দেশেও স্থানীয় ভাষায় বই-পুস্তক, প্রচারপত্র, সাময়িকী ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশও প্রচারের এক সয়লাব অব্যাহত রয়েছে। কমপক্ষে আমি আমার সত্তর বছরের সচেতন জীবনে দেখিনি যে, কোন সরকার অথবা কোন রাজনৈতিক পার্টির পক্ষ থেকে এত বিস্তৃত আকারে ও চাতুরীপূর্ণ ভাবে এমন কার্যকর প্রচারণা চালানো হয়েছে। আমাদের যুগে সরকারসমূহ যুদ্ধকালে যেমন অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য সামরিক সাজ-সরঞ্জামের জন্যে অকুণ্ঠচিত্তে বেহিসাব অর্থ সম্পদ ব্যয় করে থাকে এবং এর জন্যে সরকারী ধনভাণ্ডারের মুখ খুলে দেয়, বর্তমান ইরানী সরকার তেমনি প্রচার প্রোপাগাণ্ডার পিছনে দেশের সম্পদ পানির ন্যায় প্রবাহিত করছে। এ মার্চ মাসেরই (১৯৮৪ সনের) শুরুতে মুরাদাবাদের জনৈক ব্যক্তি প্রয়োজন বশতঃ লক্ষ্ণৌ এসে আমার সাথেও দেখা করে। সে বলল যে, তাদের এলাকায় গ্রামে গ্রামেও ইরানী প্রচার-পত্র ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে।

বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিত এসব প্রচার-পত্র ও প্রোপাগাণ্ডা দ্বারা এমন প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই প্রভাবান্বিত হওয়া স্বাভাবিক, যে ইসলামী ধ্যান-ধারণার অগ্রগতি ও ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার বাসনা পোষণ করা সত্ত্বেও শিয়া মতবাদ, শিয়া মতবাদের ইতিহাস, বর্তমান ইরানের আভ্যন্তরীন পরিস্থিতি, ইমাম খোমেনীর ব্যক্তিত্ব ও তার পরিচালিত বিপ্লবের চিন্তাগত ও ধর্মগত ভিত্তি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয়। এ মতবাদ ইমাম খোমেনী নিজে তার রচনাবলীতে বিশেষ করে ولاية الفقيه او الحكومة الاسلامية

(১) ইরানী বিপ্লবের নেতা রুহুল্লাহ খোমেনীর ভক্তরা তার জন্যে "ইমাম" শব্দটি অপরিহার্যরূপে লিখে থাকে। তাই আমরাও তাদের অনুভূতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে এ শব্দটি ব্যবহার করা উপযুক্ত মনে করেছি। আমাদের অভিমত ও আমাদের দৃষ্টিকোণ পাঠকবর্গ পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ পাঠ করে জানতে পারবেন।

নামক গ্রন্থে সবিস্তারে বর্ণণা করেছেন। এ গ্রন্থটিই যেন তার বিপ্লবের বুনিয়াদ। এ গ্রন্থটিও বিশুদ্ধরূপে সে-ই বুঝতে পারে, যে শিয়া মতবাদ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এবং সে যথারীতি শিয়া মযহাব অধ্যয়ন করেছে।

এস্থলে আমি এ বাস্তব সত্য প্রকাশে কোনরূপ কুন্ঠাবোধ করি না যে, আমাদের জনগণ, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ, সাংবাদিক ও সুধীবর্গের তো কথাই নেই, আমরা যারা মাদ্রাসা ও উচ্চ দ্বীনী প্রতিষ্ঠান সমূহে শিক্ষা অর্জন করে "আলেমে-দ্বীন"-রূপে কথিত ও গণ্য হই, তারা সাধারণভাবে শিয়া মযহাবের বুনিয়াদী মূলনীতি ও আকায়েদ সম্পর্কেও সম্যক অবগত নই। তবে যারা কোন বিশেষ প্রয়োজনে তাদের গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করেছেন, তাঁদের কথা অবশ্য আলাদা। স্বয়ং আমার অবস্থা এই যে, মাদ্রাসা শিক্ষা এবং এরপর শিক্ষকতা যুগেও আমি শিয়া মযহাব সম্পর্কে সাধারণ লেখাপড়া জানা লোকের চেয়ে বেশী কিছু জানতাম না। (বাস্তবে একে জ্ঞান মনে করাই ভুল।) এরপর এক সময়ে কতক সুন্নী আলেমের গ্রন্থ পাঠ করার সুযোগ হয়েছে, যারা শিয়া মযহাবের মৌলিক গ্রন্থাবলী উত্তমরূপে পাঠ করে এ সম্পর্কে লিখেছেন। তাদের মধ্যে মওলানা কাযী এহতেশামুদ্দিন মুরাদাবাদী (রহঃ) এর গ্রন্থ المجوعة السنية। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ বিষয়বস্তু সম্পর্কে সর্বপ্রথম এ গ্রন্থটিই আমি অধ্যয়ন করেছি। এটা এখন থেকে প্রায় একশ' বছর পূর্বেকার রচনা। এইসব বর্ণণাভঙ্গি গাম্ভীর্যপূর্ণ ও বলিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষকও বটে। এ ছাড়া বিষয়বস্তুর উপর হযরত মওলানা আবদুস শাকূর ফারুকী লক্ষ্ণৌভী (রহঃ) এর কতক রচনাও আমি মাঝে মাঝে অধ্যয়ন করেছি। এরপর আমি মনে করতে শুরু করেছিলাম যে, শিয়া মযহাব সম্পর্কে আমি ওয়াকিফহাল হয়ে গেছি। কিন্তু সম্প্রতি যখন ইরানী বিপ্লব সম্পর্কিত উপরোক্ত প্রচারণা ও তার প্রভাব দেখে এ সম্পর্কে লিখার প্রেরণা সৃষ্টি হল এবং আমি একে একটি ধর্মীয় কর্তব্য মনে করলাম, তখন শিয়া মতবাদ সম্পর্কে ব্যক্তিগত ও সরাসরি জ্ঞান লাভের জন্যে আমি শিয়া মযহাবের মৌলিক ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহ এবং স্বয়ং ইমাম খোমেনীর রচনাবলী অধ্যয়ন করা আবশ্যক মনে করলাম। বর্তমানে আমি অশীতিপর বৃদ্ধ। এ বয়সে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ শক্রিসমূহের মধ্যে যে দুর্বলতা সৃষ্টি হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক, তা সৃষ্টি হয়ে গেছে। এছাড়া আমি উচ্চ রক্তচাপেও ভুগছি। ফলে লেখাপড়ার যোগ্যতা অনেকটা প্রভাবিত হয়ে গেছে। কিন্তু এহেন অবস্থায় আমি এসব গ্রন্থের কয়েক হাজার পৃষ্ঠা পাঠ করেছি। এখন জানতে পেরেছি যে, ইতিপূর্বে আমি শিয়া মযহাবের এক চতুর্থাংশ সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল ছিলাম না। এ পাঠ থেকেই এ বিষয়টি সামনে এসেছে যে, শিয়া মতবাদ সম্পর্কে উত্তমরূপে অবগত না হয়ে ইমাম খোমেনীর পরিচালিত ইরানী বিপ্লবের স্বরূপ ও প্রকার হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। কেননা, শিয়া মযহাবের মৌলিক বিশ্বাস "ইমামত" ও শেষ যুগের ইমাম (প্রতীক্ষিত মেহেদী)-এর "গায়বতে কুবরা" তথা মহা অন্তর্ধানের আকীদাই এ বিপ্লবের মূল ভিত্তি।

এক্ষেত্রে আমি এ সত্য প্রকাশও সমীচীন মনে করি যে, শিয়া মযহাব সম্পর্কে আমাদের সুন্নী আলেমগণের অজ্ঞতার একটি বিশেষ কারণ আছে। তা এই যে, শিয়া মযহাবে দ্বীন ও মযহাবকে গোপন করার এবং প্রকাশ না করার অত্যন্ত জোরদার নির্দেশ রয়েছে। আমি যতদূর

জেনেছি এবং অধ্যয়ন করেছি— বিশ্বের সকল ধর্ম ও মযহাবের মধ্যে এটা কেবল শিয়া মযহাবেরই বৈশিষ্ট্য। এতে আমাদের উদ্দেশ্য শিয়া মযহাবের সেই বৈশিষ্ট্য ও শিক্ষা নয়। বরং তাকিয়্যা থেকে আলাদা এটা একটা স্বতন্ত্র অধ্যায়। শিয়া গ্রন্থাবলী এবং তাদের নিষ্পাপ ইমামগণের বাণী সমূহে এর শিরোনাম হচ্ছে "কিতমান", যার অর্থ গোপন করা ও প্রকাশ না করা। আর "তাকিয়্যা" শব্দের অর্থ হয় কথা ও কর্ম দ্বারা আসল স্বরূপ ও বাস্তব ঘটনার বিপরীত প্রকাশ করা এবং এভাবে অন্যদেরকে ধোকায় পতিত করা। এ বিষয়দ্বয়ের বিস্তারিত বর্ণনা, এ সম্পর্কে শিয়া মযহাবের মৌলিক গন্থাবলীর সুস্পষ্ট উদ্ধৃতি এবং তাদের নিষ্পাপ ইমামগণের বাণী। ইনশায়াল্লাহ এ প্রবন্ধে তাও যথাস্থানে দেখতে পাবেন। ১

এখন এর বরাত দিয়ে কেবল একথা আরয করতে চাই যে, শিয়া মযহাবের এ শিক্ষার স্বাভাবিক ফলশ্রুতি এই দাঁড়ায় যে, ছাপাখানার মাধ্যমে আরবী, ফার্সী ভাষায় লিখিত ধর্মীয় গ্রন্থাবলী মুদ্রণের কাজ শুরু না হওয়া পর্যন্ত এবং হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির প্রথা প্রচলিত থাকায় আমাদের আলেমগণ সাধারণভাবে শিয়া মযহাবের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে অন্ধকারে ছিলেন। কেননা, তাদের গ্রন্থাবলী কেবল বিশেষ বিশেষ শিয়া আলেমগণের কাছেই থাকত এবং যারা শিয়া নয়— এমন কোন ব্যক্তির গায়ে এগুলোর বাতাসও লাগতে দিত না। আমাদের ফিকাহ্ ও ফতোয়ার কিতাব সমূহে "নিকাহ্" ও "রিদ্দতের" অধ্যায়ে শিয়াদের সম্পর্কে যা লিখা হয়েছে, তা পাঠ করার পর এ বিষয়ে সংশয় থাকে না যে, এসব কিতাবের মাননীয় লেখকবৃন্দের দৃষ্টিতে শিয়া মযহাবের মৌলিক গ্রন্থাবলী মোটেই পড়েনি। তাই তারা শিয়াদের সম্পর্কে তাই লিখেছেন, যা সাধারণের মধ্যে খ্যাত ছিল অথবা যে সম্পর্কে ইতিহাস গ্রন্থসমূহে কিছু কিছু আলোচনা করা হয়েছিল। ফতোয়া আলমগিরী আজ থেকে প্রায় তিনশ' বছর পূর্বে বাদশাহ্ আলমগীর (রহঃ)-এর শাসনামলে ফেকাহবিদ আলেমগণের একটি বোর্ড কর্তৃক সংকলিত হয়েছিল। এটা অধ্যয়ন করেও তাই অনুমিত হয়। এখন থেকে প্রায় দেড়শ' বছর পূর্বেকার প্রখ্যাত গ্রন্থকার আল্লামা ইবনে আবেদীন্ শামীর কিতাব "রদ্দুল মুহতার" হানাফী ফেকাহ্র সর্বাধিক প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে বিবেচিত হয়। তাতেও শিয়াদের সম্পর্কে যা কিছু লিখা হয়েছে, তা থেকেও একথাই জানা যায় যে, শিয়াদের মৌলিক গ্রন্থাবলী তাঁর দৃষ্টিতেও পড়েনি। এর চেয়েও বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, ইমাম রব্বানী শায়খ আহমদ সরহিন্দী মুজাদ্দেদ আলফেসানী (রহঃ) চারশ' বছর পূর্বে তাঁর অনেক মকতুবাতে শিয়া মযহাব ও শিয়াদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এছাড়া এ বিষয়বস্তুর উপর ফার্সী ভাষায় তাঁর একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকাও রয়েছে, যা তিনি

---

(১) পাঠকবর্গ কিতমানের উপর জোর দেওয়ার ব্যাপারে তাদের নিষ্পাপ ইমাম ইমাম জা'ফর ছাদেকের একটি উক্তি এখানেও দেখে নিন। শিয়া মযহাবের সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য الجامع الكافي। গ্রন্থে তাঁর এই উক্তি বর্ণিত আছে—

إِنَّكُمْ عَلَى دِيْنٍ مَنْ كَتَمَهُ أَعَزَّهُ اللهُ وَمَنْ أَذَاعَهُ أَذَلَّهُ اللهُ

তোমরা এমন ধর্মের অনুসারী যে, যেকেউ একে গোপন করবে, আল্লাহ্ তায়ালা তাকে ইসমত দান করবেন। আর যেকেউ একে প্রচার ও প্রকাশ করবে, আল্লাহতায়ালা তাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন। (উছূলেকাফী মুদ্রিত লক্ষ্মৌ— ৪৮৫ পৃঃ)

মাওয়ারান্নাহারের আলেমগণের সমর্থনে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। (এ পুস্তিকাটি "রদ্দে রাওয়াফেয" নামে তাঁর মকতুবাত সমষ্টির সাথে এ যাবত প্রকাশিত হয়ে এসেছে।) এগুলো পাঠ করেও একথাই জানা যায় যে, শিয়া মযহাবের মৌলিক গ্রন্থাবলী হযরত মুজাদ্দিদ (রহঃ)-এরও হাতে আসেনি। অতঃপর এর প্রায় একশ' বছর পরে হিজরী দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে যখন হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থান করছিলেন, তখন তিনি তাঁর ওস্তাদ শায়খ আবু তাহের কুর্দী (রহঃ)-এর ফরমায়েশে হযরত মুজাদ্দেদের এই পুস্তিকা 'রদ্দে-রাওয়াফেয' আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। এছাড়া শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহঃ) শিয়া মতবাদের বিপক্ষে সুন্নী মযহাব সপ্রমাণ করার উদ্দেশ্যে ازالة الخفا ও قرة العينين নামে দুটি বিরাটাকার গ্রন্থও রচনা করেন, যা প্রসিদ্ধ, সুবিদিত ও মুদ্রিত রয়েছে। (১) এ গ্রন্থদ্বয় শাহ ওয়ালীউল্লাহর বিস্তৃত জ্ঞান, সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি ও অভূতপূর্ব প্রমাণ শক্তির স্বাক্ষর বহন করে। কিন্তু এসব গ্রন্থ অধ্যয়ন করেও এটাই জানা যায় যে, শিয়া মযহাবের মৌলিক গ্রন্থাবলী الكافی । الجامع ইত্যাদি (যা অধ্যয়ন ছাড়া শিয়া মযহাব সম্পর্কে পূর্ণ অবগতি লাভ করা যায় না।) তাঁরও হস্তগত হয়নি। আমাদের মতে এর কারণ এই যে, মুদ্রণের পূর্বে এসব গ্রন্থ কেবল বিশেষ বিশেষ শিয়া আলেমগণের কাছেই থাকত। তারা তাদের ইমামগণের পক্ষ থেকে গোপন রাখার কঠোর নির্দেশ পালনার্থে অন্যকে সেগুলি দেখাতেন না। বরং এগুলোর হাওয়াও অন্যের গায়ে লাগতে দিত না। সে যুগে সুন্নী আলেমগণের মধ্য থেকে কয়েকজন বিশেষ ব্যক্তিই অসাধারণ প্রচেষ্টার মাধ্যমে এসব গ্রন্থ কোনরূপে পেতে সক্ষম হন। তাঁদের মধ্যে শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ (রহঃ)-এর পুত্র "তোহফায়ে ইছনা আশারিয়া"র গ্রন্থকার শাহ্ আবদুল আজিজ (রহঃ) ও রয়েছেন। পরবর্তীকালে যখন ধর্মীয় গ্রন্থাদি প্রেসে ছাপা হতে লাগল এবং শিয়া মযহাবের এসব গ্রন্থও মুদ্রিত হল, যখনও আমাদের আলেমগণ এগুলো অধ্যয়ন করার প্রতি মনোনিবেশ করেননি এমন কয়েকজন ছাড়া, যারা বিশেষ স্থানীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অথবা কোন বিশেষ কারণে এগুলো অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তারা অধ্যন করেন, অতপরঃ নিজেদের রচনাবলীর মাধ্যমে অন্যান্যকেও ওয়াকিফহাল করার প্রয়াস পান। কিন্তু এটা দুঃখজনক ব্যাপার যে, আমাদের শিক্ষিত মহলে এসব রচনা দ্বারাও খুব কম উপকার লাভ করা হয়েছে। এ কারণেই পরিস্থিতি এই যে, আমাদের বর্তমান যুগের সুন্নী আলেমগণের মধ্যেও এমন লোক বিরল, যারা শিয়া মযহাব সম্পর্কে এমন জ্ঞান রাখেন, যাকে সত্যিকার অর্থে জ্ঞান বলা যায়। যখন আলেমগণের এই অবস্থা, তখন আমাদের জন সাধারণ ও আজকালকার পরিভাষায় সুধী ও বুদ্ধিজীবী বলে কথিত ব্যক্তিবর্গের তো কোন কথাই নেই। এই ব্যাপক অজ্ঞতার পটভূমিতে ইমাম রুহুল্লাহ খোমেনীর নেতৃত্বে ইরানে এই বিপ্লব সংঘটিত হয়। তিনি একে "ইসলামী বিপ্লব" নাম দিয়েছেন, সমগ্র মুসলিম বিশ্বে বরং যারা দুনিয়াতে এই বিপ্লব সংঘটিত করার শ্লোগান দিলেন, সহযোগিতার জন্যে
বিশ্বমুসলিমের প্রতি আহবান জানালেন এবং এর প্রচারণার জন্যে উপরে বর্ণিত সকল সম্পদ ও উপায় অবলম্বন করেলেন। এর ফল এই দাঁড়াল যে, ইমাম খোমেনী কেবল একজন শিয়াই নন; বরং শিয়া সম্পরদায়ের এমন শীর্ষস্থানীয় ধর্মীয় নেতাদের ও অন্যতম, যাদেরকে "আয়াতুল্লাহ" বলা হয়— একথা জানা ও প্রস্ফুটিত হওয়া সত্ত্বেও ভারত, পাকিস্তান এবং অন্যান্য দেশেরও

বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ব্যক্তিবর্গের পক্ষ থেকে এমন উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে তাকে স্বাগত জানানো হলে, যদ্বারা অনুমিত হচ্ছিল যে, এই ব্যক্তিবর্গের মতে এ বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে ইরানে নবুওয়ত যুগও খেলাফতে রাশেদার আদর্শভিত্তিক "সত্যিকার ইসালমী রাষ্ট্র" কায়েম হয়ে গেছে এবং এ রাষ্ট্রের কর্ণধার (আমিরুল মুমেনীন) ইমাম খোমেনী। আহলে সুন্নাতের মধ্যে গণ্য এসব লোক বিশেষতঃ নব্যশিক্ষিত যুবকদের একটি বড় সংখ্যা, যাদেরকে আজকাল "ইসলাম পছন্দ" বলা হয়— ইরানের খ্যাতনামা সুধী ও নেতৃবৃন্দকে ধর্মের তত্ত্বজ্ঞানী ও ধর্মীয় পথনির্দেশক মনে করে। এটা তাদের আকীদায় পরিণত হয়ে গেছে যে, "আয়াতুল্লাহ খোমেনী" এসময়ে ইসলাম ও ইসালমী বিশ্বের যেন ইমাম। সম্প্রতি পাটনা থেকে প্রকাশিত এই যুব শ্রেণীর মুখপত্র একটি মাসিক পত্রিকা আমার নজরে পড়েছে। এ থেকে অনুমিত হল যে, এ সম্পর্কে তাদের চিন্তাগত গোমরাহী ও ভ্রষ্টতা কতদূর পৌঁছে গেছে!

এসব সত্ত্বেও আমি মনে করি যে, এসব মহলের পক্ষ থেকে যা কিছু হয়েছে, তার মূলে শিয়া মতবাদ, ইমাম খোমেনীর ব্যক্তিত্ব, বিশেষতঃ তার ধর্মীয় পদমর্যাদা এবং তার পরিচালিত বিপ্লবের প্রকার ও স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞতা তো রয়েছেই ; এর সাথে ——— কোন কিছুর মহব্বত মানুষকে অন্ধ ও বোবা করে দেয় ; এর স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী এটাও রয়েছে যে, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অদম্য বাসনা এবং এর জন্যে অস্থির ঔৎসুক্য তাদেরকে এরূপ করতে বাধ্য করেছে। তাই ইমাম খোমেনী, তার পরিচালিত বিপ্লবের প্রকার ও স্বরূপ এবং শিয়াদের আকীদা-বিশ্বাসের মূলভিত্তি ইমামত সম্পর্কে তাদেরকে এবং সাধারণ মুসলমানদেরকে অবহিত করার সাধ্যনুযায়ী প্রয়াস চালানোকে আমি ধর্মীয় কর্তব্য ও মুসলমান ভাইদের আমার উপর একটি হক জ্ঞান করেছি। প্রকৃতপক্ষে ইমামতের মাসআলাটিই ইরানী বিপ্লবের মযহাবগত ও চিন্তাগত বুনিয়াদ। আমরা প্রথমে ইমাম খোমেনীর পরিচালিত বিপ্লব সম্পর্কে আরম্ভ করব। এরপর খোমেনীর ব্যক্তিত্ব, তার ধর্মীয় মর্যাদা এবং পরিশেষে শিয়াবাদ সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে, যা প্রয়োজন অনুযায়ী কিছুটা বিস্তারিত ও দীর্ঘ হবে।

ইরানী বিপ্লবের প্রকার ও ভিত্তি

খোমেনীর পরিচালিত বিপ্লবের ধরন হৃদয়ঙ্গম করা এবং এ সম্পর্কে মতামত স্থির করার জন্যে সর্বপ্রথম জানা দরকার যে, এটা তেমন কোন বিপ্লব নয়, যেমন শুদ্ধ অথবা অশুদ্ধ, ভাল কিংবা মন্দ রাষ্ট্রীয় বিপ্লব বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশেষতঃ মুসলিম দেশসমূহে রাজনৈতিক মতপার্থক্য অথবা নিছক ক্ষমতালিপ্সা অথবা এমনি ধরনের অন্যান্য কারণের ভিত্তিতে এ যাবত হয়েছে অথবা হয়ে থাকে। খোমেনীর পরিচালিত এ বিপ্লব শিয়া মযহাবের মূলভিত্তি ইমামতে বিশ্বাস এবং এ সম্পর্কিত অন্যান্য বিশ্বাস যেমন শেষ যমানার ইমাম প্রতীক্ষিত মাহদীর মহা অন্তর্ধান এবং এ মহা অন্তর্ধানের সময়কালে "বেলায়েতে ফকীহ তথা ফকীহর শাসন পরিচালনা" মতবাদের ভিত্তিতে সংঘটিত হয়েছে। ইমাম খোমেনী এ মতবাদ শিয়া মযহাবের বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থের রেওয়ায়েত দ্বারা স্বপ্রমাণ করে গ্রন্থে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। এটাই এ

গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও প্রতিপাদ্য বিষয়। খোমেনীর এ গ্রন্থই এ বিপ্লবের ধর্মীয় তাত্ত্বিক বুনিয়াদ। কিন্তু এটা হৃদয়ঙ্গম করার জন্যে শিয়াবাদ বিশেষতঃ তার ভিত্তি ইমামত বিশ্বাস সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া জরুরী। তাই পাঠকবর্গকে এ সম্পর্কে অবহিত করার জন্যে প্রথমে এ বিশ্বাস সম্পর্কেই সংক্ষেপে কিছু আহরয করা হচ্ছে।

ইমামত বিশ্বাসের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাঃ

শিয়া মযহাবের মৌলিক গ্রন্থাবলী এবং তাদের নিষ্পাপ ইমামগণের বাণীর মাধ্যমে ইমামতের বিস্তারিত বর্ণনা পাঠকবর্গ ইনশাআল্লাহ এ গ্রন্থেই যথাস্থানে দেখে নিবেন। এখানে বর্তমান লক্ষ্যের জন্যে এতটুকু আরয করাই যথেষ্ট নবী ও রসূল আল্লাহতাআলার পক্ষ থেকে নিযুক্ত ও মনোনীত হন (উম্মত অথবা কওম তাদেরকে মনোনীত করে না), তেমনি শিয়া সম্প্রদায়ের মতে নবীর পর তাঁর স্থলবর্তী খলিফা তথা ইমামও আল্লাহতাআলারই পক্ষ থেকে নিযুক্ত ও মনোনীত হন। তিনি নবীর মতই নিষ্পাপ হন এবং নবী ও রসূলের মতই তাঁর আনুগত্য উম্মতের উপর ফরয হয়ে থাকে। তার মর্তবা রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সমান এবং অন্য সকল নবীর উর্ধে হয়ে থাকে। তিনিই উম্মাহর ধর্মীয় ও জাগতিক রাষ্ট্রপ্রধান ও শাসক হন। উম্মাহর উপর বরং সমগ্র বিশ্বের উপর শাসনকার্য পরিচালনা করার অধিকার একমাত্র তাঁরই হয়ে থাকে। তাঁকে ছাড়া অন্য যে কেউ শাসনকার্য পরিচালনা করে, সে অন্যায়ভাবে ক্ষমতাদখলকারী জালেম ও পাপিষ্ঠ, (যদিও সে প্রথম শতাব্দীর আবু বকর, ওমর ও ওছমান (রাঃ) হয় অথবা পরবর্তী যুগের খলিফা, সুলতান ও বাদশাহ অথবা আমাদের যুগের রাষ্ট্রীয় কর্ণধার হয়। শিয়া মযহাবের বুনিয়াদী ইমামত আকীদার ভিত্তিতে তারা সকলেই অন্যায়ভাবে ক্ষমতা দখলকারী জালেম ও পিশাচ। রাষ্ট্র পরিচালনার অধিকার একমাত্র আল্লাহতাআলার মনোনীত নিষ্পাপ ইমামগণেরই রয়েছে।) নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁকে নবী বলে স্বীকার করা যেমন নাজাতের শর্ত তেমনি ইমামগণকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং তাদেরকে আল্লাহতাআলার মনোনীত নিষ্পাপ ইমাম ও শাসক বলে স্বীকার করাও নাজাতের শর্ত। শেষ নবী মোহাম্মদ (সাঃ)-এর ওফাতের পর থেকে দুনিয়ার বিলুপ্তি পর্যন্ত অর্থাৎ, কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্যে আল্লাহতাআলার পক্ষ থেকে বার জন ইমাম মনোনীত হয়েছেন। তাদের সকলকে আল্লাহতাআলা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মাধ্যমে মনোনীত করেছেন। প্রথম ইমাম ছিলেন হযরত আলী মুর্তযা (রাঃ)। তাঁর পরে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র হাসান (রাঃ), তাঁর পরে তাঁর ছোট ভাই ইমাম হুসায়ন (রাঃ)। তাঁর পরে তাঁরই বংশধরের মধ্য থেকে যথাক্রমে আরও নয়জন রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে থেকে প্রত্যেকেই তাঁর আমলে আল্লাহতাআলার পক্ষ থেকে নিযুক্ত ইমাম, খলিফা ও উম্মাহর ধর্মীয় ও জাগতিক প্রধান শাসনকর্তা ছিলেন ; (যদিও প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে একদিনের জন্যেও তাঁদের কেউ রাজত্ব লাভ করতে পারেননি)।

তাঁদের মধ্য থেকে প্রথম এগারজন ইমাম (হযরত আলী (রাঃ) থেকে নিয়ে একাদশতম ইমাম হাসান আসকারী পর্যন্ত) এ দুনিয়াতে আল্লাহতাআলার প্রচলিত জীবন ও মৃত্যুর সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী ওফাত পেয়ে গেছেন। একাদশতম ইমাম হাসান আসকারীর ওফাত হয় ২৬০ হিজরীতে। (এরপর প্রায় সাড়ে এগারশ' বছর অতীত হয়ে গেছে।) শিয়া সম্প্রদায়ের বিশ্বাস

(এটা তাদের বুনিয়াদী বিশ্বাসসমূহের অন্যতম এবং ঈমানের অঙ্গ) এই যে, তাঁর (হাসান আসকারীর) এক পুত্র ছিলেন, যিনি শৈশবেই অলৌকিকরূপে অদৃশ্য হয়ে যান এবং বর্তমান ইরাকের 'সামাররা' নামক শরের একটি গুহায় আত্মগোপন করেন। এখন কিয়ামত পর্যন্ত তাঁরই ইমামত ও রাজত্বের সময়কাল। এই গোটা মেয়াদের জন্যে তিনিই আল্লাহতাআলার পক্ষ থেকে নিযুক্ত ইমাম এবং উম্মাহর ধর্মীয় ও জাগতিক শাসনকর্তা।

শিয়া সম্প্রদায় আরও বিশ্বাস করে যে, তাঁর অন্তর্হিত হওয়া ও গুহায় আত্মগোপন করার পর কয়েক বছর পর্যন্ত তাঁর বিশেষ অন্তরঙ্গ দূতগণের তাঁর কাছে আসা যাওয়াও অব্যাহত ছিল। দূতগণের মাধ্যমে তাঁর কাছে শিয়াদের চিঠিপত্র এবং আবেদনপত্রও পৌঁছত এবং তাদেরই মাধ্যমে চিঠিপত্রের জওয়াবও আসত। শিয়া মযহাবের গ্রন্থসমূহে এই কয়েক বছরের সময়কালকে "গায়বতে ছুগরা" (ছোট অন্তর্ধান) বলা হয়েছে। এরপর দূতগণের এই আসা যাওয়াও বন্ধ হয়ে যায় এবং আত্মগোপনকারী ইমামের সাথে যোগাযোগের কোন সম্ভাবনা কারও জন্যে অবশিষ্ট থাকেনি। (এ অবস্থায় এগারশ' বছর অতীত হয়ে গেছে।) শিয়াদের বিশ্বাস যে, তিনি তেমনি আত্মগোপন করে আছেন এবং কোন উপযুক্ত সময়ে গুহা থেকে বের হয়ে সর্বসমক্ষে আবির্ভূত হবেন। যখনই সে সময় আসবে, তখন পর্যন্ত সময়কালকে শিয়াদের বিশেষ পরিভাষায় "গায়বতে কুবরা" (মহা অন্তর্ধান) বলা হয়।

লক্ষ্যণীয় যে, ইমামতের এ আকীদাটি শিয়া মযহাবের দৃষ্টিকোণে তওহীদ, রেসালাত ও আখেরাতের আকীদার ন্যায় ইসলামের বুনিয়াদী আকীদা। যারা একে মানে না, তারা তওহীদ, রেসালাত ও আখেরাত অস্বীকারকারীদের ন্যায় অমুসলিম মুক্তি পাওয়ার অযোগ্য ও জাহান্নামী। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, শিয়া মযহাবের মৌলিক গ্রন্থাবলীর সুস্পষ্ট উদ্ধৃতি এবং তাদের নিষ্পাপ ইমামগণের বাণী সহৃদয় পাঠকবর্গ ইনশাআল্লাহ এ গ্রন্থেই স্বস্থানে দেখতে পাবেন। এক্ষণে ইমামতের আকীদা ও শেষ যমানার ইমামের মহা অন্তর্ধান সম্পর্কে এ সংক্ষিপ্ত বর্ণনার অবতারণা কেবল এজন্যে করা হয়েছে যে, ইমাম খোমেনীর পরিচালিত ইরানী বিপ্লব এছাড়া বুঝাই যায় না। এজন্যেই আমরা এই অদ্ভূত ও অত্যাশ্চর্য আকীদার এখানে কোন সমালোচনাও করিনি। কেবল তা-ই বর্ণনা করেছি, যা তাদের স্বীকৃত আকীদা এবং যা শিয়া মযহাবের বুনিয়াদী গ্রন্থাবলী ও তাদের নিষ্পাপ ইমামগণের বাণী থেকে জানা গেছে।

আল-হুকুমাতুল ইসলামিয়া গ্রন্থের আলোকে ইরানী বিপ্লবের ভিত্তিঃ—

পূর্বেই আরয করা হয়েছে যে, খোমেনীর গ্রন্থ আল-হুকুমাতুল ইসলামিয়া তার পরিচালিত এ বিপ্লবের ধর্মীয় ও তাত্ত্বিক ভিত্তি। প্রায় দেড়শ' পৃষ্ঠার এ গ্রন্থে একথা সপ্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, দ্বাদশতম ও সর্বশেষ ইমাম-(প্রতীক্ষিত মাহদীর)-এর মহা অন্তর্ধানের সময়কালে (যা এখন হাজার বছরেরও অধিক এবং ইমাম খোমেনীর ভাষায় আরও হাজারো বছর এমনিভাবে অতিবাহিত হতে পারে।) ফেকাহবিদ অর্থাৎ শিয়া মুজতাহিদগণের প্রাপ্য, বরং দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে এই যে, তারা অন্তর্হিত ইমামের নায়েব ও স্থলাভিষিক্তরূপে রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা নিজেদের হতে গ্রহণ করার আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। এই মুজতাহিদগণের মধ্য থেকে

কোন যোগ্য ও উপযুক্ত ব্যক্তি যখন এ লক্ষ্য অর্জনের জন্যে দণ্ডায়মান হয় এবং প্রচেষ্টা চালায়, তখন সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত ব্যাপারাদিতে ইমামের মতই, বরং স্বয়ং নবী ও রসূলের মতই তার আনুগত্য করা সকলের প্রতি ওয়াজেব হবে। এ গ্রন্থেই ولاية الفقيه শিরোনাম স্থাপন করে খোমেনী লিখেনঃ

واذا نهض بامر تشكيل الحكومة فقيه عالم عادل فانه يلى من امور المجتمع ماكان يليه النبى (ص) منهم ووجب على الناس ان يسمعوا له ويطيعوا ويملك هذا الحاكم من امر الادارة والر عاية والسيا سة للناس ماكان يملكه الرسول (ص) واميرالمؤ منين (ع) ان الفقهاء هم اوصياء الرسول (ص) من بعد الائمة وفى حال غيابهم وقد كلفوا بالقيام بجميع ماكلف الائمة (ع) به•

"যখন কোন আলেম, আদেল ও ফকীহ্ (মুজতাহিদ) ব্যক্তি সরকার গঠনের জন্যে দণ্ডায়মান হবে, তখন সামাজিক ব্যাপারাদিতে সে সেইসব ক্ষমতার অধিকারী হবে, যেগুলো নবী (সঃ)-এর আয়ত্বাধীন ছিল। তাঁর কথা শোনা ও তাঁর আনুগত্য করা সকল মানুষের উপর ওয়াজেব হবে। এই শাসক রাষ্ট্রব্যবস্থা, আওয়ামী ও সামাজিক বিষয়াদির দেখাশুনায় এবং মানুষের রাজনৈতিক ব্যাপারাদিতে তেমনি ক্ষমতাবান হবেন, যেমন নবী ও আমিরুল মুমিনীন আলী (রাঃ) ক্ষমতাবান ছিলেন।" (৪৯ পৃঃ) এ গ্রন্থেই অন্যত্র ইমাম খোমেনী লিখেনঃ— "ফেকাহবিদগণ (অর্থাৎ মুজতাহিদগণ) নিষ্পাপ ইমামগণের পরে এবং তাদের অন্তর্ধানের সময়কালে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওসী (ভারপ্রাপ্ত)। তারা সেইসব ব্যাপার সম্পন্ন করা ও আন্‌জাম দেওয়ার জন্যে ভারপ্রাপ্ত, যেগুলো আন্‌জাম দেওয়ার জন্যে ইমামগণ (আঃ) ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। (৭৫ পৃঃ)

মোটকথা, ইমাম খোমেনীর মাধ্যমে ইরানে যে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে, তার এটাই ধর্মীয় ও তাত্বিক ভিত্তি। সুতরাং ইমাম খোমেনীর মর্যাদা অন্যান্য দেশের বিপ্লবী নেতা ও রাষ্ট্রপ্রধানদের অনুরূপ নয়; বরং শিয়া মযহাবের ভিত্তি ও বুনিয়াদ ইমামতের আকীদা, শেষ ইমামের মহাঅন্তর্ধান এবং এ অন্তর্ধানের সময়কালে الفقيه ولاية নীতিও মতবাদের ভিত্তিতে তিনি শিয়াদের দ্বাদশতম নিষ্পাপ ইমাম (অন্তর্হিত ইমাম)-এর স্থলাভিষিক্ত, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ভারপ্রাপ্ত এবং এ মর্যাদায় ইমাম ও নবীর মতই তার আনুগত্য ওয়াজেব। তার সমস্ত পদক্ষেপ ও কার্যক্রম এ মর্যাদারই প্রেক্ষাপটে। আমরা যতদুর অধ্যয়ন করেছি ও যতদূর জানি তিনি এই মর্যাদাকে ঢেকে রাখারও কোন চেষ্টা করেননি। তার এ মর্যাদার অবশ্যম্ভাবী দাবী এই যে, তিনি সমগ্র মুসলিমবিশ্ব বরং সমগ্র পৃথিবীকে তার শাসনাধীনে আনার প্রচেষ্টা চালাবেন।

এটাও সর্বজন বিদিত যে, ইমাম খোমেনী বেলায়েতে ফকীহ্ মতবাদ সম্পর্কে (যা এ বিপ্লবের ভিত্তি) যা কিছু আল-হুকুমাতুল ইসলামিয়া গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন, তাতে অত্যন্ত পরিষ্কাররূপে

---

(১) এ বিষয়বস্তুর উপর আলোচনা প্রসঙ্গে ইমাম খোমেনী লিখেছেনঃ— "আমাদের ইমাম মাহদীর মহা অন্তর্ধানের পর এক হাজার বছর অতীত হয়ে গেছে। সেই সময় আসার পূর্বে আরো হাজারো বছর অতিবাহিত হতে পারে যখন উপযোগিতার তাগিদে প্রত্যাশিত ইমামের আগমণ ঘটবে।" (২৬ পৃঃ)

প্রকাশ করা হয়েছে যে, এ মতাবাদের ভিত্তিতে কেবল সেই শিয়া ফেকাহবিদ ও মুজতাহিদই উম্মতের ইমাম ও রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারবে, যে ইমামতের আকীদা ও শেষ ইমামের দুনিয়াতে উপস্থিতি এবং এগারশ' বছর ধরে তার মহা অন্তর্ধানের সময়কালে ولايت فقيه মতবাদকেও স্বীকৃতি দেয়।

এরপর এতে কোন সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ আছে কি যে, এ বিপ্লবকে খাঁটি ইসলামী বিপ্লব বলা এবং সম্মেলন ও সমাবেশসমূহে······ ইসালমী বিপ্লব-শিয়া ও সুন্নী বিপ্লব নয় শ্লোগান তোলা একটি ধোকা ও প্রতাধণা মাত্র? এ প্রতারণায় তারাই পড়তে পারে, যারা এ বিপ্লব সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য অর্জনেরও চেষ্টা করেনি।

ইরানী বিপ্লবের ধরন সম্পর্কে আমার এতটুকু আরয করেই ক্ষান্ত হচ্ছি। এরপর খোমেনীর ব্যক্তিত্ব বিশেষ করে তার ধর্মীয় মর্যাদা সম্পর্কে সংক্ষেপেই তা আরয করতে চাই, যা তার রচনাবলী অধ্যয়ন করে জানা গেছে।

কোন আন্দোলন বিশেষতঃ কোন বিপ্লব সম্পর্কে মতামত স্থির করার জন্যে তার নেতার মতবাদও বিশ্বাস জানা যে একান্ত জরুরী, তা বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। এ ব্যাপারে অনবধানতাকে সেই বৈধ মনে করতে পারে, যার মতে ঈমান ও বিশ্বাসের কোন গুরুত্ব নেই এবং যে কেবল রাজত্ব ও ক্ষমতাকেই ধর্ম ও ঈমান মনে করে।

এখনও অর্ধশতাব্দীও অতিবাহিত হয়নি, আমাদের এদেশেই আল্লামা এনায়েতুল্লাহ্ মাশরেকী ও তার খাকসার আন্দোলনের খুব ধুমধাম ছিল। তার দর্শন ও দাওয়াত এটাই ছিল যে, বৈষয়িক শক্তি, শাসনক্ষমতা ও রাষ্ট্রই সত্যিকার ঈমান ও ইসলাম। এর ভিত্তিতে আমাদের এ যুগে "মুমেনীন ছালেহীন (সৎকর্মপরায়ন ঈমানদার) বলতে সেই ইউরোপীয়ান জাতিসমূহকে বুঝতে হবে, যাদের কাছে শক্তি ও শাসন ক্ষমতা রয়েছে। তার রচিত "তাযকেরা" নামক বিরাটাকার গ্রন্থটি ছিল তার দাওয়াত ও আন্দোলনের বুনিয়াদ। এতে উল্লেখিত মতবাদ ও দর্শনকে কোরআন পাক দ্বারাও সপ্রমাণ করার প্রয়াস চালানো হয়েছিল। আমাদের মধ্যে যারা সেই সময়কাল দেখেছে, তাদের মনে আছে যে, এক বিশেষ চিন্তাধারার অধিকারী যুবকশ্রেণী কিরূপ উৎসাহ ও উদ্দিপনার সাথে তার দাওয়াতে সাড়া দিচ্ছিল এবং তার বাহিনীতে ভর্তি হচ্ছিল। আসলে জাতির মধ্যে এমন লোকের অস্তিত্ব আমাদের জন্যে শিক্ষার উপকরণ।

ইমাম খোমেনী স্বীয় রচনাবলীর আলোকে

ইমাম রুহুল্লাহ্ খোমেনী একাধারে আলেম ও গ্রন্থকার। তাঁর দু'টি গ্রন্থ আমার হস্তগত হয়েছে, যা তার রচনাবলীর মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব রাখে। একটি "আল হুকুমাতুল ইসলামীয়া" যার উল্লেখ ইতিপূর্বে করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এটা তার বৈপ্লবিক আন্দোলন ও দাওয়াতের ভিত্তি। তার ব্যক্তিত্ব ও ধর্মীয় বিশ্বাস জানার জন্যেও এ গ্রন্থ অনেকটা যথেষ্ট। অপর গ্রন্থ "তাহ্রীরুল ওসীলাহ" এটা সম্ভবতঃ তার সর্ববৃহৎ রচনা। এর বিষয়বস্তু ফেকাহ্। এটি বড় সাইজের দু'টি বিরাটকায় খণ্ডে লিপিবদ্ধ। প্রত্যেক খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা সাড়ে ছয় শতের

কাছাকাছি। এটা নিঃসন্দেহে ফেকাহ্ সম্পর্কে একটি সারগর্ভ ও বিস্তৃত গ্রন্থ। পাক-পবিত্রতা অর্থাৎ এস্তেঞ্জা, গোসল ও ওযু থেকে শুরু করে উত্তরাধিকার স্বত্ব বণ্টন পর্যন্ত ফেকাহ্র সকল অধ্যায় এতে শামিল রয়েছে। মানুষ জীবনে যেসকল সমস্যার সম্মুখীন হয়, আমার ধারণা তার মধ্যে এমন কমই সমস্যা হবে, যার সমাধান শিয়া মযহাবের দৃষ্টিকোণে এ গ্রন্থে না পাওয়া যাবে। বর্ণনাভঙ্গি খুবই স্বচ্ছ ও পরিমার্জিত। নিঃসন্দেহে তার এ রচনা তার মযহাব সম্পর্কে গভীর পাণ্ডিত্য ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্বের প্রমাণ।

খোমেনীর যেসকল মতবাদ ও বিশ্বাস তার গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করে জানা গেছে, তা তারই বাক্যাবলীতে ও ভাষায় এখন পাঠকবর্গের সামনে পেশ করা হচ্ছে। উদ্দেশ্য শুধু এই যে, যারা জানে না এবং এ না জানার কারণে তার সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝিতে লিপ্ত হয়, তারা জেনে নিতে পারেন।

শিয়া ধর্মীয় ইমামগণ সম্পর্কে খোমেনীর আকীদা

এ প্রসঙ্গে প্রথম নীতিগত ও পূর্ণাঙ্গ কথা এই যে, ইমাম খোমেনি শিয়া ইছনা আশারিয়া সম্প্রদায়ের উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন মুজতাহিদ, ইমাম ও ধর্মীয় নেতা। তাই ইমামত প্রশ্নে ও ইমামগণ সম্পর্কে ইছা আশারিয়া সম্প্রদায়ের যে বিশেষ মতবাদ ও বিশ্বাস রয়েছে (যা তাদের মতে ঈমানের অঙ্গ), তা সকলই ইমাম খোমেনীরও বিশ্বাস। একজন দৃঢ় বিশ্বাসী ও শিয়া মুজতাহিদের মতই তিনি এগুলোর প্রতি ঈমান রাখেন। সুধী পাঠকবৃন্দ ইনশাআল্লাহ্ এসব বিশ্বাস ও মতবাদ সবিস্তারে এ গ্রন্থেই যথাস্থানে দেখে নিবেন। এ প্রসঙ্গে যা কিছু লিখা হবে, তা শিয়া মযহাবের বুনিয়াদী গ্রন্থাবলীর উদ্বৃতি এবং তাদের নিষ্পাপ ইমামগণের উক্তির আলোকেই লিখিত হবে। আমরা তা উদ্ধৃত করব এবং পাঠকবর্গের জন্যে অনুবাদের খেদমত আনজাম দিব। এতেই ইমাম খোমেনীর বিশ্বাস কিছুটা সবিস্তারে পাঠকবর্গের জানা হয়ে যাবে। এক্ষণে আমরা স্বয়ং তার "আল হুকুমাতুল ইসলামিয়া" গ্রন্থ থেকেই (যা তার বৈপ্লবিক আন্দোলন ও দাওয়াতের ভিত্তি) ইমামগণ সম্পর্কে তার কয়েকটি আকীদা পাঠকবর্গে সামনে পেশ করছি।

সৃষ্টিজগতের প্রতিটি কনার উপর ইমামগণের আধিপত্যঃ—

আল হুকুমাতুল ইসলামিয়া গ্রন্থে الو لاية التكوينية শিরোনামে খোমেনি লিখেনঃ

فان للامام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات الكون ٥

ইমামের
জন্যে এমন প্রশংসিত স্থান, উচ্চ মর্যাদা ও সৃষ্টিগত রাজত্ব অর্জিত হয় যে, সৃষ্ট জগতের প্রতিটি কণা তার আদেশ ও ক্ষমতার সামনে নতমস্তক ও আজ্ঞানুবর্তী হয়ে থাকে। (১) [পৃঃ ৫২]

ইমামগণের মর্যাদা নৈকট্যশীল ফেরেশতা, নবী ও রসূলগণের উর্ধ্বে

উপরোক্ত শিরোনামের অধীনেই এবং এ প্রসঙ্গেই খোমেনী এরপর লিখেনঃ

وان من ضروريات مذهبنا ان لائمتنا مقاما لايبلغه ملك مقرب ولانبى مرسل

"আমাদের শিয়া
ইছনা আশারিয়া মযহাবের জরুরী আকায়েদের অন্যতম এই যে, আমাদের ইমামগণের এমন মর্তবা ও স্তর অর্জিত আছে, যে পর্যন্ত কোন নৈকট্যশীল ফেরেশতা এবং নবী-রসূলও পৌঁছতে পারে না।" [৫২ পৃঃ] ১

ইমামগণ জগৎ সৃষ্টির আগে নূর ও দ্যুতি ছিলেন, যা খোদায়ী আরশকে ঘিরে রেখেছিল। তাদের মর্তবা ও নৈকট্যের স্তর আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানো নাঃ—

উপরোক্ত শিরোনামের অধীনেই এবং প্রসঙ্গেই ইমাম খোমেনী বলেনঃ—

وبموجب مالد ينامن الروايات والاحاديث فان الرسول الاعظم (ص) والائمة (ع) كانوا قبل هذا العالم انوارا فجعلهم الله بعرشه محد قين وجعل لهم من المنزلة والزلفى مالا يعلمه الاالله

"যে সকল রেওয়ায়েত ও হাদীস (অর্থাৎ শিয়া রেওয়ায়েত ও হাদীস) আমাদের সামনে রয়েছে, সেগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রসূলে আজম (সাঃ) এবং ইমামগণ (আঃ) এ জগৎ সৃষ্টির পূর্বে নূর ও দ্যুতি ছিলেন। এরপর আল্লাহতাআলা তাদেরকে আরশের চারপাশে নিয়োজিত করেন এবং তাদেরকে এমন মর্তবা দান করেন, যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না।" [৫২ পৃঃ]

ইমামগণ বিচ্যুতি ও অনবধানতা থেকে নিরাপদ ও পবিত্রঃ—

ভুলক্রটি এবং কোন সময় কোন ব্যাপারে অনবধানতার সম্ভাবনা মানুষের জন্যে অপরিহার্য। পয়গাম্বরগণও এ থেকে নিরাপদ নন। কোরআন মজীদেও একাধিক পয়গাম্বরের ভুলক্রটির ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু খোমেনী তার ইমামগণ সম্পর্কে বলেনঃ—

لانتصور فيهم السهو والغفلة

(১) এক্ষণে আমাদের লক্ষ্য ইমাম খোমেনী ও তার শিয়া ইছনা আশারিয়া সম্প্রদায়ের আকীদা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করা। এগুলো সম্পর্কে আলোচনা ও সমালোচনা এক্ষণে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের বাইরে। তবুও এতটুকু বলে দেওয়া আমরা জরুরী মনে করি যে, অধিকাংশ মুসলিম উম্মাহর মতে এ শান একমাত্র আল্লাহতাআলার যে, সৃষ্টি জগতের প্রতিটি কণার উপর তাঁর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত এবং সমগ্র সৃষ্টি তাঁর সৃষ্টিগত আদেশের সামনে নতমস্তক এবং আজ্ঞানুবর্তী। এ শান কোন নবী ও রসূলেরও নয়। কোরআন পাকে অসংখ্য আয়াতে একথা ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু ইমাম খোমেনী ও তার ইছনা আশারিয়া সম্প্রদায়ের ঈমান এটাই যে, সৃষ্টজগতের প্রতিটি কণার উপর তাদের ইমামগণের রাজত্ব রয়েছে।

"তাদের সম্পর্কে ভুলত্রুটি ও অনবধানতা কল্পনাও করা যায় না।" [৯১ পৃঃ]

ইমামগণের শিক্ষা কোরআনী বিধানাবলী ও শিক্ষার মতই চিরস্থায়ী এবং অবশ্য পালনীয়ঃ

খোমেনী এ গ্রন্থেই এক জায়গায় ইমামগণের শিক্ষা ও বিধান সম্পর্কে বলেন—

ان تعاليم الائمة كتعاليم القران لاتخص جيلا خاصا وانماهى تعا ليم للجميع فى كل عصر ومصر والى يوم القيامة يجب تنفيذها واتباعها

"আমাদের ইমামগণের শিক্ষা কোরআনের শিক্ষার অনুরূপ। এটা কোন বিশেষ শ্রেণী ও বিশেষ যুগের লোকদের জন্যে নয়; বরং প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক এলাকার মানুষের জন্যে। কিয়ামত পর্যন্ত এর প্রয়োগ ও অনুসরণ ওয়াজেব।" (১ ও ২ পৃঃ)
ইমামগণ সম্পর্কে খোমেনীর এ কয়েকটি বিশ্বাস কেবল তার আল হুকুমাতুল ইসলামিয়া গ্রন্থ থেকে পেশ করা হয়েছে। এরপর আমরা খোমেনী ও ইছনা আশারিয়া সম্প্রদায়ের অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বুনিয়াদী আকীদা সম্পর্কে আলোচনা শুরু করছি।

ছাহাবায়ে কেরাম বিশেষ করে হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ) সম্পর্কে খোমেনীর আকীদা ও আচরণঃ

"যে ব্যক্তি শিয়া ইছনা আশারিয়ার মযহাব সম্পর্কে সামান্যও জ্ঞান রাখে, সে এতটুকু অবশ্যই জানে যে, এ মযহাবের ভিত্তিই এ বিষয়ের উপর স্থাপিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর পবিত্র জীবদ্দশাতেই আল্লাহ্‌তাআলার নির্দেশে হযরত আলী মুর্তুযা (রাঃ)-কে পরবর্তী সময়ের জন্যে খলিফা, স্থলাভিষিক্ত, উম্মতের ধর্মীয়, জাগতিক ইমাম ও রাষ্ট্রপ্রধান মনোনীত করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি সর্বশেষ ও চূড়ান্ত পর্যায়ের ব্যবস্থা এই গ্রহণ করেন যে, বিদায় হজ্ব থেকে ফেরার পথে গদীরে খুম নামক স্থানে একটি ময়দান পরিষ্কার করার আদেশ দেন এবং নিজের জন্যে একটি মিম্বর তৈরী করান। এরপর বিশেষ ঘোষণার মাধ্যমে সকল সফরসঙ্গীকে (যাদের মধ্যে মুহাজির, আনসার ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ শামিল ছিলেন এবং সংখ্যায় হাজারো ছিলেন) সেই ময়দানে একত্রিত হওয়ার আদেশ দেন। যখন হযরত আলী মুর্তুযা (রাঃ)-কে উভয় হাতে ধরে উপরে তুলেন, যাতে সমবেত সকলেই তাঁকে দেখতে পায়। এরপর তিনি তাঁকে পরবর্তী সময়ের জন্যে খলিফা, স্থলাভিষিক্ত, ইমামতের ধর্মীয় ও জাগতিক প্রধান, ইমাম ও হর্তাকর্তা (অর্থাৎ শাসক) মনোনীত করার কথা ঘোষণা করলেন। তিনি আরও বললেনঃ এটা আমার প্রস্তাব নয়; বরং আল্লাহ্‌র নির্দেশ। আমি খোদায়ী আদেশ পালনার্থেই এ ঘোষণা করছি। এরপর তিনি উপস্থিত সকলের কাছ থেকে এ বিষয়ের স্বীকৃতি ও অঙ্গীকার নিলেন। এ সম্পর্কিত শিয়া মযহাবের নির্ভরযোগ্যতম রেওয়ায়েতসমূহে আরও বলা হয়েছে যে, এ স্থলে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বিশেষভাবে হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ)-কে বললেনঃ তোমরা "আসসালামু আলাইকা ইয়া আমিরাল মুমিনীন" বলে আলীকে সালামী দাও। সে মতে তারা উভয়েই এ আদেশ পালন করতঃ এমনিভাবে সালামী দিলেন। গাদীরে খুমের এ ঘটনা (অথবা

কাহিনী) সম্পর্কে শিয়া গ্রন্থাবলীর রেওয়ায়েতসমূহে এবং তাদের ইমামগণের উক্তিতে সবিস্থারে বর্ণনা করা হয়েছে। উপরে তা-ই সংক্ষেপে আরয করা হয়েছে। ইনশাআল্লাহ্ সুধী পাঠকবর্গ এ গ্রন্থেই এসব রেওয়ায়েত স্বস্থানে দেখতে পাবেন।

শিয়া রেওয়াতেসমূহে আরও বলা হয়েছে যে, গাদীরে খুমের এই ঘোষণা এবং ছাহাবায়ে-কেরামের এই সম্মিলিত অঙ্গীকার ও স্বীকারোক্তির প্রায় আশি দিন পরেই যখন রসূলে করীম (সাঃ)-এর ওফাত হয়ে গেল, তখন (নাউযুবিল্লাহ্) আবু বকর, ওমর ও তাদের সাথে সাধারণ ছাহাবীগণ চক্রান্ত করে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত এ ব্যবস্থাকে (যা তিনি আল্লাহ্তাআলার নির্দেশে কিয়ামত পর্যন্ত সময়কালের জন্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন) প্রত্যাখ্যাত ও নস্যাৎ করে দিলেন। তারা তাদের অঙ্গীকার ও স্বীকারোক্তি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং হযরত আলীর পরিবর্তে আবু বকরকে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খলিফা স্থলাভিষিক্ত এবং উম্মতের প্রধান নিযুক্ত করলেন। (নাউযুবিল্লাহ্) এই "বিশ্বাসঘাতকতা" ও "মহা অপরাধে"র ভিত্তিতে শিয়া রেওয়াতেয়তসমূহে এবং তাদের ইমামগণের বাণীসমূহে সার্বিকভাবে সাহাবায়ে কেরাম বিশেষতঃ হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ)-এর জন্যে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী), কাফের, মুনাফিক, জাহান্নামী, হতভাগা বরং ঘোর হতভাগা ইত্যাদি জঘন্য খেতাব ব্যবহার করা হয়েছে এবং তাদের প্রতি অভিসম্পাত করা হয়েছে। (এসব রেওয়ায়েত ও বাণীও ইনশাআল্লাহ্ পাঠকবর্গ স্বস্থানে দেখতে পাবেন।)

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যদি শিয়া মযহাবের ভিত্তি ও বুনিয়াদ গাদীরে খুমের এ কাহিনীকে সত্য ও বাস্তব মেনে নেওয়া হয়, তবে আবু বকর ও ওমর (রাঃ) এবং সাধারণ ছাহাবায়ে কেরাম (নাউযুবিল্লাহ্) এমনি ধরনের অপরাধী সাব্যস্ত হবেন এবং শিয়া রেওয়ায়েতের বরাত দিয়ে উপরে লিখিত জঘন্য খেতাবসমূহেরই যোগ্য হবেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কিয়ামত পর্যন্ত সময়কালের জন্যে যে ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন, উম্মতের ধর্মীয় ও জাগতিক কল্যাণের জন্যে তিনি আল্লাহ্তাআলার নির্দেশে যে ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং যে ব্যবস্থার জন্যে তিনি এত সযত্নে অঙ্গীকার ও স্বীকারোক্তি নিয়েছিলেন সেই ব্যবস্থাকে যারা বিশ্বাসঘাতকতা ও চক্রান্ত করে নস্যাৎ ও ব্যর্থ করে দিয়েছে তাদের কাফের, মুরতাদ, জাহান্নামী ও অভিশপ্ত হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ আছে কি ? যুক্তি ও বর্ণনা উভয় দিক দিয়ে এরূপ হওয়াটাই জরুরী। এ কারণেই সাধারণ শিয়া গ্রন্থকার, আলেম ও মুজতাহিদগণের এই আচরণ লক্ষ্য করা গেছে যে, তারা তাদের রেওয়ায়েত অনুযায়ী গাদীরে খুমের ঘটনা উল্লেখ করে অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ওফাতের পর হযরত আবু বকর, ওমর (রাঃ)-এবং সাধারণ ছাহাবীগণ যা করেছেন, তার ভিত্তিতে তারা তাদেরকে আপন ইমামগণের উক্তি অনুযায়ী মুরতাদ, কাফের অথবা কমপক্ষে চরম ফাসেক, পাপাচারী ও লা'নতের যোগ্য সাব্যস্ত করে।

কিন্তু খোমেনী কেবল শিয়া আলেম, মুজতাহিদ অথবা শিয়া গ্রন্থাকারই নন ; বরং তিনি এ যুগের একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং বৈপ্লবিক দাওয়াত ও আন্দোলনের নেতাও বটে। এ বৈপ্লবিক আন্দোলনে তার মূল শক্তি যদিও শিয়া সম্প্রদায় ; কিন্তু সুন্নী মুসলমানগণকেও সম্ভাব্য সীমা পর্যন্ত এতে ব্যবহার করা তার রাজনৈতিক প্রয়োজন। তাই আল হুকুতুল ইসলামিয়া গ্রন্থে তিনি এ প্রসঙ্গে এই আচরণ প্রদর্শন করেছেন যে, স্বীয় ব্যক্তিগত আকীদা ও ঈমানের তাগিদে

এবং শিয়া বিশ্বকে সন্তুষ্ট রাখার জন্যেও গাদীরে খুমের ঘটনা এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে পরবর্তী খলিফা ও স্থলাভিষিক্তরূপে হযরত আলী (রাঃ)-এর মনোনয়নের বিষয় উল্লেখ করেছেন এবং বারবার করেছেন। কিন্তু তার অনিবার্য ফলস্বরূপ প্রথম দুই খলীফা ও সাধারণ ছাহাবায়ে কেরামের প্রতি আল্লাহ্ ও রসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা কাফের ও মুরতাদ হওয়ার যে অপরাধ আরোপিত হয়, তা রাজনৈতিক উপযোগিতার কারণে স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা থেকে বিরত রয়েছেন। এ ব্যাপারে তিনি এতটুকু সাবধানতা অত্যাবশ্যক জ্ঞান করেছেন যে, সমগ্র গ্রন্থে শায়খায়ন তথা হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ)-এর নাম পর্যন্ত আসতে দেননি। অথচ এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ই ইসলামী হুকুমত, যেমন নাম দ্বারাও বুঝা যায়। ইসলামী ইতিহাস সম্পর্কে যে ব্যক্তি সামান্যও জ্ঞান রাখে, সেও জানে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পরে এ দু'জন খলিফার খেলাফত আমল ইসলামী হুকুমতের পূর্ণাঙ্গ ও আদর্শ নমুনা ছিল। (১) কিন্তু খোমেনীর আচরণ এই যে, যেখানে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার দিক দিয়েও প্রসঙ্গক্রমে তাদের খেলাফতের আমল উল্লেখ করা জরুরী ছিল, সেখানেও তাঁদের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করা থেকে তিনি গা বাঁচিয়েছেন। এর দু'টি দৃষ্টান্ত পাঠকবর্গের জন্যে উৎসর্গ করছি।"

এক জায়গায় ইসলামী হুকুমতের প্রয়োজন সম্পর্কে আলোচনা করতে যেয়ে খোমেনী বলেনঃ

فقد ثبت بضرورة الشرع والعقل ان ماكان ضروريا ايام الرسول (ص) وفى عهد اميرالمؤ منين على بن ابى طالب (ع) من وجودالحكومة لا يزال ضروريا الى يومناهذا

"শরীয়ত ও যুক্তির দৃষ্টিতে একথা প্রমাণিত যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আমলে এবং আমিরুল মুমিনীন আলী ইবনে আবু তালিব (আঃ)-এর আমলে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব যেমন জরুরী ছিল, তেমনি আমাদের এযুগেও জরুরী" (২৬ পৃঃ)

আলেমগণ দ্বীনের রক্ষক। তাদের কাজ কেবল দ্বীনের কথাবার্তা বলা নয়; বরং আমল করা এবং করানোও তাদের দায়িত্ব— এ বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে ইমাম খোমেনী বলেনঃ

وقد كان الرسول (ص)وامير المؤ منين (ع) يقولون ويعملون

"রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও আমিরুল মুমিনীন (আঃ) বলতেনও এবং আমলও করতেন"। (৭১ পৃঃ)

এ দু'জায়গায় এবং এ গ্রন্থেই এছাড়া আরও কতক জায়গায় খোমেনী ইসলামী হুকুমত প্রসঙ্গেই নবী (সাঃ)-এর যমানার পর হযরত আলী (রাঃ)-এরই শাসনকাল উল্লেখ করেছেন এবং শায়খায়ন ও হযরত ওছমান (রাঃ)-এর উল্লেখ সর্বত্র সযত্নে পরিহার করেছেন। এ আচরণ তিনি

---

(১) আমি এখানে এ ঘটনা উল্লেখ করা উপযুক্ত মনে করি যে, ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট ১৩৫-এর ভিত্তিতে যখন বৃটিশ রাজত্বকালেই ১৯৩৭ সনে ভারতের সাতটি প্রদেশে কংগ্রেসের সরকার প্রতিষ্ঠিত হল, তখন কংগ্রেসের নেতা মহাত্মা গান্ধী এসব সরকারের কংগ্রেসী মন্ত্রীদের জন্যে তার পত্রিকা হরিজনে একটি নির্দেশ নামা লিখেছিলেন, যা তখনকার অন্যান্য পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে তিনি মন্ত্রীদেরকে নির্দেশ দেন যে, তারা আবু বকর ও ওমরের শাসন পদ্ধতি আদর্শ পথপ্রদর্শকরূপে সম্মুখে রাখবে এবং তাদের তরিকা অনুসরণ করবে। গান্ধীজী আরও লিখেন ঃ এটা আমি এজন্যে লিখছি যে, আমি ইতিহাসে এ দু'জন ছাড়া কোন দৃষ্টান্ত পাই না, যারা ফকীরীসহ এমন রাজ্যশাসন করেছেন। গান্ধীজীর এই নির্দেশ নামা হরিজনের জুলাই অথবা আগস্ট (১৯৩৭)-এর কোন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এক্ষণে আমি নির্দেশনামার এই বিষয়বস্তু আপন স্মৃতি থেকে লিখছি।

এ কারণে অবলম্বন করেছেন যে, তিনি যদি খলিফাত্রয়ের হুকুমতকেও "ইসলামী হুকুমত' সাব্যস্ত করে এখানে উল্লেখ করতেন, যেমন ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার দাবী তাই ছিল তবে তার মূলশক্তি শিয়া সম্প্রদায় তাকে বেলায়েতে ফকীহ্ (মুজতাহিদের শাসক হওয়া) পদের অযোগ্য সাব্যস্ত করত এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করত। পক্ষান্তরে যদি খোমেনী স্বীয় আকীদা ও মযহাব অনুযায়ী প্রথম তিন খলীফা সম্পর্কে পরিষ্কার ভাষায় মত প্রকাশ করতেন, তবে যেসকল অশিয়া লোক ইসলামী বিপ্লব শ্লোগানের আকর্ষণে অথবা সরল মনে তার ক্রীড়নক হয়ে আছে, তাদের মহানুভূতি ও সহযোগিতা থেকে তিনি বঞ্চিত হয়ে যেতেন।
সর্বাবস্থায় খোমেনীর এ আচরণের ফলে খলিফাত্রয় সম্পর্কে তার অভ্যন্তর পূর্ণরূপে প্রকাশ হয়ে পড়ে। পূর্বে আরয করা হয়েছে যে, খেলাফত ও ইমামতের জন্যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর পক্ষ থেকে হযরত আলী (রাঃ)-এর মনোনয়নের শিয়া আকীদার অবশ্যম্ভাবী ও তার্কিক ফলশ্রুতি এই যে, প্রথম দুই খলীফা ও সাধারণ ছাহাবায়ে কেরামকে (নাউযুবিল্লাহ্) তেমনই মনে করতে হবে, যেমন শিয়া রেওয়ায়েতসমূহে বলা হয়েছে।
এখন সুধী পাঠকবর্গ খোমেনীর সেই সমস্ত বাক্য লক্ষ্য করুন, যেগুলোতে তিনি হযরত আলী (রাঃ)-কে ভারপ্রাপ্ত, খলিফা, স্থলাভিষিক্ত এবং উম্মতের প্রধান কর্মকর্তারূপে মনোনয়ন প্রভৃতি বিভিন্ন শিরোনামে বর্ণনা করেছেন। আল হুকুমাতুল ইসলামিয়া গ্রন্থে শিয়াদের বুনিয়াদী আকীদা ইমামত ও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে পরবর্তী সময়ের জন্যে খলিফারূপে হযরত আলী (রাঃ)-এর মনোনয়ন সম্পর্কে স্বীয় আকীদা বর্ণনা করতে যেয়ে খোমেনী বলেনঃ

نحن نعتقد بالولاية و نعتقد ضرورة ان يعين النبى خليفة من بعد وقدفعل

"আমরা ইমামতের আকীদা রাখি। আমাদের আরও বিশ্বাস যে, নবী (সাঃ)-এর জন্যে পরবর্তীকালের জন্যে একজন নির্দিষ্ট খলিফা মনোনীত করা জরুরী ছিল এবং তিনি তাই করেছেন।" (১৮ পৃঃ)
এ প্রসঙ্গেই কয়েক লাইন পরে খোমেনী লিখেছেন যে, পরবর্তী সময়ের জন্যে খলিফা মনোনীত করাই এমন কাজ, যদ্বারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর রেসালতের কর্তব্য পালন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। তিনি বলেনঃ وكان تعيين خليفة من بعد عاملامتمما ومكملا لرسالته

পরবর্তীকালের জন্যে খলিফা মনোনীত করাই এমন কাজ ছিল, যদ্বারা তাঁর রেসালতের কর্তব্য পালন পূর্ণতা লাভ করেছে (১৯-পৃঃ)
একথাটি খোমেনী আরও স্পষ্ট ভাষায় অন্যত্র এভাবে ব্যক্ত করেছেনঃ

بحيث كان يعتبر الرسول (ص) لو لا تعيين الخليفة من بعده غير مبلغ رسالته

"যদি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর পরবর্তী খলিফা মনোনীত না করতেন, তবে মনে করা হত যে, উম্মতকে যে পয়গাম পৌঁছানো আল্লাহ্তাআলার পক্ষ থেকে তাঁর দায়িত্বে ন্যস্ত করা হয়েছিল তা তিনি পৌঁছাননি এবং রেসালতের কর্তব্য পালন করেননি।" (২২-পৃঃ)
খোমেনী এসব বাক্যে যা কিছু বলেছেন, তা একটি রেওয়ায়েতের উপর ভিত্তি করে বলেছেন। এ রেওয়ায়েতের বিষয়বস্তু জানার পরই খোমেনীর এই বাক্যাবলীর পুরাপুরি মতলব বুঝা যায়।

এ রেওয়ায়েতটি শিয়া সম্প্রদায়ের বিশুদ্ধতম গ্রন্থ "উসূলে কাফী"র বরাত দিয়ে ইনশাআল্লাহ্ পরে স্বস্থানে বর্ণিত হইবে। এখানে তার কেবল এতটুকু সারমর্ম উল্লেখ করা যথেষ্ট যে, ইমাম বাকের (আঃ) বর্ণনা করেন যখন আল্লাহ্তাআলার পক্ষ থেকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে আদেশ করা হল যে, আপনার পরবর্তী সময়ের জন্যে আলীর ইমামত ও খেলাফত ঘোষণা করুন, তখন তিনি আশংকা করলেন যে, যদি আমি এই ঘোষণা করি, তবে অনেক মুসলমান ধর্মত্যাগী হয়ে আমার বিরুদ্ধে চলে যাবে। তারা অপবাদ আরোপ করবে যে, এ কাজ আমি আলীর সাথে আত্মীয়তার কারণে করছি এবং আল্লাহ্তাআলার পক্ষ থেকে এ নির্দেশ আসেনি। তাই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আদেশটি পুনর্বিবেচনা করার জন্য এবং এ ঘোষণা না করানোর জন্য আল্লাহ্তাআলার কাছে আবেদন করলেন। ফলে আল্লাহ্তাআলার পক্ষ থেকে এই আয়াত নাযিল হলঃ—

ياايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فمابلغت رسالته

"হে রসূল, আপনার প্রতি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে, তা আপনি মানুষের কাছে পৌঁছে দিন এবং ঘোষণা করুন! যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে আপনি তাঁর পয়গাম পৌঁছালেন না এবং রেসালতের কর্তব্য পালন করলেন না।"
সেমতে এর পরেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) গাদীরে খুম নামক স্থানে সেই ঘোষণা করলেন। এ সম্পর্কিত রেওয়ায়েতসমূহে (যা ইনশাআল্লাহ্ এ গ্রন্থে পরে দেখবেন) আরও বলা হয়েছে যে, এ স্থলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সাল্লাহতাআলার পক্ষ থেকে এরূপ সতর্কবাণী শোনানো হয়েছিল যে, যদি আপনি আলীর খেলাফত ও ইমামতের এ ঘোষণা না করেন, তবে আমি আপনার প্রতি আযাব নাযিল করব। (নাউযুবিল্লাহ্)।
মোটকথা, খোমেনীর উপরোক্ত বাক্যবলীতে এসব রেওয়ায়তের ভিত্তিতেই বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) পরবর্তী সময়ের জন্যে খলিফা মনোনীত না করলে এর অর্থ এই হত যে, তিনি রেসালতের কর্তব্য পালন করেননি।
সুধী পাঠকবর্গ, খোমেনীর এ সম্পর্কিত আরও কয়েকটি বর্ণনা লক্ষ্য করুন

والرسول الكريم (ص) قد كلمه الله وحيا ان يبلغ ماانزل اليه فيمن يخلفه فى الناس و يحكم هذا الامر فقد اتبع ما امر به وعين امير المؤمنين عليا للخلافة

"রসূলে করীম (সাঃ)-এর সাথে আল্লাহ্তাআলা ওহীর মাধ্যমে বাক্যালাপ করলেন এবং আদেশ দিলেন যে, যে ব্যক্তি তাঁর পরে তাঁর খলিফা ও স্থলাভিষিক্ত হবে এবং রাষ্ট্র পরিচালনা করবে, তার সম্পর্কে আল্লাহ্র যে ফয়সলা তাঁর প্রতি নাযিল হয়েছে, তা যেন মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় এবং ঘোষণা করা হয়। তিনি আল্লাহ্র এ আদেশ পালন করেছেন এবং খেলাফতের জন্যে আমিরুল-মুমিনীন আলী (আঃ)-কে মনোনীত করেছেন।" (৪২—৪৩ পৃঃ)
পরে এ গ্রন্থেই এক জায়গায় বলেনঃ

وفى غدير خم فى حجة الوداع عينه النبى (ص) حاكما من بعده ومن حينها بدأ الخلاف الى نفوس القوم

"বিদায় হজ্বে গাদীরে খুম নামক স্থানে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আলী (আঃ)-কে পরবর্তী সময়ের জন্যে শাসক মনোনীত করেছিলেন এবং তখন থেকেই মানুষের মনে বিরোধ সৃষ্টি হয়ে গেল।" (১৩১-পৃঃ)

খোমেনীর এ গ্রন্থ থেকেই আরও কিছু অংশ পাঠ করুনঃ

قد عين من بعده واليا على الناس امير المؤ منين (ع) واستمر انتقال الامامة والولايةمن امام الى امام الى ان انتهى الامرالى الحجة القائم

"রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) পরবর্তী সময়ের জন্য আমীরুল মুমিনীন (আঃ)-কে মানুষের উপর শাসকরূপে মনোনীত করলেন। এরপর ইমামতের এই পদ এক ইমাম থেকে পরবর্তী ইমামের দিকে স্থানান্তরিত হয়ে হয়ে অবশেষে আলহুজ্জাতুল কায়েম (অন্তর্নিহিত ইমাম প্রতিশ্রুত মেহদী)— পর্যন্ত পৌঁছে তা সমাপ্ত হয়ে গেল।

যাকে আল্লাহতায়ালা জ্ঞান বুদ্ধি থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করেননি, সে এ বিষয়ে সন্দেহ করতে পারে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে খেলাফত ও ইমামতের জন্যে হযরত আলী মুর্তজা (রাঃ)-এর মনোনয়নের আকীদা ইমাম খোমেনীর অনুরূপ যে ব্যক্তি পোষণ করে (যা শিয়াবাদের ভিত্তি), তার অভিমত ও বিশ্বাস প্রথম দুই খলিফা হযরত আবু বকর ও হযরত ওমরসহ অন্যান্য ছাহাবীদের সম্পর্কে তাই হবে, যা শিয়া মযহাবের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলী ও তাদের ইমামতের উক্তির বরাত দিয়ে উপরে বর্ণিত হয়েছে; অর্থাৎ নাউযুবিল্লাহ, তাঁরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন এবং মুরতাদ, অভিশপ্ত ও জাহান্নামী হয়ে গেছেন। নির্ভরযোগ্য শিয়া গ্রন্থাবলীর এসব রেওয়ায়েত এবং তাদের ইমামগণের উক্তি পাঠকবর্গ ইনশাআল্লাহ এ গ্রন্থেই ভবিষ্যতে দেখতে পাবেন।

এ সম্পর্কিত একটি সংক্ষিপ্ত রেওয়ায়েত এখানেও পড়ে নিন। শিয়াদের বিশুদ্ধতম গ্রন্থ الجامع الكافى এর শেষাংশ كتاب الروضة তে তাদের পঞ্চম ইমাম আবু জাফর অর্থাৎ ইমাম বাকের (আঃ)-এর এই উক্তি বর্ণণা করা হয়েছে।—

كان الناس اهل ردة بعد النبى (ص) الا ثلثة فقلت ومن الثلاثة فقال المقداد بن الاسود وابوذر الغفارى و سلمان الفارسى رحمة الله عليهم وبركاته

নবী করীম (সাঃ)-এর ওফাতের পরে তিনজন ব্যতীত সকলেই মুরতাদ ধর্মত্যাগী হয়ে যায়। (বর্ণনাকারী বলেন) আমি আরয করলাম এই তিনজন কে? তিনি বললেনঃ মেকদাদ, ইবনুল আসওয়াদ, আবুযর গিফারী এবং সালমান ফারেসী। তাদের প্রতি আল্লাহর রহমত ও বরকত হোক। (১১৫ পৃঃ)

এই বিশ্বাসের বিপজ্জনক ফলাফল

শিয়া মতবাদের এসব বিপজ্জনক তথ্যাদি উদঘাটন দ্বারা আমাদের লক্ষ্য খোমেনীর মতবাদ অবহিত নয়। এগুলোর উপর আলোচনা ও সমালোচনা এক্ষণে আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। তবুও এই বিশ্বাসের কতক বিপজ্জনক ও সুদূর প্রসারী ফলাফলের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ

করাকেও আমরা তাদের প্রাপ্য মনে করি, যাতে তারা চিন্তাভাবনা করতে পারে।
যদি খোমেনীর একথা স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) খেলাফত ও ইমামতের জন্যে হযরত আলী (রাঃ)-কে মনোনীত করেছিলেন, এবং গাদীরে খুম নামক স্থানে তা ঘোষণাও করেছিলেন, তবে এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ একথাও স্বীকার করতে হবে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর উম্মতের শিক্ষা-দীক্ষা ও চরিত্র গঠনে ব্যর্থ হয়েছেন এবং এমন ব্যর্থ হয়েছেন যে, আল্লাহর কোন পয়গাম্বর, বরং কোন পথপ্রদর্শক ও সংস্কারকও এতটুকু ব্যর্থ হয়নি। তিনি নবুওতের সূচনা থেকে ওফাত পর্যন্ত যাদের শিক্ষা-দীক্ষায় মেহনত করেছেন, যারা সফরে ও গৃহে তাঁর সাথে রয়েছে এবং দিবারাত্র তাঁর বাণী ও উপদেশ শ্রবণ করেছে, তাঁর দুই চক্ষু বন্ধ হওয়ার সাথে সাথেই তারা এমন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে যে, শাসন ও ক্ষমতা কুক্ষিগত করার মোহে তাঁর প্রতিষ্ঠিত সেই ব্যবস্থাকেই নস্যাৎ করে দিয়েছে, যা তিনি কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্যে আল্লাহর নির্দেশে উম্মতের কল্যাণের জন্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং যার জন্যে কয়েকদিন পূর্বেই তাদের সকলের কাছ থেকে অঙ্গীকার ও স্বীকারোক্তি নিয়ে ছিলেন। ইতিহাসে কোন ধর্মবেত্ত বা সংস্কারকের ব্যর্থতার এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে কি? অনুরূপভাবে এ বিশ্বাসের ফলস্বরূপ ইসলামই সামগ্রিকভাবে তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে। কেননা, এই ছাহাবীগণের মাধ্যমেই উম্মত পবিত্র কোরআন ও ইসলাম লাভ করেছে। বলা বাহুল্য যারা এমন খোদাভীরু ও প্রবৃত্তিপূজারী,তাদের প্রতি দ্বীন ও ঈমানের ব্যাপারে আস্থা রাখা যায়কি?

বিশেষভাবে বর্তমান কোরআন তো নিশ্চিতরূপে অবিশ্বাস্য সাব্যস্ত হবে। কেননা, একথা স্বীকৃত যে, এটা সেই কোরআনের কপি, যার সংকলন ও প্রচারের ব্যবস্থা সরকারী পর্যায়ে প্রথম তিন খলিফার আমলেই হয়েছিল। খোমেনীর বিশ্বাস অনুযায়ী রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা নস্যাৎ করার জন্যে এ তিনজনই মূলতঃ দায়ী এবং (নাউযুবিল্লাহ) প্রধান অপরাধী। এরপর তো এটাও অনুমান ও যুক্তি সঙ্গত যে, তারা (নাউযুবিল্লাহ) নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থের ভিত্তিতে কোরআনে সবধরণের ভেজাল অনুপ্রবেশ ও পরিবর্তন করে থাকবেন, যেমন শিয়া মযহাবের নির্ভরযোগ্যতম গ্রন্থসমূহের শতশত রেওয়ায়েতে এবং তাদের ইমামগণের উক্তিতে বর্ণনা করা হয়েছে। সুধী পাঠকবর্গ তন্মধ্যে কিছু রেওয়ায়েত ও ইমামগণের বাণী যথাস্থানে দেখতে পাবেন।

এস্থলে খোমেনী সম্পর্কে একথাও উল্লেখযোগ্য যে, তিনি আমাদের যুগের সাধারণ শিয়া আলেমদের ন্যায় বর্তমান কোরআনকেই আসল কোরআন বলেন এবং পরিবর্তনের বিশ্বাস অস্বীকার করেন। কিন্তু الحكومة الاسلا مية গ্রন্থেই এক জায়গায় তিনি জনৈক জাদরেল শিয়া আলেম ও মুজতাহিদ আল্লামা নূরী তবরিযীর কথা পূর্ণ সম্মান সহকারে উল্লেখ করেছেন এবং নিজের ولايت فقيه মতবাদের প্রমাণ স্বরূপ তার مستدرك الوسائل গ্রন্থের বরাত দিয়ে একটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। (৬৬ পৃঃ) অথচ খোমেনী জানেন এবং প্রত্যেক শিয়া আলেম জানে যে, এই আল্লামা নূরী তবরিযী কোরআন পরিবর্তিত হওয়ার প্রমাণ একটি স্বতন্ত্র বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেছেন, যার নাম فصل الخطاب فى اثبات تحريف كتاب رب الارباب এ গ্রন্থেই তিনি যুক্তিগত ও ইতিহাসগত প্রমাণাদি দ্বারা একথা স্বপ্রমাণ করার দর্শনীয় চেষ্টা

করেছেন যে, বর্তমান কোরআন পরিবর্তিত। তিনি লিখেছেনঃ আমাদের নিষ্পাপ ইমামগণের দু'হাজারের ও বেশী রেওয়ায়েত ব্যক্ত করে যে, বর্তমান কোরআনে পরিবর্তিত হয়েছে এবং সবধরণের পরিবর্তন হয়েছে। আমাদের পূর্ববর্তী অধিক সংখ্যক আলেমগণের এটাই বিশ্বাস ছিল। এক্ষণে আমরা এতটুকুতেই ক্ষান্ত হচ্ছি। পরে এ বিষয়টি স্বতন্ত্ররূপে আলোকপাত হবে এবং فصل الخطاب। গ্রন্থের সেইসব উদ্বৃতি পাঠকবর্গের সামনে পেশ করা হবে, যেগুলো পরিবর্তন আকীদার ব্যাপারে চূড়ান্ত হবে।

একটি সাম্প্রতিক উদ্ভাবন
খোমেনি তার গ্রন্থ্ কাশফুল আসরারের আয়নায়

রুহুল্লাহ্ খোমেনীর বিশ্বাস বিশেষতঃ প্রথম তিন খলিফা ও সাধারণ ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) সম্পর্কে তার আকীদা ও আচরণ সম্পর্কে পাঠকবর্গ বিগত পৃষ্ঠাসমূহে যা কিছু পাঠ করেছেন, তা তার কেবল 'আল হুকুমাতুল ইসলামিয়া' গ্রন্থের ভিত্তিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এটা আমি ১৯৮৪ সনের শুরুতে লিপিবদ্ধ করেছিলাম (এবং মাসিক আল ফুরকানের মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিতও হয়েছিল)। তখন আমার কাছে তার কেবল এ গ্রন্থটিই বিদ্যমান ছিল, যাতে তিনি আল্লাহতায়ালার নির্দেশের এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে ইমামত ও বেলায়েত পদে হযরত আলী মুর্তজা (রাঃ)-এর মনোনয়নের কথা স্থানে স্থানে উল্লেখ করেছিলেন। এর অবশ্যম্ভাবী ও তার্কিক ফল দু'য়ে দু'য়ে চারের মত এই ছিল যে, প্রথম তিন খলিফা এবং যেসকল ছাহাবী তাঁদেরকে রসূলের (সাঃ) খলিফা ও উম্মতের ধর্মীয় ও জাগতিক প্রধানরূপে স্বীকার করে তাঁদের হাতে বয়াত করেছিলেন, তাদের হাতে বয়াত করেছিলেন, তাদের সকলকে (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ ও রসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতাকারী ও ধর্মত্যাগী সাব্যস্ত করতে হবে। কিন্তু খোমেনী এ গ্রন্থে তাদের সকলের প্রতি এই অপরাধ এমন হুশিয়ারী ও চাতুরীর সাথে আরোপ করেছিলেন এবং এমন গোপনীয়তার আশ্রয় নিয়েছিলেন যে, সমগ্র গ্রন্থে তাদের একজনেরও নাম উল্লেখ করা হয়নি। আমি একথাও আরয করেছি যে, তিনি কোন রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের জন্যে এরূপ করেছেন।

কিন্তু চলতি ১৪০৪ হিজরী (জুন ১৯৮৪) রমযানুল মোবারকে আল্লাহতায়লার অদৃশ্য সমর্থণের বদৌলতে খোমেনীর অন্য একটি গ্রন্থ 'কাশফুল আসরার' আমার হাতে আসে। (এ গ্রন্থ সম্পর্কে কয়েক দিন পূর্বেই জেনেছিলাম যে, এতে তিনি সাধারণ কটুভাষী ও গালিগালাজকারী শিয়াদের ন্যায় প্রথম তিন খলিফা ও অন্যান্য প্রধান প্রধান ছাহাবীর উদ্দেশ্যে গালিগালাজের অনুশীলন করেছেন। আরও জেনেছিলাম যে, এ গ্রন্থটি দুষ্প্রাপ্য অথবা দুষ্প্রাপ্য করে দেওয়া হয়েছে। এখন কোথাও পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু আল্লাহতায়লার অদৃশ্য সমর্থনের বদৌলতে গ্রন্থটি আমার হস্তগত হয়ে গেল। এটি ফার্সী ভাষায় লিখিত প্রায় তিনশ' পৃষ্ঠার একটি মোটা গ্রন্থ। এতে তিনি পরিষ্কার ভাষায় কোনরূপ রাখঢাক না করে বরং দাবীর ভঙ্গিতে তার পাঠকবর্গকে বলেছেন যে, প্রথম তিন খলিফা (হযরত আবুবকর, হযরত ওমর, হযরত ওছমান)

এবং তাঁদের সমর্থনে প্রধান প্রধান ছাহাবীগণ (নাউযুবিল্লাহ্) দুনিয়ার প্রত্যাশী ও চূড়ান্ত পর্যায়ের চরিত্রহীন ছিলেন। তাঁরা শাসন ও ক্ষমতার লোভেই কেবল মুখে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তারা কেবল বাহ্যিক মুসলমান কিন্তু অন্তরে কাফের ও যিন্দিক ছিলেন। তারা তাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্যে এমন কোন কর্ম ছিল না, যা করতে পারতেন না। এজন্যে প্রয়োজন হলে কোরআনে পরিবর্তনও করতে পারতেন। মিথ্যা হাদীসও রচনা করতে পারতেন। তাদের অন্তর খোদাভীতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল এবং তারা প্রকৃতপক্ষে ঈমান থেকে বঞ্চিত ছিলেন। যদি তারা দেখতেন যে, এ লক্ষ্যটি ইসলাম ত্যাগ করে এবং আবু জাহেল ও আবু লাহাবের ন্যায় ইসলামের সাথে শত্রুতা করেই অর্জিত হতে পারে, তবে তারা তাই করতেন।

নিম্নে আমরা কাশফুল আসরার থেকে মূল ফার্সী বাক্যাবলী উদ্বৃত করব এবং ফার্সী জানেন না, এমন পাঠকবর্গের সুবিধার্থে এসব বাক্যের সহজবোধ্য মতলবই উর্দূতে (বাংলায়) লিপিবদ্ধ করব।

এমনিতে এ গ্রন্থে বিভিন্নস্থানে প্রথম তিন খলিফা ও ছাহাবায়ে কেরামের শানে চূড়ান্ত হৃদয়বিদারক ধৃষ্টতা প্রদর্শন করা হয়েছে। কিন্তু এখানে আমরা কেবল কয়েকটি বাক্যই পাঠকবর্গের জন্যে উৎসর্গ করছি। লক্ষ্যণীয় যে, এ গ্রন্থে আমাদের উদ্দেশ্য খোমেনীর ধর্মীয় মর্যাদা ও তার আকায়েদ সম্পর্কে পাঠকবর্গকে কেবল অবহিত করা। তাই আমরা কেবল তার কথা পাঠকবর্গের সামনে পেশ করব। তার ভ্রান্ত থেকে ভ্রান্ত কথাবার্তার খণ্ডনও এক্ষণে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের বাইরে।

খোমেনী এ গ্রন্থের ১১২ পৃষ্ঠায় گفتار شیعه در باب امامت প্রথমে ইমামত প্রশ্নে শিয়া-সুন্নী বিরোধ আলোচনা এবং শিয়া দৃষ্টিকোণ বর্ণণা করেছেন। এর সারমর্ম এই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাতের পর হযরত আলী, হাসান ও হুসায়েন, সালমান ফার্সী, আবুজর গিফারী, মেকদাদ, আম্মার ও আবদুল্লাহ্, ইবনে আব্বাস প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ইমামত ও খিলাফত সম্পর্কে মুসলমানদেরকে বললেন যে, আল্লাহতায়লার নির্দেশ ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ফরমান বাস্তবায়িত করা হোক। (অর্থাৎ হযরত আলীকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ভারপ্রাপ্ত, স্থলাভিষিক্ত, ইমাম কার্যনির্বাহী মেনে নেওয়া হোক) কিন্তু যে দলাদলি, লোভ-লালসা ও মোহ সর্বকালে সত্যকে পদদলিত করেছে এবং ভ্রান্ত কাজ করিয়েছে, এক্ষেত্রেও তা সক্রিয় হয়ে উঠল।

---

(১) আল্লাহতায়লার যে অদৃশ্য সমর্থনের বদৌলতে 'কাশফুল আসরার' গ্রন্থটি আমার হস্তগত হয়েছে, তার বিবরণ এই যে, হযরত মাওলানা সাইয়েদ সোলায়মান নদভী (রঃ)-এর সুযোগ্য পুত্র, আমাদের প্রিয়জন ডক্টর সাইয়েদ সালমান নদভী ডারবান ইউনিভার্সিটিতে (দক্ষিণ আফ্রিকা) ইসলামী বিভাগের প্রধান। তাঁর কাছে এ গ্রন্থের একটি কপি ছিল। আলফুরকানের মার্চ সংখ্যায় খোমেনী সম্পর্কে আমার প্রবন্ধটি তাঁর দৃষ্টিতে পড়ে। এরপর আল্লাহতায়লা তার অন্তরে এই ধারণা সৃষ্টি করে দেন যে, তিনি কাশফুল আসরারের একটি ফটোকপি আমার কাছে পাঠিয়ে দেন। সেমতে ডারবানেরই আমাদের এক অকৃত্রিম বন্ধু মওলানা আবদুল হক ওমরজী (ফাজেলে দেওবন্দ)-এর সহযোগীতায় তিনি এ গ্রন্থের ফটোকপি তৈরী করে পাঠিয়ে দিলেন। আল্লাতায়লা তাঁদের উভয়কে আমার এই সহায়তা এবং এই ধর্মীয় খেদমতের উত্তম প্রতিদান দিন। বাস্তব ঘটনা এই যে, এ গ্রন্থটির যেমন নাম, তেমনি কাম। এটি বাস্তবিকই কাশফুল আসরার অর্থাৎ রহস্য উম্মোচন। খোমেনীর ধর্মীয় বিশ্বাস প্রথম তিন খলিফা ও সাধারণ ছাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে তার আন্তরিক জিঘাংসা ও আভ্যন্তরীণ অবস্থা বিশুদ্ধরূপে এ গ্রন্থ থেকে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। অধম এ গ্রন্থ হস্তগত হওয়াকে আল্লাহতায়ালার অদৃশ্য সমর্থনই মনে করেছে।

উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ (হযরত আলী প্রমুখ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দাফন কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন, ইত্যবসরে ছকিফা বনী ছায়েদার বৈঠকে আবুবকরকে নির্বাচিত করে নেওয়া হল। এটা (খেলাফত প্রাচীরের) "খাশত আওয়াল" (প্রথম ইট) ছিল, যা বক্র করে স্থাপন করা হল। এখান থেকেই বিরোধের সূচনা হল। "শিয়ারা বলেঃ ইমাম নির্দিষ্টকরণ ও মনোনয়ন খোদার পক্ষ থেকে হওয়া উচিত। তার পক্ষ থেকে আলী ও তাঁর সন্তান-সন্ততির মধ্য থেকে নিষ্পাপ ইমামবর্গ মনোনীত হয়েছেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও তাদেরকে ইমাম ও উম্মতের হর্তাকর্তা নির্দিষ্ট ও মনোনীত করেছেন।"

ইমামত ও খেলাফত সম্পর্কে খোমেনী ও তার সম্প্রদায় শিয়া ইছনা আশারিয়ার এই ভূমিকা ও দাবী বর্ণনা করার পর নিম্নলিখিত প্রশ্নবোধক শিরোনাম স্থাপন করে লিখেছেনঃ—

چراقران صریحاسم امام رانبرده

(কোরআন ইমামের নাম পরিষ্কার উল্লেখ করল না কেন?)

پس ازانکه بحکم خرد و قران روشن شد که امامت یکی ازاصول مهمه اسلام است خدا این اصل مسلم رادر چند جائی قران ذکرکرده اینك درجواب این گفتار میپردازیم که چرا خدااسم امام را بانعره شنا سنامه ذکر نکرده تاخلاف برداشته شودواینهمه خونریزي نشود

প্রশ্নের সারকথা এই যে, যদি হযরত আলী ও তাঁর সন্তান-সন্ততিদের মধ্য থেকে ইমামগণের ইমামত (খোমেনী ও তাঁর শিয়া সম্প্রদায়ের দাবী অনুযায়ী) বিবেক ও কোরআনের দৃষ্টিতে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হয় এবং কোরআনে কয়েক জায়গায় তার উল্লেখ করা হয়েছে, তবে খোদা কোরআনে ইমামতের নাম উল্লেখ করলেন না কেন? যদি ইমামদের নাম পরিষ্কারভাবে কোরআনে উল্লেখ করা হত, তবে এ প্রশ্নে উম্মতের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হত না এবং রক্তক্ষয় হয়েছে, তা হতনা।

খোমেনীর জওয়াবঃ—

খোমেনী এ প্রশ্নের কয়েকটি জওয়াব দিয়েছেন। তন্মধ্যে প্রথম দু'জওয়াবের সম্পর্ক আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সাথে নেই। তাই আমরা তা এড়িয়ে যাচ্ছি। তবুও এ সম্পর্কে এতটুকু আরয করা সমীচীন মনে হয় যে, তার আল-হুকুমাতুল ইসলামিয়া ও তাহ্‌রীরুল ওসীলা গ্রন্থ দুটি পাঠ করে তার জ্ঞান-গরিমা সম্পর্কে যে অনুমান হয়েছিল, তার সাথে এ দু'টি জওয়াবের কোন মিল নেই; বরং এটা এ বিষয়ের প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত যে, যখন কোন জ্ঞানী-গুনী ব্যক্তিও ভ্রান্ত আকীদা পোষণ করে এবং তার সমর্থনের জন্যে কোমর বেঁধে লাগে, তখন চূড়ান্ত পর্যায়ের বেখাপ্পা, মূর্খতাসূলভ ও বোকামিসূলভ কথাবার্তাও তার কাছ থেকে প্রকাশ পায়। খোমেনীর সমালোচনা ও মর্যাদাহানির প্রতি আমাদের কৌতুহল থাকলে আমরা এ দু'টি জওয়াব ও উদ্ধৃত করতাম এবং আলোচনার মাধ্যমে পাঠকবর্গকে দেখাতাম যে, খাঁটি জ্ঞান-বুদ্ধির দিক দিয়ে এ

দু'টি জওয়াব কতটুকু ঢিলা ও বেখাপ্পা। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সাথে সম্পর্কহীন বিধায় আমরা এগুলো এড়িয়ে যাওয়ার ফয়সালা করেছি। (১১২ পৃঃ)
খোমেনী প্রদত্ত এ প্রশ্নের তৃতীয় জওয়াব আমাদের আলোচ্য বিষয়ের স্যাথে সম্পর্কশীল এবং তা এইঃ—

(۳)انکه فرضادرقرآن اسم امام راهم تعیین میکردازکجاکه خلاف بین مسلما نها واقع نمیشد آنهانیکه سالها درطمع ریاست خودرابدین پیغمبر چسپا نده بودند ودسته بند یها میکردند ممکن نبود بگفته قران ازکارخوددست بردارند باهرحیله بودکارخودرا انجام میدادند بلکه شاید دراین صورت خلاف بین مسلمانها طوری میشد که بانهدام اصل اسلام منتهی میشد زیراکه ممکن بود آنها که در صددریاست بودند چون دیدندکه باسم اسلام نمی شود بمقصود خودبرسند بکره حزبی برضد اسلام تشکیل میداند. . . . . الخ

এ জওয়াবের সারমর্ম এই যে, ধরে নেওয়া যাক যদি কোরআনে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পরবর্তী সময়ের জন্যে ইমামের (অর্থাৎ হযরত আলীর) নাম উল্লেখ করা হত, তবে এটা কিরূপে বুঝে নেওয়া হল যে, এরপরে ইমামত ও খেলাফত সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে কোন মতবিরোধ হত না? যারা হুকুমত ও রাজত্বের লোভেই বছরের পর বছর ধরে নিজেদেরকে পয়গাম্বরের ধর্ম অর্থাৎ ইসলামের সাথে জড়িত করে রেখেছিল, এবং যারা এ লক্ষ্য অর্জনের জন্যে চক্রান্ত ও দলাদলিতে লিপ্ত ছিল, তাদের জন্যে এটা সম্ভবপর ছিলনা যে, কোরআনের ফরমান মেনে নিয়ে নিজেদের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা থেকে হাত গুটিয়ে নিত। যে কোন কৌশল ও পাঁয়তারা দ্বারা তাদের লক্ষ্য (শাসন ও ক্ষমতা) অর্জিত হত, তারা তা ব্যবহার করত এবং যেকোন উপায়ে তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করত। রবং সম্ভবতঃ এমতাবস্থায় মুসলমানদের মধ্যে এমন মতবিরোধ সৃষ্টি হত, যার ফলশ্রুতিতে ইসলামের ভিত্তিই ধ্বসে পড়ত। কেননা, এটা সম্ভবপর ছিল যে, ইসলাম গ্রহণের পিছনে যাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যই ছিল কেবল ক্ষমতা দখল করা, তারা যখন দেখত যে, ইসলামের নামে এবং ইসলামের সাথে জড়িত থেকে তারা এ লক্ষ্যে অর্জন করতে পারবে না, তখন নিজেদের এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য তারা ইসলামের বিরুদ্ধেই দল তৈরী করে ফেলত, এবং ইসলামের প্রকাশ্য শত্রু হয়ে মাঠে নামত। (১৪০-১১৩ পৃঃ)

কারা এই হতভাগ্য?

আমাদের কতক ভাই, যারা শিয়া মযহাব সম্পর্কে অবহিত নয়, তারা বোধ হয় বুঝতে পারেননি যে, খোমেনী কোন হতভাগাদের সম্পর্কে বলছেন যে, তারা হুকুমত ও রাজত্বেত ক্ষোভেই ইসলামে দাখিল হয়েছিল এবং এ আশায়ই এর সাথে জড়িত ছিল। যদি কোরআনে উম্মতের

ইমাম ও রাষ্ট্রপ্রধানরূপে হযরত আলীর নাম পরিষ্কার উল্লেখও করা হত, তবুও তারা তাঁকে মানত না। এমনকি, যদি তারা দেখত যে, ইসলাম পরিত্যাগ করে এবং তার সাথে শত্রুতার ভূমিকা অবলম্বন করে তারা হুকুমত ও ক্ষমতা লাভ করতে পারে, তবে তারা তাই করত এবং ইসলামের প্রকাশ্য শত্রু হয়ে মাঠে নামত?

অতএব এই অনবহিত ভাইদের জানা উচিত যে, শিয়া মযহাবের প্রসিদ্ধ স্বীকৃতি বিষয়াদির মধ্যে এটাও রয়েছে যে, খলিফাত্রয়ের অবস্থা তাই ছিল। হযরত আবুবকরকে তাঁর এক অতীন্দ্রিয়বাদী বন্ধু (অন্য এক শিয়া রেওয়ায়েত অনুযায়ী এই ইহুদী আলেম) বলেছিল যে, মক্কায় একজন নবী জন্মগ্রহণ করবেন এবং তাঁর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। তুমি তাঁর সাথে লেগে গেলে তাঁর পরে তুমি তাঁর স্থলে শাসক হয়ে যাবে। সেমতে (নাউযুবিল্লাহ্) আবুবকর এই অতীন্দ্রিয়বাদীর (অথবা ইহুদীর) কথার ভিত্তিতে রাজত্বের লোভেই বাহ্যতঃ ইসলাম গ্রহণ করেছিল "হামলা হায়দরী"র (১) গ্রন্থাকার বাযেল ইরানী এ কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেঃ—

باوكاهني داده‌بود يك خبر   كه مبعوث گردد يكي نامور

زبطحازمين درهمين چندگاه   بودخاتم انبيائى اله

توباخاتم انبياء بگروى   چواوبگزاردجانشينش شوى

زكاهن چوبودش بياداين نويد   بياوردايمان نشان چون بد يد

এ গ্রন্থেই আরও আছে— (১৪ পৃঃ)

خبرداده بود ند چون كاهنان   كه دين محمد بگيرد جهان

همه پيروانش بعزت رسند   تمام اهل انكارذلت كشند

يكى كردازين راه ايمان قبول   يكى محض بهرخداورسول

উদ্ধৃত কবিতাগুলির মর্মার্থ এই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আবির্ভাব ও নবুওতের পূর্বে জনৈক অতীন্দ্রিয়বাদী (কাহেন) আবুবকরকে হিসাব করে বলেছিলঃ অদূর ভবিষ্যতে মক্কার মাটিতে একজন নবীর আবির্ভাব হবে, যে শেষ নবী হবে। তার ধর্ম পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। যারা তাকে মানবে, তারা ইযযত ও উন্নতির অধিকারী হবে। আর যারা অস্বীকার করবে, তারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে। হে আবুবকর, তুমি তার সাথে লেগে গেলে তার মৃত্যুর পর তুমিই তার স্থলাভিষিক্ত হবে। অতীন্দ্রিয়বাদীর একথা আবুবকরের মনে ছিল। তাই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন নবুওত দাবী করলেন, তখন সে ঈমান এনে তার সাথী হয়ে গেলে।

শিয়াদের প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার আল্লামা বাকের মজলিশী "রজইয়্যা" পুস্তিকায় দ্বাদশতম ইমাম

(১) "হামলা হায়দারী" শিয়াদের অত্যধিক জনপ্রিয় গ্রন্থসমূহের মধ্যে একটি। এটা শিয়া দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী লেখা ইসলামী ইতিহাসের কাব্যগ্রন্থ। এর গ্রন্থকার বাযেল ইরানী অত্যন্ত বলিষ্ঠ কবি। এ গ্রন্থটি ভারতে প্রথমবার প্রায় দেড়শ' বছর পূর্বে ১২৬৮ হিজরীতে মাতবা সুলতানী, লক্ষ্ণৌয়ে তৎকালীন মুজতাহিদেআযম সাইয়েদ মোহাম্মদের সংশোধন ও টীকা সহকারে মুদ্রিত হয়েছিল।

মেহদীর দিকে সম্বন্ধ করে তার এই উক্তি বর্ণনা করেছেনঃ—

ایشان ارزوئی گفته یهود بظاهر کلمتین گفتند از برائی طمع اینکه شاید ولایتی وحکومتی حضرت بایشان بدهد ودر باطن کافربودند ٥

সে ইহুদীর কথা অনুযায়ী কলেমায়ে তওহীদ ও কলেমায়ে রেসালাত মুখে উচ্চারণ করেছিল এই লোভে ও আশায় যে, সম্ভবতঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) শাসন ও ক্ষমতা তাকে ন্যস্ত করবেন। মনের মধ্যে সে কাফেরই ছিল। (আয়াতেবাইয়্যেনাত -৮৫-৮৬)

মোটকথা, খোমেনী তার উপরোক্ত বাক্যাবলীতে খলিফাত্রয় ও তাঁদের সহকর্মী সকল ছাহাবী সম্পর্কেই একথা বলেছেন যে, ইসলামে দাখিল হওয়ার পিছনে তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কেবল শাসন ও ক্ষমতা অর্জন করা ছিল এবং এর জন্যে তারা কোরআনের সুস্পষ্ট ফরমানের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারতেন। যদি তারা দেখতেন যে, এ উদ্দেশ্য ইসলাম পরিত্যাগ করে এবং (আবুজাহেল ও আবু লাহাবের ন্যায়) ইসলামের সাথে শত্রুতার ভূমিকা অবলম্বন করে অর্জিত হতে পারে, তবে তারা নির্দ্বিধায় তাও করতেন (১) এরপর এ প্রশ্নের জওয়াবে খোমেনী হযরত আববকর ও ওমর (রাঃ)-এর নাম উল্লেখ করেও গালিগালাজ করেছেন। পাঠকবর্গ পরে তা দেখতে পাবেন।

এ পর্যন্ত খোমেনীর তৃতীয় জওয়াব সম্পর্কে আলোচনা হল। এখন সুধি পাঠকবর্গ তার চতুর্থ জওয়াব লক্ষ্য করুনঃ—

(٤)انکه ممکن بوددرصورتیکه امام رادرقران ثبت میکردند آنها نیکه جز برائی دنیا وریاست بااسلام وقران سروکارنداشتند وقران راوسیلهء اجرائی نیت فاسده خود کرده بودند آن ایات راازقران بردارند وکتاب اسمانی راتحریف کنند وبرائی همیشه قران را ازنظر جها نیان بیندازند وتاروزقیامت این ننگ برائی مسلما نهاوقران آنها بماند وهما عیبی راکه مسلمانان بکتاب یهو دونصاری میگر فتند عینا برائی خود اینها ثابت شود (کشف الاسرار-١١٤) ٥

খোমেনীর এই চতুর্থ কথার সারমর্ম এই যে, যদি আল্লাহ্ তাআলা কোরআনে ইমামের নামও স্পষ্টরূপে উল্লেখ করতেন, তবে যারা ইসলাম ও কোরআনের সাথে কেবল দুনিয়া ও রাজত্বের জন্যেই সম্পর্ক স্থাপন করেছিল, কোরআনকে নিজেদের দুষ্ট উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার উপায় ও ওছিলা করে নিয়েছিল, এবং কোরআনের সাথে তাদের কোন সম্বন্ধ সহযোগিতা ছিলনা, তাদের জন্যে সম্ভবপর ছিল যে, তারা ইমামের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, এমনসব আয়াতকে কোরআন থেকে বিলুপ্ত করে দিত, এ পবিত্র ঐশী গ্রন্থে পরিবর্তন করত এবং কোরআনের সেই অংশকে চিরতরে দুনিয়াবাসীদের দৃষ্টি থেকে উধাও করে দিত। ফলে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত মুসলমান ও তাদের কোরআনের জন্যে এটা লজ্জার বিষয় হত। মুসলমানদের পক্ষ থেকে ইহুদী ও খৃষটানপদর গ্রন্থ সম্পর্কে পরিবর্তনের যে আপত্তি উত্থাপন করা হয়, সেই আপত্তিই তাদের

প্রতিও তাদের কোরআনের প্রতি আরোপিত হত।

খোমেনীর তৃতীয় জওয়াবের ব্যাখ্যায় উপরে যা লিখিত হয়েছেল, তার পরে এই চতুর্থ জওয়াবের উপর কোন মন্তব্যের প্রয়োজন নেই। এতে খোমেনী তাঁর আকীদা সাধারণ হঠকারী শিয়াদের ন্যায় পরিষ্কাররূপে প্রকাশ করেছেন যে, খলিফাত্রয় এবং তাঁদের বয়াত হাতে করে আন্তরিকভাবে সহযোগিতাকারী সকল ছাহাবায়ে কেরামই (নাউযুবিল্লাহ) কেবল দুনিয়া, হুকুমত ও রাজত্বের লোভেই ইসলাম ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে সম্পর্ক জুড়ে ছিলেন এবং তাঁরা এ উদ্দেশ্য হাছিলের জন্যে যেকোন কাজ করতে পারতেন; এমনকি, কোরআনে পরিবর্তনও করতে পারতেন। এরপর খোমেনীর পঞ্চম জওয়াব দেখুনঃ—

(٥) فرضاكه هيچ يك ازين امورغى شد باز خلاف از بين مسلمانها برغى خواست زيرا ممكن بودآن حزب رياست خواه كهازكار خودممكن نبوددست بردارند فورايك حديث پيغمبر اسلام نسبت دهندكه نزديك رحلت گفت امر شما باشورى باشد على بن ابى طالب راخدا ازين منصب خلع كرد (كشف الاسلارار-١١٤)

এ জওয়াবের সারমর্ম এই যে, ধরে নেওয়া যাক যদি কোরআনে স্পষ্টরূপে ইমাম ও প্রধান হর্তাকর্তারূপে হযরত আলীর নাম উল্লেখ করা হত এবং তৃতীয় ও চতুর্থ জওয়াবে আমরা যে সকল আশংকা ব্যক্ত করেছি, তারও কোন একটি সংঘটিত না হত, কোরআনে পরিবর্তনও না হত এবং হযরত আলীর নাম সম্বলিত আয়াতটি হুবহু বিদ্যমান থাকত, তবুও এটা সম্ভবপর ছিল না যে, ইমামত ও খেলাফতের প্রশ্নে মুসলমানদের মধ্যে সেই মতবিরোধ না হত, যা হয়েছে। কেননা, যে পার্টি (অর্থাৎ আবুবকর ও ওমরের পার্টি) কেবল হুকুমত ও ক্ষমতা প্রত্যাশী ছিল এবং এ লোভেই ইসলামমে দীক্ষিত হয়েছিল, তার জন্যে সম্ভবপর ছিল না যে, কোরআনের এ আয়াতের কারণে সে আপন লক্ষ্য বিসর্জন দিত। এ পার্টি তৎক্ষণাৎ এই বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি হাদীস গড়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে পেশ করে দিত যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জীবনের অন্তিম মুহূর্তে বলেছিলেনঃ তোমদরে ইমামত ও হুকুমতের ব্যাপার পারস্পরিক পরামর্শক্রমে মীমাংসিত হবে। আলী ইবনে আবু তালিবকে আল্লাহতাআলা ইমামতের পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছেন।

খোনেমী এ জওয়াবও তার অন্তরের আয়না। এটা কোন ব্যাখ্যা ও মন্তব্যের অপেক্ষা রাখে না। এরপরে খোমেনী শায়খায়নের নাম নিয়ে কটূক্তি করেছেন। প্রথম শিরোনাম রেখেছেন— "আবুবকরের কোরআন বিরোধিতা" এরপর দ্বিতীয় শিরোনামে রেখেছেন— "খোদার কোরআনের সাথে ওমরের বিরুদ্ধাচারণ।" প্রথম শিরোনামের অধীনে বলেছেন—

شايد بگوئيد اگر درقران امامت تصريح مى شد شيخين مخالفت نمى كردند وفرضاآنها مخالفت مى خو استند بكنند مسلمانهازآنها نمى پزيرفتند-ناچاردين مختصر چند ماده

(১) এক্ষণে আমাদের মূল বক্তব্য সুন্নীদেরকে উর্দ্দেশ্য করে। তাই আমরা এসব প্রলাপোক্তির খণ্ডনে কিছু বলার প্রয়োজন মনে কিরনা। আমাদের বিশ্বাস, প্রত্যেক মুসলামান এবং সেই অমুসলিমও, যারা ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে কিছু অবগতি রাখেন— এসব প্রলাপোক্তিকে প্রলাপোক্তিই মনে করবেন।

از مخالفتهائی آنها بصریح قرآن ذکر میکنیم تا روشن شودکه آنها مخالفت میکردند و مردم هم میپزیرفتند (کشف الاسرار- ۱۱۵)

উদ্দেশ্য এই যে, যদি আপনি বলেন— পরিষ্কাররূপে হযরত আলীর ইমামত উল্লেখ করা হলে শায়খায়ন (আবুবকর ও ওমর) তার বিরোধিতা করতে পারত না, তারা এর বিরোধিতা করতে চাইলে সাধারণ মুসলমান কোরআনের বিপরীতে তাদের কথা কবুল করত না। ফলে তাদের কথা কার্যকর হত না। খোমেনী বলেন, এ ধারণা ভ্রান্ত ; কেননা, আমরা এ বিষয়ের কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করছি যে, আবুবকর ও ওমর কোরআনের সুস্পষ্ট বিধানের খেলাফ কাজও ফয়সালা করেছেন এবং সাধারণ মুসলমানরা তা কবুলও করেছে— কেউ বিরোধিতা করেনি। এরপর খোমেনী তার ধারণা অনুযায়ী এর তিনটি দৃষ্টান্ত হযরত আবুবকর সম্পর্কে পেশ করেছেন। তন্মেধ্যে প্রথম দৃষ্টান্ত এই পেশ করেছেন যে, কোরআনের আয়াত ও তার বর্ণিত উত্তরাধিকার আইনের দৃষ্টিকোনে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কন্যা ফাতেমা যুহরা তাঁর ত্যাজ্য সম্পত্তির ওয়ারিস ছিলেন। কিন্তু আবুবকর খলিফা হওয়ার পরে পরিষ্কার কোরআনী বিধানের বিপরীতে তাঁকে ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে দেয় এবং রসূলে খোদার পক্ষ থেকে এই হাদীস পড়ে মুসলামানদের সামনে পেশ করে দেয় ঃ—

انامعشرالانبیاء لانورث ماترکناه صدقة

আমরা পয়গাম্বর গোষ্ঠির কেউ ওয়ারিশ হয়না। আমরা যা কিছু ছেড়ে যাই,তা সদকা। (کشف الاسرار-۱۱۵)

এটা আবুবকর ছিদ্দীকের কোরআন বিরোধিতার প্রথম দৃষ্টান্ত, যা খোমেনী পেশ করেছেন। আমরা পূর্বেও আরয করেছি যে, খোমেনীর জওয়াব দেওয়া এক্ষনে আমাদের আলোচ্য বিষয় নয় ; তবুও এখানে এতটুক ইশারা করা আমরা সমীচীন মনে করি না যে, হযরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এ হাদীস বর্ণনা করে আপন কন্যা হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর কন্যা হযরত হাফছা (রাঃ) কে ত্যাজ্য সম্পত্তির অংশ থেকে বঞ্চিত করে দেন। অথচ তাঁরাও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পত্নীরূপে তাঁর ওয়ারিশ ছিলেন। (এ বিষয়ের পূর্ণ আলোচনা নওয়াব মুহসিনুল মুলক মরহুমের "আয়াতে বাইয়েনাত" গ্রন্থে দ্রষ্টব্য)।
কোরআন বিরোধিতার অবশিষ্ট দু'টি দৃষ্টান্তও এমনি ধরণের। এরপরে "ওমরের কোরআন বিরোধিতা" শিরোনাম রেখে এক্ষেত্রেও চারটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে প্রথম দৃষ্টান্ত এই যে, "মুতআ'কে কোরআনে বৈধ করা হয়েছিল। (১) কিন্তু ওমর কোরআনী বিধানের বিপরীত একে হারাম সাব্যস্ত করেছে। অবশিষ্ট তিনটি দৃষ্টান্তও এমনি ধরণের এবং এমনি ওযনের। সত্য এই যে, প্রথম দৃষ্টান্ত শায়খায়ন ও সাধারণ ছাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে আন্তরিক জিঘাংসার প্রমাণ। এসব ঘষামাজা দোষারোপ ও আলোচনার উপর বিগত সাত আট শতাব্দীতে আরবী, ফার্সী ও উর্দূতেও শতশত নয়, হাজারো ছোট বড় গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও কথিকা লিখিত হয়েছে। তাই আমরা এসব দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা এবং এগুলোর উপর মন্তব্য করা অনাবশ্যক মনে করেছি! এছাড়া সপ্তম ও অষ্টম

শতাব্দীর শায়খ ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) থেকে আমাদের চতুর্দশ শতাব্দীর হযরত মওলানা আবদুশ শাকুর ফারুকী লক্ষ্ণৌভী (রহঃ) পযন্ত সুন্নী দার্শনিক ও গ্রন্থকারগণ এসব বিষয়ে যা কিছু লিখেছেন, আমার মতে তার উপর না কোন সংযোজনের প্রয়োজন আছে, না অবকাশ আছে। এছাড়া এগ্রন্থের আলোচ্য বিষয় শিয়া-সুন্নী বিরোধপূর্ণ প্রশ্নে আলোচনা ও বিতর্ক নয়। এতে আমাদের বক্তব্য সুন্নীদেরকে লক্ষ্য করেই; বিশেষতঃ তাদেরকে লক্ষ্য করে, যারা শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবীদের অন্তর্ভুক্ত, যারা সেই প্রোপাগাণ্ডায় প্রভাবান্বিত, যা ইরানী দূতাবাস ও এজেন্টদের মাধ্যমে খোমেনীর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে করা হচ্ছে যে, তিনি শিয়া-সুন্নী মতভেদের উর্ধ্বে; বরং তাতে অসন্তুষ্ট। তিনি ইসলামী ঐক্যের আহবায়ক। তিনি খুলাফায়ে রাশেদীনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং যারা শিয়া-সুন্নী মতবিরোধের কথা বলে তাদেরকে শয়তান সাব্যস্তকারী, (শতকরা একশ'ভাগ মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত) এ প্রোপাগাণ্ডা এভাবে করা হচ্ছে যে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী সমগ্র পরিমণ্ডলকে এর দ্বারা পূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে। (১)

মোটকথা এ প্রবন্ধে আমাদের সম্বোধন সুন্নীদের মধ্য থেকে বিশেষভাবে তাদের প্রতি, যারা শিয়াদের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞতা ও সরলতার কারণে এ প্রোপাগাণ্ডায় বিশ্বাস করে। আমাদের লক্ষ্য তাদেরকেই খোমেনীর স্বরূপ এবং খোলাফায়ে রাশেদীন, ছাহাবায়ে কেরাম ও সুন্নীদের সম্পর্কে তার চিন্তাধারা ও মনোভাব সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করা। আমরা মনে করি যদি বিবেক বিকৃত করা না হয়ে থাকে এবং হেদায়েত বঞ্চিত না হওয়ার ফয়সালা না হয়ে থাকে, তবে কাশফুল আসরার থেকে এখানে খোমেনীর যে সকল উদ্বৃতি পেশ করা হয়েছে, তাই আমাদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে যথেষ্ট।

হাঁ, এ প্রসঙ্গে হযরত ফারুকে আযমের শানে খোমেনীর একটি চরম পীড়াদায়ক ও মর্মভেদী বাক্য আমরা মনের উপর জোর দিয়ে এই ধোকাগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের শিক্ষা ও চক্ষু উন্মীলনের জন্যে উদ্বৃত করছি।

খোমেনী مخالفت عمر باقران خدا শিরোনামের অধীনে সবশেষে বিখ্যাত ক্বেরতাসের হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে ফারুকে আযমের শানে তার শেষ বাক্য এইঃ—

این کلام یاده ازاصل کفر وزندقه ظاهر شده مخالفت است بایاتی ازقرانکریم

এতে হযরত ফারুকে আযমকে পরিষ্কার ভাষায় কাফের ও যিন্দীক সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ ধৃষ্টতার উপর অনেক কিছু লিখতে মন চায়। কিন্তু এতে নিজের ক্রোধ ও গোস্সা প্রকাশ করা ছাড়া উপকার হবে না। তাই এর প্রতিশোধ (পরাক্রান্ত প্রতিশোধ গ্রহণকারী) আল্লাহর কাছেই

(১) আমাদের অধিকাংশ পাঠক অবগত নন যে, শিয়া মযহাবে মুতআ কেবল জায়েজ ও হালালই নয় বরং উচ্চস্তরের ইবাদত। তফসীর গ্রন্থে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দিকে সম্বন্ধ করে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে—

من تمتع مرة فدرجتة كدرجة الحسين (ع)ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن (ع) ومن تمتع ثلاث مرات فد رجته كدرجة على (ع) ومن تمتع اربع مرات فدرجته كد رجتى

যে একবার মুতআ করে, সে ইমাম হুসায়ন (আঃ)-এর মর্তবা পাবে। যে দুইবার মুতআ করে সে ইমাম হাসান (রাঃ)-এর মর্তবা পাবে, যে তিনবার মুতআ করে, সে আলী (রাঃ)-এর মর্তবা পাবে। যে চার বার মুতআ করে, সে আমার (অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্'র) মর্তবা পাবে। নাউযুবিল্লাহ্ (১ম খণ্ড-২৫৬ পৃঃ)

সোপর্দ করছি।

খোমেনী এ আলোচনা শেষে একটি শিরোনাম রেখেছেন— (অর্থাৎ শায়খখায়নের পক্ষ থেকে কোরআন বিরোধীতা সম্পর্কে আমাদের উল্লিখিত আলোচনার ফলাফল)। এর অধীনে খোমেনী লিখেনঃ—

ازمجموعه‌این مادها معلوم شد مخالفت کردن شیخین ازقرآن درحضورمسلمانان یك امر خیلی مهمی نه بودومسلمانان نیز باداخل درحزب خودآنهابوده ودر مقصودبا آنها بودند ویااگر همراه نبودند جرآت خرفزدن درمقابل آنهاكه باپیغمبر خداودختراواین طور سلوك میکردند ند اشتند ویااگرگاهی یکی ازآنهایکی حرفی میزد بسخن اوارجی نمیکز اشتند وجمله کلام انکه اگر در قرآن هم این امر باصراحت لهجه ذکر میشد بازآنهادست از مقصود خود بر نمیداشتند وترك ریاست برائی گفته خدانمی کردند منتها چون ابو بکر ظا هر سازیش بیشتر بود بایکحدیث ساختگی کاررااتمام میکر دچنانچه راجع بایات ارث دیدید واز عمرهم استبعدی نداشت که آخرامر بگویدخدایا جبرئیل یا پیغمبر درفرستادن یا آوردن این آیت اشتباه کردند ومهجور شدند آتگاه سنیان نیز ازجائی بر میخواستند ومتابعت اورا میکردند چنانچه دراین همه تغیرات که دردین اسلام داد متابعت اونکردند وقول اورابایات قرآنی وگفتهائی پیغمبر اسلام مقدم داشتند، (کشف الاسرار-۱۱۹-۱۲۰)

এ নাতিদীর্ঘ উক্তিতে খোমেনী তার পাঠকবর্গের সামনে সেই আলোচনার ফলাফল ও সার সংক্ষেপ পেশ করেছেন, যা তিনি হযরত আবুবকর ও ওমরের কোরআন বিরোধীতা সম্পর্কে করেছেন। (পাঠকবর্গ যা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছেন) খোমেনীর এই উক্তির সারকথা এই যে, আমরা আবুবকর ও ওমরের কোরআন বিরোধীতার যেসব দৃষ্টান্ত দিয়েছি, সেগুলো থেকে জানা যায় যে, মুসলমানদের উপস্থিতিতে এবং প্রকাশ্যে তাদের সামনে কোরআনী বিধানাবলীর বিপরীত আচরণ অবলম্বন করা তাদের উভয়ের জন্যে কোন গুরুত্বপূর্ণ ও অসাধরণ বিষয় ছিল না। তখনকার মুসলমানদের (অর্থাৎ ছাহাবায়ে কেরামের) অবস্থা এই ছিল যে, হয় তারা তাদের পার্টিতে শামিল এবং শাসন ও ক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্যে তাদের সাথে শরীক, তাদের সহকর্মী ও পূর্ণরূপে সমমনা ছিল, না হয় পার্টিতে শামিল না হলেও তারা শক্তিশালী মুনাফিকদের বিরুদ্ধে এক অক্ষরও মুখে উচ্চারণ করার দুঃসাহস করতে পারতনা। যে মুনাফিকরা স্বয়ং রসূলে খোদা ও তাঁর কলিজার টুকরা ফাতেমার সাথে অন্যায় ব্যবহার করেছিল। (১) তারা তাদেরকে ভয় করত। ফলে তাদের বিরুদ্ধে মুখ খোলার সাহসই তাদের মধ্যে ছিল না। কেউ তাদের সাথে কোন কথা বলার সাহস করলেও এবং কিছু বললেও তারা তার কোন পরওয়া করতনা এবং যা করার হত, তাই করত। সারকথা এই যে, কোরআনে

ইমামতের জন্যে হযরত আলীর নাম স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হলেও তারা (আবুবকর, ওমর ও তাদের পার্টি) আল্লাহর ফরমানের কারণে শাসন ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পরিকল্পনা থেকে কখনও হাত গুটিয়ে নিত না। আবুবকর প্রথম থেকে পূর্ণ পরিকল্পনা তৈরী করে রেখেছিল। সে কোরআনের সেই আয়াতের বিপরীতে একটি হাদীস গড়ে পেশ করে দিত এবং কিসসা খতম করে দিত; যেমন সে হযরত ফাতেমাকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার জন্যে করেছিল। ওমরের কাছ থেকে মোটেই অসম্ভব ছিল না যে, সে সেই আয়াত সম্পর্কে একথা বলে ব্যাপার শেষ করে দিত যে, এ আয়াত নাযিল করার ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহর তরফ থেকে ভুল হয়ে গেছে অথবা জিবরাইল কিংবা রসূলে খোদার তরফ থেকে এ আয়াত পৌঁছানোর ব্যাপারে ত্রুটি বিচ্যুতি হয়ে গেছে। তখন সুন্নীরাও তার সমর্থনে দাঁড়িয়ে যেত এবং খোদার ফরমানের মোকাবিলায় তার কথা মেনে নিত, যেমন সেই সকল পরিবর্তনের ব্যাপারে তাদের আচরণ তাই রয়েছে, যা ওমর ও ইসলাম ধর্ম ও তার বিধানাবলীতে করেছে। এসব ক্ষেত্রে সুন্নীরা কোরআনী আয়াত ও রসূলে খোদার উক্তির মোকাবিলায় ওমরের কথাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং তারই অনুসরণ করেছে।

হযরত ওছমান যুন্নুরাইন সম্পর্কেঃ—

সম্ভবতঃ পাঠকবর্গ অনুভব করে থাকবেন যে, শায়খায়ন, সাধারণ ছাহাবায়ে কেরাম এবং তাঁদের পরে তাদের অনুসারী পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সুন্নীদের সম্পর্কে তো খোমেনী এস্থলে নিজের চিন্তাধারা ও গবেষণা প্রকাশ করেছেন; কিন্তু তৃতীয় খলিফা হযরত ওছমান (রাঃ)-এর কোন উল্লেখই আসেনি। সেমতে পাঠকবর্গের জানা উচিত যে, খোমেনীর মতে তিনি (নাউযুবিল্লাহ) এমন অপরাধী যে, খোমেনী তাঁকে এবং তাঁর সাথে হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) কে এয়াযীদের সাথে অপরাধীদের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। কাশফুল আসরার গ্রন্থে খোমেনী প্রথমে লিখেছেন যে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর রসূলকে প্রেরণ করে ইসলামের এবং খোদায়ী আইন অনুযায়ী একটি ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্রের প্রাচীর নির্মাণ করান। এ প্রচীর নির্মাণ সমাপ্ত হলে

(১) এই অন্যায় ব্যবহার দ্বারা খোমেনী সেই সব শিয়া রেওয়ায়েতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যেগুলোতে বর্ণিত হয়েছে যে, (নাউযুবিল্লাহ) শায়খায়ন ও তাদের পার্টির বিশেষ কর্মীরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি কেমন নির্যাতন চালায় ও তাঁকে জ্বালাতন করে। তাঁর ওফাতের পরে তাঁর কলিজার টুকরা ফাতেমার সাথে কেমন জালেম সুলভ আচরণ করেছে। আবুবকর তাকে পিতার ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে দেয় এবং (নাউযুবিল্লাহ) ওমর তার বাহুতে বেত্রাঘাত করে, যার ফলে তার বাহু ফুলে যায়। গৃহের দরজা তার উপর ফেলে দেয়। ফলে তার পাঁজরের হাড্ডি ভেঙ্গে যায় এবং পেটের বাচ্চা শহীদ হয়ে যায়, যার নাম রসূলুল্লাহ (সাঃ) জন্মের পূর্বেই "মুহসিন" রেখেছিলেন। এই বাজে রেওয়ায়েতটি মোল্লা বাকের মজলিসী উল্লেখ করেছে। (এর তরজমা প্রথম খণ্ডের ১৭২ পৃষ্ঠায় দেখতে পাবেন)। প্রকাশ থাকে যে, খোমেনী তাঁর কাশফুল আসরার গ্রন্থের ১২১ পৃষ্ঠায় মজলিসীর গ্রন্থসমূহকে নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করে এগুলো অধ্যয়নের পরামর্শ দিয়েছেন। এছাড়া এ রেওয়ায়েতটি শিয়াদের নির্ভরযোগ্যতম গ্রন্থ "ইহতিজাজে তবরিযী"র ৪৭ পৃষ্ঠায়ও রয়েছে। স্বয়ং খোমেনী ও কাশফুল আসরারে হযরত ওমর সম্পর্কে লিখেন যে, সে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অন্তিম সময়ে তার শানে বেআদবী করে। ফলে তাঁর পবিত্র আত্মায় আঘাত লাগে এবং এ আঘাত নিয়েই তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় হন। এ গ্রন্থেই লিখেছেন যে, ওমর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর গৃহে অগ্নিসংযোগ করে। (১১১ পৃঃ)। معاذالله ولاحول ولاقوة الابالله

বিবেকের তাগিদ এই যে, খোদা একে স্থায়ী রাখার এবং এর হেফাযত করারও বন্দোবস্ত করবেন এবং পয়গম্বরের মাধ্যমেই এ সম্পর্কে নির্দেশ জারি করবেন। এরূপ না করলে তিনি এ বিষয়ে যোগ্য হবেন না যে, আমরা তাকে খোদা মেনে তার এবাদত করব। এরপর এ প্রসঙ্গেই খোমেনী লিখেনঃ—

ماخدائیرا پر ستش میکنیم ومیشناسیم که کارها یش براساس عقل پائیدارو بخلاف گفته عقل هیچ کاری نه کند نه آن خدائی که بنائی مرتفع ازخداپر ستی وعدالت و دینداری بناکند وخود بخرابی آن بکوشد ویزیدومعاویه وعثمان وازین قبیل چپا ولچی ادچی هائی دیگر رابمردم امارت دهد (۱۰۷ص)

অর্থ এই যে, আমরা এমন খোদার এবাদত করি এবং তাকেই মানি, যার সমস্ত কাজ বিবেক ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী হয়। আমরা এমন খোদাকে জানি না, যে খোদা-অর্চনা, ন্যায়পরায়নতা ও ধর্মপরায়নতার এক আলীশান প্রাসাদ তৈরী করে অতঃপর নিজেই তা বরবাদ করতে সচেষ্ট হয় এভাবে যে, এয়াযীদ, মুয়াবিয়া ও ওছমানের মত জালেম ও দুশ্চরিত্রদেরকে শাসনক্ষমতা সোপর্দ করে দেয়।

এক্ষণে এ বিষয়ের উপর আমাদের কোন মন্তব্য নেই। পাঠকবর্গকে কেবল বলতে চাই যে, হযরত ওছমানও, (যার সাথে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একের পর এক আপন দু'কন্যার বিবাহ দেন। এবং তিনি ব্যতীত এ গৌরব অন্য কেউ অর্জন করতে পারেনি।) খোমেনীর মতে তিনি এতবড় অপরাধী।

এখন রয়ে গেলেন কেবল হযরত আলী এবং তাঁর তিন অথবা চারজন সঙ্গী (হযরত সালমান ফার্সী, আবু যর গেফারী, মেকদাদ ইবনুল আসওয়াদ এবং এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী চতুর্থ আম্মার ইবনে ইয়াসির)। তখনকার একলাখেরও বেশী মুসলমানের মধ্যে শিয়া রেওয়ায়েত অনুযায়ী মাত্র এই পাঁচজনই ছিলেন, যারা মুনাফিক ছিলেন না— সত্যিকার মুমিন ছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর ওফাতের পরেও তারা ইসলামের উপর দৃঢ়পদ ছিলেন। একথাও বলা বাহুল্য যে, এই পাঁচজনের মধ্যেও আমীরের মর্যাদা হযরত আলীরই ছিল।

অবশিষ্ট চারজন তাঁর অনুসারী ও অনুগামী ছিলেন। কিন্তু (শিয়া রেওয়ায়েত ও খোমেনীর বর্ণনা অনুযায়ী) তারা জানতেন যে, আবূ বকর (নাউযুবিল্লাহ্) মুমিন নয়— মুনাফিক। সে কেবল রাজত্ব ও ক্ষমতার লোভে নিজেকে মুসলমান জাহির করে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে জড়িত ছিল। সে রাজত্ব লাভের উদ্দেশ্যে কোরআনে পরিবর্তনও করতে পারে এবং কোন সময় প্রয়োজন অনুভব করলে ইসলাম ত্যাগ করে (আবূজহল ও আবূ লাহাবের ন্যায়) ইসলাম বিদ্বেষের ভূমিকা অবলম্বন করে রাজত্ব ও ক্ষমতা লাভ করতে পারলে তাও করবে। (মোট কথা, আবুবকর সম্পর্ক এতসব জনা সত্ত্বেও) হযরত আলী চাপের মুখে বাধ্য হয়ে "তাকিয়্যা" তথা ধোকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে মিথ্যার পথ অবলম্বন করে তার হাতে বয়াত করেন এবং তার চারজন সঙ্গীও এমনিভাবে বয়াত করেন। শিয়াদের নির্ভরযোগ্য কিতাব ইহ্‌তেজাজে তবরিযী"তে বলা হয়েছেঃ-(৪৭ص) مامن الامة احد بايع مكرها غيرعلى واربعتنا

আলী ও আমাদের চারজন ছাড়া উম্মতের কেউ আবুবকরের হাতে বয়াত জোরজবরদস্তিতে বাধ্য হয়ে করেনি। (অর্থাৎ তাদের ছাড়া সকল মুসলমান স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে হযরত আবুবকরের হাতে বয়াত করেন।)

এরপর শিয়া মযহাবের এটা স্বীকৃত বিষয় যে, হযরত আলী আবুবকর সমগ্র খেলাফত আমলে এই "তাকিয়্যা" তথা মিথ্যার উপরই কায়েম থাকেন। দিনে পাঁচবার তাঁর পিছনে নামায পড়তে থাকেন এবং খেলাফতের কাজকর্ম সর্বদা সহযোগীতা করতে থাকেন। এরপর এ আচরণই হযরত ওমরের প্রায় দশ বছরের খেলাফত আমলেও কায়েম থাকে। মোটকথা, খলিফাত্রয়ের গোটা চব্বিশ বছরের খেলাফতকালে হযরত আলী এ পন্থাই অনুসরণ করেন। তিনি কখনও জুমায়া, ঈদের নামায অথবা হজ্বের মত সমাবেশে ইমামত ও খেলাফতের প্রশ্নে নিজের বিরোধ প্রকট করেননি। তিনি সহযোগীতা ও আনুগত্যই করতে থাকেন।

এরপর যে জোরজবরদস্তিতে বাধ্য হয়ে হযরত আলী বয়াত করেছিলেন, তার যে বিবরণ শিয়া রেওয়ায়তসমূহে দেওয়া হয়েছে, তা অত্যন্ত লজ্জাকর। এবং স্বয়ং আলী মুর্তযার পক্ষে চরম অবমাননাকর। ইহতিজাজে তবরিযীর যে রেওয়াতে এই জোরজবরের বয়াতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাতেই আছে যে, হযরত আলীর গলায় রশি লাগিয়ে গৃহ থেকে হেঁচড়িয়ে আবুবকরের কাছে আনা হয়। সেখানে ওমর ও খালেদ ইবনে ওলীদ প্রমুখ তরবারি হস্তে দণ্ডায়মান ছিল। (নাউযুবিল্লাহ্) ওমর ধমকি দিয়ে বললঃ বয়াত কর, নতুবা গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হবে। এভাবে বাধ্য করা হলে অবশেষে হযরত আলী বয়াত করলেন।" (সংক্ষেপিত—৪৭, ৪৮ পৃঃ)

এ রেওয়ায়েতে হযরত আলীর ঘোর অবমাননা ও লাঞ্ছনা করা হয়েছে এবং তাকে অত্যন্ত ভীরু ও হীনচরিত্র দেখানো হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয়, শিয়া গ্রন্থকাররা এই প্রলাপোক্তিমূলক রেওয়ায়েতটিকে তাদের রচনাবলীতে শামিল করা সমীচীন মনে করল কিরূপে? আমাদের মতে এর কোন যুক্তিযুক্ত কারণ এছাড়া বর্ণনা করা যায় না যে, শায়খায়নের শত্রুতা এবং তাঁদেরকে জালেম ও স্বৈরাচারী সপ্রমাণ করার প্রেরণা এই গ্রন্থাকারদের মধ্যে এমন প্রবল থাকার ধারণা করেছে যে, তারা চিন্তাই করতে পারেনি যে, এ রেওয়ায়েত দ্বারা স্বয়ং হযরত আলীর ভাবমূর্তি কতটুকু বিসদৃশ হয়ে যায়।

হযরত আলী মুর্তযা তো উম্মতের পূর্ববর্তী ও অগ্রবর্তী মনীষীবৃন্দের অন্যতম। তাঁর মধ্যে খোদাপ্রদত্ত অসাধারণ শক্তি, বীরত্ব ও স্বভাবগত আত্মমর্যাদাবোধ ছাড়াও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সংসর্গ ও শিক্ষাদীক্ষার কল্যাণে অপূর্ব আত্মত্যাগ, সত্যের পথে প্রাণোৎসর্গকরণ ও শাহাদাতের বাসনা ইত্যাদি গুণাবলী প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁর সম্পর্কে এমন ভীরুতা ও হীনচরিত্রতা কল্পনাও করা যায় না। পরবর্তী কালেও এ উম্মতের মধ্যে এহেন দৃঢ়চেতা ব্যক্তিবর্গের আবির্ভাব ঘটেছে, যারা كلمة حق عند سلطان جائر (অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলা) তথা জেহাদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ইমাম আবু হানিফা তাঁর সমসাময়িক খলিফার বাসনা ও ফরমায়েশ পূর্ণ করতে পরিষ্কার অস্বীকার করেন। কেননা, সেই বাসনা তাঁর মতে ভ্রান্ত ও ধর্মপরায়নতার বিপরীত ছিল। তিনি এর শাস্তিস্বরূপ জেলে যাওয়া পছন্দ করেন এবং জেলের নির্যাতন সহ্য করেন। ইমাম মালেককে তদানীন্তন আব্বাসীয়া শানকর্তা জোরেজবরে তালাক

নেওয়ার মসআলা বর্ণনা করতে নিষেধ করে দেন এবং তিনি এ নিষেধাজ্ঞা মেনে নিতে অস্বীকার করেন। সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে কঠোরতম শাস্তি দেওয়া হয় এবং উটের উপর সওয়ার করিয়ে অপরাধীদের ন্যায় শহর প্রদক্ষিণ করানো হয়, যাতে জনসাধারণ দেখে নেয় এবং বুঝে নেয় যে, কোন ব্যক্তি যত বড় এবং যত অনুসৃতই হোক, সে শাসকবর্গের কথা অমান্য করলে তার পরিণতি এই হয়। কিন্তু ইমাম মালেক এই প্রদক্ষিণের মধ্যেই চীৎকার করে করে বলতেনঃ—

من عرفني فقد عرفني ومن لم يعر فني فانا مالك بن انس اقول طلاق المكره ليس بشي

"যে আমাকে চিনে, সে তো চিনেই। আর যে চিনেনা, তাকে আমি বলছি— আমি মালেক ইবনে আনাস। শুনে রাখ, আমি বলছি— জবরদস্তিকৃত ব্যক্তির তালাক কিছুই নয়।" অনুরূপভাবে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে সমসাময়িক খলিফা "কোরআন সৃষ্ট কি-না" এ প্রশ্নে তার মযহাবের সাথে একমত হতে এবং এর বিপরীতে নিজের মযহাব প্রকাশ না করতে বাধ্য করে। কিন্তু ইমাম সাহেব তা মানতে অস্বীকৃত হলে তাঁর উপর জল্লাদ চাপিয়ে দেওয়া হয়, যে অবিশ্রান্ত বেত্রাঘাত করে তাঁর দেহ রক্তাপ্লুত করে দেয়। কিন্তু তখনও তিনি চীৎকার করে একথাই বলতেন— القران كلام الله غير مخلوق "কোরআন আল্লাহ্র কালাম-সৃষ্ট নয়।"

এগুলো ইসলামের প্রাথমিক শতাব্দীর দৃষ্টান্ত। প্রতি যুগেই উম্মতের মধ্যে এমন স্বাধীনচেতা ও দৃঢ়তা মনীষীর আবির্ভাব ঘটেছে, যাদের আলোচনা ইতিহাস গ্রন্থসমূহে দ্রষ্টব্য। খোদ আমাদের যুগেও এধরনের দৃষ্টান্ত থেকে খালি নয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪—১৯১৮ খৃঃ) জয়লাভ করে বৃটিশ সরকার প্রমাণ করেছিল যে, সে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ শক্তি। ঠিক সেই সময়েই এ সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের এদেশে খেলাফত আন্দোলন তুঙ্গে ছিল। আল্লাহ্তায়ালার হাজারো বান্দা ইংরেজের রাষ্ট্রে বাস করে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীসুলভ বক্তৃতা দিত; অথচ তারা জানত যে, এর পরিনতিতে তাদেরকে জেলে নিক্ষেপ করা হবে। (তখনকার জেল যেন দুনিয়ার জাহান্নাম ছিল)। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে হযরত মওলানা সাইয়েদ হুসাইন আহমদ মদনী (রহঃ)-এর ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি এক বক্তৃতায় ঘোষণা করেন যে, ইংরেজ সরকারের সেনাবাহিনীতে চাকুরী করা হারাম। এ বক্তৃতার কারণে তাঁর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চলে, যা "করাচী মোকদ্দমা" নামে প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। আদালতের পক্ষ থেকে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ আপনি এ বক্তৃতা করেছিলেন কি? তিনি বললেনঃ

"হ্যাঁ, আমি একথাই বলেছিলাম এবং এখনও আবার বলছি ইংরেজ সরকারের সেনাবাহিনীতে চাকুরী করা হারাম।" এরপর যেরূপ হওয়া উচিত ছিল, তাই হল। আদালতের পক্ষ থেকে তাঁকে জেলের আদেশ শুনানো হল এবং তিনি কারাভোগ করলেন।

মোটকথা, হযরত আলী চাপ ও ধমকির মুখে বাধ্য হয়ে এমন ব্যক্তির হাতে বয়াত করেছিলেন, যার সম্পর্কে তিনি জানতেন যে, সে মুমিন নয়— মুনাফিক এবং এরপর তাঁর আচরণও বাহ্যিক আনুগত্য ও সহযোগীতার ছিল, এরপর খলিফাত্রয়ের গোটা চব্বিশ বছরের খেলাফতকালে তাকিয়ার নামে এ আচরণই তাঁর অব্যাহত ছিল— শিয়া রেওয়ায়েতসমূহের এ বর্ণনা আমাদের

মতে অকাট্যরূপে ভ্রান্ত ও হযরত আলীর বিরুদ্ধে জঘণ্য অপবাদ ছাড়া কিছু নয়। একে বিশুদ্ধ মেনে নিলে হযরত আলীর এ যোগ্যতাও থাকে না যে, কোন আদালতে তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ করা যায়।
হযরত আলীর প্রতি এ আদেশই আল্লাহ্ ও রসূলের পক্ষ থেকে ছিল— একথা বলা (যেমন শিয়া রেওয়ায়েতসমূহে বলা হয়েছে), عذرگناه بدترازگناه (পাপের ওযর পাপের চেয়েও জঘণ্য) এবং আল্লাহ্ ও রসূলকে এ জঘণ্য পাপের জন্য দায়ী সাব্যস্ত করা বৈ নয়। আমরা হযরত আলী মুর্তযার ভাবমূর্তি নির্মল করার জন্য এখানে এত দীর্ঘ আলোচনা জরুরী মনে করেছি। নতুবা আমরা আমাদের পাঠকবর্গকে কেবল একথা বলতে চেয়েছিলাম যে, হযরত আবূবকর, ওমর, ওছমান যুন্নুরায়ন এবং সাধারণ ছাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে খোমেনীর মনোভাব তো তাদের জানা হয়ে গেছে। এখন হযরত আলী মুর্তযা সম্পর্কেও তার দৃষ্টিভক্তি ও আকীদা পাঠকবর্গের সম্মুখে থাকুক, যে সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া শিয়া মযহাব ও খোমেনীকে বুঝার জন্যে জরুরী।

হযরত শায়খায়ন, যুন্নুরায়ন প্রায় সকল ছাহাবায়ে কেরাম এবং সুন্নীদের সম্পর্কে খোমেনীর কয়েকটি উক্তি ঃ

খোমেনীর গ্রন্থ كشف الاسرار থেকে সেসকল উদ্ধৃতি ইতিপূর্বে পাঠকবর্গের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে, তাতে তিনি শায়খায়ন, যুন্নুরায়ন, সাধারণ ছাহাবায়ে কেরাম এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সুন্নীদের সম্পর্কে রাখঢাক ছাড়াই স্বীয় আকীদা ও বিশ্বাস স্পষ্টভাষায় পূর্ণ দাবী সহকারে প্রকাশ করেছেন। এসম্পর্কে আমাদের কিছু আরজ করার পূর্বে সংক্ষেপে খোমেনীর এসব উক্তির সারকথা কয়েকটি নম্বরে একত্রিত করে পাঠকবর্গের সামনে পেশ করা সমীচীন মনে হয়। এতে আমদের ওযর এই যে, نقل كفركفر نباشد অর্থাৎ কুফরী কথা উদ্ধৃতি করা কুফরী নয়।

(১) শায়খায়ন তথা আবুবকর ও ওমর আন্তরিকভাবের মুমিন ছিলেন না। কেবল রাজত্ব ও ক্ষমতালাভের লালসায় তারা বাহ্যতঃ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে নিজেদেরকে জড়িয়ে রেখেছিলেন।

(২) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পরে রাজত্ব ও ক্ষমতা অর্জন করার যে পরিকল্পনা তাদের ছিল তার জন্যে তারা শুরু থেকেই চক্রান্তে লিপ্ত ছিলেন এবং সমমনাদের নিয়ে একটি শক্তিশালী দল গঠন করেছিলেন। তাদের সকলের আসল লক্ষ্য রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পরে রাষ্ট্র করায়ত্ত করে নেওয়াই ছিল। এছাড়া ইসলামের সাথে ও কোরআনের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না।

(৩) যদি ধরে নেওয়ার পর্যায়ে কোরআনে স্পষ্টভাবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পরে ইমামত ও খেলাফতের জন্যে হযরত আলীর মনোনয়ন উল্লেখও করা হত, তবুও তারা কোরআনী

আয়াতও খোদায়ী ফরমানের কারণে সেই লক্ষ্য ও পরিকল্পনা থেকে হাত গুটিয়ে নিতেন না, যার জন্য তারা নিজেদেরকে ইসলাম ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে জড়িয়ে রেখেছিলেন। এ উদ্দেশ্যের জন্যে যেসকল অপকৌশল ও ছলচাতুরী। করার প্রয়োজন হত, তারা সব করতেন, এবং খোদায়ী ফরমানের কোন পরওয়া করতেন না।

(৪) কোরআনী বিধান ও খোদায়ী ফরমানের বিপরীত করা তাদের জন্য সাধারণ ব্যাপার ছিল। তারা অনেক কোরআনী বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন এবং খোদায়ী ফরমানের কোন পরওয়ানা করেননি।

(৫) যদি তারা স্বীয় লক্ষ্য (রাজত্ব ও ক্ষমতা) অর্জন করার জন্যে কোরআন থেকে সেইসব আয়াত লুপ্ত করা জরুরী মনে করতেন, যেগুলোতে ইমামতের জন্যে হযরত আলীর মনোনয়নের উল্লেখ থাকত, তবে তারা এসব আয়াতকে কোরআন থেকে বহিষ্কার করে দিতেন। এটা তাদের জন্যে মামূলী বিষয় হত।

(৬) যদি তারা আয়াতগুলোকে কোরআন থেকে বহিষ্কার না করতেন, তবে এটা করতে পারতেন এবং করতেন যে, এ বিষয়বস্তুর একটি হাদীস গড়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে জনগণকে শুনিয়ে দিতেন এবং বলতেন যে, অন্তিম সময়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছিলেন— ইমাম ও খলিফার নির্বাচন সকলের পরামর্শক্রমে মীমাংসিত হবে এবং আলীকে যে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল এবং কোরআনেও তা উল্লেখ করা হয়েছিল, তা প্রত্যাহার করে তাকে এপদ থেকে অপসারণ করা হয়েছে।

(৭) আর ওমরের পক্ষে এটা বলাও সম্ভবপর ছিল যে, এসব আয়াত নাযিল করার ব্যাপারে স্বয়ং খোদার ভুল হয়ে গেছে অথবা এসব আয়াত পৌঁছানোর ব্যাপারে জিবরাঈল কিংবা রসূলে খোদা বিভ্রান্ত হয়েছেন।

(৮) খোমেনী হাদীসে কিরতাসেরই উল্লেখ করে অত্যন্ত বেদনাদায়ক বিলাপের ভঙ্গিতে হযরত ওমর সম্পর্কে লিখেন যে, রসূলে করীম (সাঃ)-এর অন্তিম সময়ে তিনি তাঁর শানে এমন ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেন, যার কারণে তাঁর পবিত্র আত্মা অত্যন্ত ব্যথিত হয় এবং তিনি এ ব্যথা নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। এস্থলে খোমেনী স্পষ্টভাষায় একথাও লিখেছেন যে, ওমরের এই ধৃষ্টতাপূর্ণ কথা প্রকৃতপক্ষে তার অন্তর ও অভ্যন্তরের কুফর ও অবিশ্বাসেরই বহিঃপ্রকাশ ছিল। অর্থাৎ এতে প্রকাশ পেয়েছিল যে, সে অন্তরে কাফের ও যিন্দীক ছিল।

(৯) শায়খায়ন (ও তাদের দলীয় লোকেরা) যদি দেখত যে, হযরত আলীর মনোনয়ন সম্বলিত আয়াতের কারণে তারা ইসলামের সাথে জড়িত থেকে লক্ষ্য অর্জনে সফল হতে পারবে না। এবং ইসলামকে বর্জন করে এবং তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেই লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে, তবে তারা তাই করত এবং আবূজহল ও আবূলাহাবের অধিষ্ঠান অবলম্বন করে সদলবলে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সারিবদ্ধ হয়ে যেত।

(১০) ওছমান, মোয়াবিয়া ও এয়াযীদ একই রকম ও একই স্তরের জালেম ও অপরাধী ছিল।

(১১) সাধারণ ছাহাবীরা হয় আবূবকর ও ওমরের বিশেষ দলে শামিল, তাদের সহকর্মী ও সমমনা, ছিল, না হয় তারা তাদেরকে ভয় করত এবং তাদের বিরুদ্ধে এক অক্ষরও মুখে

উচ্চারণ করার দুঃসাহস করত না।

(১২) খোমেনী বলেনঃ সারা বিশ্বের সুন্নীদের অবস্থা এই যে, আবূবকর ও ওমর কোরআনের স্পষ্ট বিধানের বিপরীতে যা কিছু বলে, তারা তাকেই কবুল করে নেয় এবং তারই অনুবর্তী হয়। ওমর ইসলামের যেসকল বিধান জারি করেছে, সুন্নীরা কোরআনী বিধানের মোকাবিলায় সেগুলোকে মেনে নিয়েছে। এখন তারা এগুলোই মেনে চলছে।

খোমেনীর এসকল উক্তির ফলাফল

কোরআনী আয়াত ও মুতাওয়াতির হাদীসকে মিথ্যা সাব্যস্তকরণঃ

"কাশফুল আসরার" থেকে উদ্ধৃত খোমেনীর বাক্যাবলীর সারকথা উপরে আরয করা হয়েছে। এতে খোমেনী খলিফাত্রয় ও তাঁর বিশেষ সহকর্মী অর্থাৎ হযরত আলী মুর্তযা ও তাঁর তিন চারজন সঙ্গী ছাড়া উদাহরণতঃ হযরত আবূ ওবায়দাহ্ ইবনুল জাররাহ্, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ, হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাছ, হযরত তালহা, হযরত যুবায়র প্রমুখ সকল প্রথম সারির ছাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে যে ধরনের বিষোদগার করেছেন, তা উল্লেখ করা হয়েছে।

বলাবাহুল্য, খোমেনীর এসকল বক্তব্য কোরআন মজীদের সেইসকল আয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, সেগুলো দ্বারা অকাট্যরূপে জানা যায় যে, (হযরত আলী মুর্তযাসহ) খুলাফায়ে রাশেদীন, অগ্রবর্তীগণ এবং যে সকল ছাহাবী দীনের দাওয়াত ও আল্লাহ্র পথে জেহাদের কাজে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে ছিলেন, তারা সকলেই সত্যিকার মুমিন, খোদার দরবারে প্রিয়, এবং আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট ও তাঁরাও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট।

এসকল আয়াতকে পূর্ণ ব্যাখ্যাসহ দেখতে হলে দেখুন হযরত শাহ্ ওলী উল্লাহ্র ازالۃالخفا এবং নওয়াব মুহসিনুল মুল্‌কের "আয়াতে বাইয়েনাত"। এ দু'জনের পরে হযরত মওলানা আবদুশ শাকুর ফারুকী লক্ষ্ণৌভী আলাদা আলাদা এসব আয়াতের তফসীর নিয়ে স্বতন্ত্র পুস্তিকা রচনা করেছেন (?)

এগুলো অধ্যয়ন করে সুস্থ বিবেক ও ঈমানের নূর থেকে বঞ্চিত নয়— এমন প্রত্যেক ব্যক্তি পূর্ব বিশ্বাস সহকারে এ সিদ্ধান্ত উপনীত হবে যে, আল্লাহ্তায়ালা এসব আয়াতে বিশেষ অলৌকিক ভঙ্গিতে ছাহাবায়ে কেরামের সত্যিকার মুমিন হওয়ার সাক্ষ্য সংরক্ষিত করেছেন। এরূপ করার কারণ এটাও যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আনীত সর্বশেষ কিতাব কোরআন মজীদ এবং তাঁর সকল ধর্মীয় শিক্ষা ভবিষ্যতে এই ছাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমেই পরবর্তী বংশধরের কাছে

---

(১) এসম্পর্কিত কয়েকটি পুস্তিকার নাম এইঃ মোকদ্দমা তফসীরে আয়াতে খেলাফত, তফসীরে আয়াতে এসতেখলাফ, তফসীরে আয়াতে তসকীন ফিল আরদ, তফসীরে আয়াতে মিরাছে আরদ, তফসীর আয়াতে দাওয়াতে আরাব। এগুলোর মধ্যে অধিকাংশের পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রায় সাড়ে সাতশ'। এগুলো সম্প্রতি পাকিস্তান থেকে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এগুলোর সমষ্টির নাম "তুহ্‌ফায়ে খেলাফত"। এই সমষ্টি জামেয়া হানাফিয়া তালিমুল ইসলাম, মদনী মহল্লা, ঝিলাম (পাকিস্তান) থেকে সংগ্রহ করা যায়।

পৌঁছাবে। তাঁরাই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবুওয়াতদাবী, তাঁর জীবনালেখ্য, তাঁর নির্দেশাবলী, চরিত্র, শিক্ষা ও মোজেযাসমূহের প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষ্যদাতা ছিলেন। তাঁদেরই দাওয়াত ও শাহাদাত পরবর্তীদের জন্যে বিশ্বাসস্থাপনের উপায় ছিল। একারণেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর ছাহাবীগণের বিশ্বস্ততা, সত্যতা ও আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র হওয়ার সাক্ষ্য ছাড়া তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণাবলীও বর্ণনা করেছেন, যা হাদীসগ্রন্থসমূহে সংরক্ষিত আছে। বলাবাহুল্য, এসব মুতাওয়াতির হাদীস হচ্ছে সর্ববাদী সম্মত।

মোটকথা, খোমেনীর বক্তব্য এসব আয়াত ও এসব মুতাওয়াতির হাদীসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ; যেমন কেউ যদি আকীদা রাখে যে, নবুওয়ত খতম হয়নি— রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পরেও নবী আসতে পারে, তবে তার এ আকীদা সেইসব কোরআনী আয়াত ও মুতাওয়াতির হাদীসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, যেগুলোতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সর্বশেষ নবী হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। (মোটেই জরুরী নয় যে, এই মিথ্যা প্রতিপন্ন করা জেনেশুনে, সচেতনভাবে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে হতে হবে।)

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পবিত্র সত্তা সম্পর্কে (নাউযুবিল্লাহ্……… ঃ)

এরপর কথা এসব আয়াত ও হাদীসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেই শেষ হয়ে যায় না ; বরং এর চেয়েও গুরুতর ব্যাপার এই সামনে আসে যে, বিশিষ্ট ও সাধারণ ছাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে খোমেনীর বক্তব্য স্বীকার করে নিলে এর অপরিহার্য পরিণতি স্বরূপ রসূললল্লাহ্ (সাঃ) সম্পর্কে স্বীকার করতে হবে যে, আল্লাহ্তায়ালা মানুষের হেদায়াত, আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র গঠনের যে মহান লক্ষ্য অর্জনের জন্যে তাঁকে খাতামুল আম্বিয়া (শেষ নবী) করে প্রেরণ করেছিলেন, তাতে তিনি কেবল শোচনীয়ভাবে ব্যর্থই হননি ; বরং (নাউযুবিল্লাহ্) চরম অযোগ্য প্রমাণিত হয়েছেন। তাঁর জীবদ্দশায় এক লাখেরও বেশী মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে। তাদের মধ্যে একটি বৃহৎ সংখ্যা নবুওয়তের প্রারম্ভ থেকে তাঁর পবিত্র জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর সান্নিধ্য এবং সফর ও গৃহে তাঁর সংসর্গে রয়েছে, তাঁর উপদেশ, বক্তৃতা ও মজলিসী কথাবার্তা স্বয়ং তাঁর মুখ থেকে শুনেছে, তাঁর দিবারাত্রির কাজকর্ম প্রত্যক্ষ করেছে ; কিন্তু তাঁদের মধ্যে দশজনও মুমিন হতে পারল না। তারা (নাউযুবিল্লাহ্) মুনাফিক অর্থাৎ বাহ্যতঃ মুসলমান এবং অন্তরে কাফের রয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করি, কোন মুরশিদ ও সংস্কারের অযোগ্যতার এর চেয়ে বড় প্রমাণ আরও হতে পারে কি? হযরত আলী মুর্তযা ও তাঁর যে তিনচারজন সঙ্গী সম্পর্কে বলা হয় যে, তারা সত্যিকার মুমিন ছিলেন, তাদের অবস্থাও এরূপ বর্ণনা করা হয় যে, তারা হুমকির মুখে বাধ্য হয় এমন লোকদেরকে খলিফা মেনে নিয়ে বয়াত করেছিলেন, যাদের সম্পর্কে তারা জানতেন যে, তারা মুমিনই নয়— মুনাফিক এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গের দুশমন। এরপর "তাকিয়া" নাম দিয়ে তাঁদের চব্বিশ বছরের খেলাফতকালে তাঁদের প্রতি আনুগত্যের আচরণ অব্যাহত রাখলেন।

মোটকথা, খোমেনীর এসব বক্তব্যের অবশ্যম্ভাবী ও জাজ্বল্যমান ফলশ্রুতি এটাই দাঁড়ায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর শিক্ষা ও দাওয়াত, প্রশিক্ষণ ও সংসর্গ এবং বিশ বছরের আপ্রাণ চেষ্টা

সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এতে একজনও "মর্দে মুমিন" সৃষ্টি হতে পারল না। তারা হয় মুনাফিক ছিল, না হয় তাকিয়্যার নামে মুনাফিক সুলভ আচরণই অবলম্বন করে রেখেছিল।

معاذالله-استغفر الله

কোরআন মজিদ নিশ্চিতই অবিশ্বাস্য এবং বিবেকের দৃষ্টিতে এর প্রতি ঈমান অসম্ভব ঃ

অনুরূপভাবে খোমেনীর এসব বক্তব্যের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এটাও যে, এরফলে কোরআন মজীদ নিশ্চিতই অবিশ্বাস্যযোগ্য হয়ে যায়। কেননা, এটা স্বীকৃত সত্য যে, কোরআন পাক বর্তমান কিতাবী আকারে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ওফাতের পর হযরত আবুবকরের খেলাফতকালে সরকারী প্রযত্নে সংকলিত হয়। এরপর হযরত ও ওসমান তার খেলাফতকালে এরই বিভিন্ন কপি সরকারী পর্যায়ে তদানীন্তন মুসলিম বিশ্বের কেন্দ্রীয় শহরসমূহে প্রেরণ করেন। খোমেনীর উপরোক্ত বক্তব্য অনুযায়ী এই খলিফাত্রয় এমন মুনাফিক ও খোদাভীরু ছিলেন যে, তাদের পার্থিব ও রাজনৈতিক সুবিধার তাগিদে তারা কোরআন পাকের মধ্যে অকপটে সর্বপ্রকার পরিবর্তন ও কাটছাট করতে পারতেন। তারা এরূপ করলে সাধারণ ছাহাবীদের মধ্য থেকে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ারও কেউ ছিল না। সকলেই তাদের কাছে ভীত ছিল এবং তাদের সুরে সুর মিলাত। বলা বাহুল্য, খোমেনীর এ বক্তব্য স্বীকার করে নেওয়ার পর যুক্তিগতভাবেও বর্তমান কোরআন সম্পর্কে একথা স্বীকার করার সম্ভাবনা থাকে না যে, এটা প্রকৃতপক্ষে সেই কিতাবুল্লাহ্ যা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল এবং এতে কোন পরিবর্তন ও কাটছাট করা হয়নি। খোমেনীর বক্তব্যের এটা উজ্জ্বল ও জাজ্বল্যমান ফলশ্রুতি, যা বুঝার জন্যে কোন বিশেষ স্তরের মেধা ও সূক্ষ্মদর্শিতার প্রয়োজন নেই। প্রত্যেক স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও একে দু'য়ে দু'য়ে চারের মত বুঝতে পারে। প্রকাশ থাকে যে, ঈমান সেই আন্তরিক বিশ্বাস ও সত্য বলে জানার নাম, যাতে কোন সন্দেহ ও সংশয়ের সম্ভাবনা ও অবকাশই না থাকে। বলা বাহুল্য, খোমেনীর বক্তব্য স্বীকার করে নেওয়ার পর কোরআন পাক সম্পর্কে এরূপ ঈমানের সম্ভাবনাই যুক্তিযুক্তভাবে থাকে না।

লক্ষণীয় যে, কোরআনের প্রতি ঈমান সম্পর্কে এখানে যা কিছু বলা হয়েছে, তা কেবল খোমেনীর বক্তব্যের ভিত্তিতে বলা হয়েছে। ইনশাআল্লাহ্ এ সম্পর্কে এ গ্রন্থেই যথাস্থানে সবিস্তারে আলোচনা করা হবে। সেখানেই বলা হবে যে, এ সম্পর্কে শিয়া গ্রন্থসমূহে নিষ্পাপ ইমামগণের পক্ষ থেকে কি কি বাণী বর্ণিত আছে এবং প্রধান প্রধান শিয়া আলেমগণের ভূমিকা কি ছিল।

সর্বশেষ গুরুতর কথাঃ

এ সম্পর্কে আমি আরও একটি কথা আরয করতে চাই, যা আমার মতে সর্বাধিক গুরুতর শিয়ারাও এ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করলে ভাল হয়।
শায়খায়ন, যুন্নুরায়ন এবং তাঁদের বিশিষ্ট সহকর্মী প্রথম সারির প্রায় সকল ছাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে খোমেনী যা লিখেছেন, তা পাঠ করে ইসলাম ও ইসলামের পয়গাম্বর (সাঃ)-এর প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন অমুসলিমরা আজকালকার রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজির সাধারণ রিমগুলে এ ফলশ্রুতিও বের করতে পারে যে, (নাউযুবিল্লাহ্) স্বয়ং তাদের পয়গাম্বরের নবুওয়ত দাবী এবং একটি নতুন ধর্ম ইসলামের দাওয়াত নিজের রাষ্ট্র কায়েম করারই একটি কৌশল ছিল। আসল লক্ষ্য ব্যস রাজত্ব অর্জন করা ছিল এবং আবূবকর, ওমর ও ওছমানের মত মক্কার কিছু শীর্ষস্থানীয় ও চতুর লোকও এ উদ্দেশ্যকেই অন্তরে লালন করে তাঁর সঙ্গী হয়ে গিয়েছিল। এভাবে ইসলামের নামে একটি পার্টি সংগঠিত হয়। এ পার্টিতে শুরু থেকে দু'টি গ্রুপ ছিল। এক গ্রুপে স্বয়ং পয়গম্বর ছিলেন, যার উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা এই ছিল যে, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে তা চিরতরে তাঁর পরিবারের লোকদের জন্যে সংরক্ষিত করে দিবেন। বংশানুক্রমে শাসনক্ষমতা কেবল তাদের হাতেই থাকবে। মেমতে যখন মদীনায় রাষ্ট্র কায়েম হয়ে গেল, তখন (শিয়া রেওয়ায়েত অনুযায়ী) বিভিন্ন স্থলে আল্লাহ্র নির্দেশের বরাত দিয়ে তিনি এউদ্দেশ্যে প্রকাশ ও করেছেন এবন সর্বশেষ কাজ এই করেছেন যে, সমগ্র আরব ভূমির উপর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে তিনি গাদীরখুম নামক স্থানে বিশাল জনসমাবেশের মধ্যে খোদার নির্দেশের বরাত দিয়ে ঘোষণা করলেন যে, আমার পরে রাষ্ট্রের প্রধানরূপে আমার স্থলাভিষিক্ত আমার জামাতা আলী ইবনে আবী তালেব হবে। এরপর শাসনাক্ষমতা সর্বদা তার বংশধরদের মধ্যেই থাকবে। অতঃপর তিনি শেষ রোগে অন্তিম দিনগুলোতে (শিয়া রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত আলীকে স্থলাভিষিক্ত করার জন্যেই) একটি দস্তাবেজ লিখিয়ে দেওয়ারও ইচ্ছা করেন। কিন্তু অপর গ্রুপের শক্তিশালী ব্যক্তি ওমরের হস্তক্ষেপের দরুন তা শিখা সম্ভব হয়নি।

পার্টিতি অপর গ্রুপ ছিল আবূবকর ও ওমর প্রমুখের। তাদের পরিকল্পনা এই ছিল যে, পয়গম্বরের পরে শাসনক্ষমতা তারা দখল করে নিবে। তারা এজন্যে শুরু থেকেই চক্রান্ত লিপ্ত ছিল। অবশেষে সময় এলে এ গ্রুপেই চালাকী ও চাতুর্যের বলে শাসনক্ষমতা দখল করতে সফলকাম হয়ে যায়।
বাস্তব ঘটনা এই যে, খোমেনী "কাশফুল আমরারে" হযরত আবূ বকর, ওমর, ওছমান (রাঃ) ও সকল ছাহাবায়ে কেরামের যে চিত্র এঁকেছেন এবং তাদের সম্পর্কে যা কিছু লিখেছেন, তাই ইসলাম ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর শত্রুদের জন্যে এভাবে চিন্তা করার পূর্ণ উপকরণ সরবরাহ করেছে। শিয়া ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যারা সুস্থমনা ও সরলপ্রাণ তাঁরা খোমেনীর এসকল বক্তব্যের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ও ফলাফল সম্পর্কে চিন্তা করুন।
সত্য এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এ ধরনের কোন বিরোধ ও কোন দলাদলি ছিল না। কোরআন মজীদে তাঁদের এই অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছেঃ—

أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

অর্থাৎ মোহাম্মদ (সাঃ)-এর ছাহাবীগণ ধর্মদ্রোহীদের মোকাবিলায় কঠোর প্রাণ এবং পরস্পরে একে অপরের প্রতি মেহেরবান। অন্যত্র তাঁদের সম্পর্কেই বলা হয়েছেঃ—

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ

অর্থাৎ আল্লাহ্ রসূলের প্রতি বিশ্বাসীদের অন্তর গ্রথিত করে দিয়েছেন এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও সম্প্রীতি সৃষ্টি করে দিয়েছেন। ইতিহাসের এমনকি, অমুসলিম ইতিহাসবিদদের সাক্ষ্যও এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী তাঁর ছাহাবীগণের মধ্যে এ ধরনের কোন বিরোধ ও কোন দলাদলি ছিল না, যার চিত্র খোমেনী কাশফুল আসরার গ্রন্থে এঁকেছেন। سُبْحَانَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ —(আল্লাহ্ পবিত্র, এটা মহা অপবাদ)।
এখন আমরা খোমেনীর বক্তব্য সম্পর্কিত এ আলোচনা এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ্ তায়ালা এ আলোচনাকে তাঁর বান্দাদের জন্যে জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনে সহায়ক করুন।

খোমেনী কয়েকটি ফেকহী মাস্আলার আলোকেঃ—

এ পর্যন্ত খোমেনী সম্পর্কে যা লিখা হয়েছে, তা কেবল তার কিতাব الحكومة الاسلامية ও كشف الاسرار এরই ভিত্তিতে লিখা হয়েছে এবং তার সম্পর্ক মূলনীতি ও আকায়েদের সাথে ছিল। এখন নিম্নে আমরা তার ফেকাহগত রচনা تحريرالوسيلة থেকে এমন কতিপয় উদ্ধৃতি পেশ করছি, সেগুলো দ্বারা খোমেনীর ব্যক্তিগত ও মযহাবগত মর্যাদা সম্পর্কে আমাদের পাঠকবর্গের ইনশাল্লাহ্ আরও জ্ঞান অর্জিত হবে।

(১) تحريرالوسيلة প্রথম খণ্ড নামায অধ্যায়ে একটি শিরোনাম আছে القول فى مبطلات الصلوة (অর্থাৎ যে যে বিষয় দ্বারা নামায বাতিল হয়ে যায়, তার বর্ণনা)। এ শিরোনামের অধীনে দ্বিতীয় নম্বরে লিখা হয়েছেঃ—

ثانيها التكفير وهووصنع احدى اليدين على الاخرى نحو مايصنعه غيرنا وربّاس حال التقيه

দ্বিতীয় যে কাজ নামাযকে বাতিল করে দেয়, তা হচ্ছে, নামাযে এক হাতের উপর অপর হাত রাখা, যেমন আমাদের শিয়ারা ছাড়া অন্যরা করে। তবে তাকিয়ার অবস্থায় এরূপ করলে দোষ নেই। যথার্থ ধোকা দেওয়াই উদ্দেশ্যে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়ার ছলে এরূপ করা সম্পূর্ণ জায়েজ। (১৮৬ পৃঃ)

(২) এ সম্পর্কেই নবম নম্বরে লিখিত আছে—

تاسعها تعمد قول امين بعد اتمام الفاتحة الامع التقيه فلا باس به

নবম যে কাজ দ্বারা নামায বাতিল হয়ে যায়, তা হচ্ছে সুরা ফাতেহা পাঠ করার পর ইচ্ছাকৃতভাবে "আমীন" বলা। তবে তাকিয়্যার অবস্থায় হলে জায়েয— কোন দোষ নেই। (১৯০ পৃঃ) তওহীদ ও রেসালতের সাক্ষ্য দেওঁয়ার সাথে সাথে বার ইমামের ইমামতের সাক্ষ্য দেওয়াও ঈমানের অঙ্গঃ

(৩) এ تحريرالوسيله গ্রন্থেই মৃত্যু সম্পর্কিত মাসআলা বর্ণনা করতে যেয়ে খোমেনী লিখেনঃ

يستحب تلقينه (المحتضر)الشهادتين والاقرار بالائمة الاثنى عشرعليهم السلام

মরনোম্মুখ ব্যক্তিকে আল্লাহ্তায়ালা তওহীদ ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর রেসালতের সাক্ষ্য এবং বার ইমামের ইমামতের স্বীকারোক্তি শিক্ষা দেওয়া মোস্তাহাব। (১ম খণ্ড ৬৫ পৃঃ)

(৪) এরপর কাফনের মোস্তাহাব বিষয়াদি সম্পর্কে লিখেন ঃ

وان يكتب على حاشية جميع قطع الكفن ان فلان بن فلان يشهد ان لااله الاالله وحده لاشريك له وان محمدارسول اللهصلى اللهعليه و اله وان عليا والحسن والحسين ويعد الائمة عليهم السلام الى اخرهم ائمته وسادته وقادته

আরও মোস্তাহাব এই যে, কাফনের চাদরসমূহের প্রান্তে একথা লিখবে— এই মৃত অমুকের পুত্র অমুক সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নেই। মোহাম্মদ আল্লাহ্র রসূল এবং আলী, হাসান, হুসায়ন— (এরপর দ্বাদশতম ইমাম পর্যন্ত সকলের নাম উল্লেখ করবে) তারা আমার ইমাম, প্রভু ও নেতা। (৭৬ পৃঃ)

(৫) এরপর দাফনের মোস্তাহাব বিষয়াদি সম্পর্কে লিখেছেন ঃ—

منهاان يلقنه الولى اومن يامره بعد تمام الدفن ورجوع المشيعين وانصر افهم اصول دينه ومذ هبه بارفع صوته من الاقرار بالتوحيد ورسالة سيد المرسلين وامامة الائمة المعصومين والاقراربماجاء به النبى صلى الله عليه واله والبعث والنشوروالحساب والميز ان والصراط والجنة والنار ٥

দাফনের মোস্তাহাব বিষয়াদির মধ্যে এটাও যে, মৃতের ওলী নিজে অথবা তার আদেশপ্রাপ্ত অন্য ব্যক্তি দাফনের পরে এবং জানাযার সাথে আগমনকারীদের ফিরে যাবার পর কবরে মৃতকে অধিকতর উচ্চঃস্বরে এ কয়েকটি বিষয় শিক্ষা দিবে— আল্লাহ্র একত্ব, সাইয়িদুল মুরসালিনের রেসালত, নিষ্পাপ ইমামগণের ইমামতের স্বীকৃতি। এছাড়াও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ধর্মের যে শিক্ষা দিয়েছেন, সবগুলো স্বীকার করার শিক্ষা দিবে এবং হাশর, নশর, আখেরাত, হিসাব, দাঁড়িপাল্লা, পুলসিরাত, জান্নাত ও দোযখের স্বীকৃতি শিক্ষা দিবে। (৯২ পৃঃ)

খোমেনী কাফন দাফন সম্পর্কিত এসব মসআলা তার ফেকাহগত কিতাব كتاب الوسيله গ্রন্থে লিখলেও এতে তিনি স্পষ্টরূপে একথা প্রকাশ করেছেন যে, তার মতে বার ইমামের ইমামতের আকীদা তওহীদ ও রেসালাতের আকীদার মতই ঈমানের অঙ্গ এবং এর মর্তবা আখেরাত, জান্নাত ও দোযখের আকীদার অগ্র এবং উর্ধ্বে। এটা মূলনীতির অন্যতম।

মুতআ ঃ—

(৬) মুতআ শিয়া মযহাবের প্রসিদ্ধ মাসআলা। খোমেনী كتاب الوسيله গ্রন্থের কিতাবুন্নিকাহ প্রায় চার পৃষ্ঠায় এ সম্পর্কিত মাসআলা লিপিবদ্ধ করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি মাসআলাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার আশংকায় এ অধ্যায়ে কেবল শেষ মাসআলাটিই পাঠকবর্গকে উপহার দেওয়া হচ্ছে। খোমেনী এ মাসআলায় মুতআর বর্ণনা শেষ করেছেন। তিনি লিখেন ঃ—

يجوز التمتع بالزانية على كراهة خصوصالوكانت من العواهرالمشهورات بالزناوان فعل فليمنعها من الفجور

ব্যভিচারিনী মহিলার সাথে মুতআ করা জায়েয, তবে এটা মকরূহ হওয়ার সাথে জায়েয; বিশেষতঃ যখন মহিলাটি খ্যাতনাম্নী পেশাদার বেশ্যাদের একজন হয়। এরূপ মহিলার সাথে মুতআ করলে তাকে পাপাচারের এ পেশা করতে নিষেধ করা উচিত। (২৯২ পৃঃ)

(৭) এখানে আরও উল্লেখযোগ্য যে, খোমেনীর সুস্পষ্ট বর্ণনা অনুযায়ী সর্বনিম্ন কোন সময় সীমার জন্যেও মুতআ করা যায়; উদাহরণতঃ এক রাত্রি, এক দিন অথবা আরও কম সময় অর্থাৎ এক ঘন্টা দু'ঘন্টার জন্যেও করা যায়। কিন্তু সময়কাল নির্দিষ্ট হওয়া জরুরী। (২য় খণ্ড, ২৯০ পৃঃ)

পাঠকবর্গ পূর্বেই জেনেছেন যে, শিয়া মযহাবে মুতআ কেবল জায়েযই নয়; বরং উচ্চস্তরের এবাদত। তাদের প্রাচীন তফসীর منهج الصادقين গ্রন্থের বরাত দিয়ে এ হাদীসও উল্লেখ করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে একবার মুতআ করে, সে ইমাম হুসাইনের মর্তবা পাবে; যে দু'বার করে, সে ইমাম হাসানের, যে তিনবার করে, সে আমিরুল মুমিনীন হযরত আলীর এবং যে চারজন করে, সে আমার; অর্থাৎ রসূলে পাক (সাঃ)-এর মর্তবা পাবে। কাশফুল আসারারের উদ্ধৃতি পাঠকবর্গ কয়েক পৃষ্ঠা আগেই লক্ষ্য করেছেন, যাতে খোমেনী বলেছেন যে, ওমর মুতআ হারাম হওয়ার যে ঘোষণা প্রচার করেছে, তা তার পক্ষ থেকে কোরআনের প্রকাশ্য বিরোধিতা এবং তার কাফেরসুলভ কর্মকাণ্ড ছিল।

এ পর্যন্ত যা আরয করা হয়েছে, তার সম্পর্ক খোমেনী পরিচালিত ইরানী বিপ্লবের প্রকার এবং স্বয়ং তার ব্যক্তিত্ব ও ধর্মীয় মর্যাদার সাথে ছিল। এখন ওয়াদা অনুযায়ী শিয়া মতবাদ ও ইছনা আশারিয়া মযহাবের পরিচিত পাঠকবর্গের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে। আল্লাহ্ তায়ালা নফস ও শয়তানের অনিষ্ট থেকে হেফাযত করুন এবং কলম থেকে তাই যেন বের হয়, যা সত্য, বিশুদ্ধ ও বাস্তবসম্মত।

শিয়া মতবাদ কি?

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এই শ্রমস্বীকারের মূল লক্ষ্য ইরানী বিপ্লবের প্রকৃত স্বরূপ এবং এর নেতা রুহুল্লাহ্ খোমেনীর সত্যিকার পরিচিত ও বাস্তব মযহাবগত মর্যাদা সম্পর্কে তাদেরকে ওয়াকিফহাল করানো, যারা ওয়াফিকহাল নয় এবং এ অজানার কারণে তারা সেসব প্রোপাগাণ্ডায় প্রভাবান্বিত হচ্ছে, যা কোটি কোটি ডলার ব্যয় করে ইরান সরকারের পক্ষ থেকে এ বিপ্লবকে খাঁটি ইসলামী বিপ্লব আখ্যায়িত করা হচ্ছে। পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাসমূহে স্বয়ং খোমেনীর রচনাবলীর আলোকে বলা হয়েছে যে, তার পরিচালিত এ বিপ্লবের ভিত্তি শিয়া মযহাব বিশেষতঃ এর মূলনীতি ইমামতের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই এর প্রকৃত স্বরূপ বিশুদ্ধরূপে বুঝা এবং খোমেনীর ব্যক্তিত্বকে চিনা ও জানার জন্যেও শিয়া মযহাব সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া জরুরী। তাই সামনের পৃষ্ঠাসমূহে কেবল এর পরিচিতি পেশ করার চেষ্টা করা হবে। এ সম্পর্কে যা কিছু আরয করা হবে, তা শিয়া মযহাবের স্বীকৃত ও প্রামাণ্য গ্রন্থগুলো থেকেই উদ্ধৃত করা হবে এবং তা তাদের "নিষ্পাপ "ইমাম"গণের বক্তব্যই হবে। শুরুতেই ভূমিকাস্বরূপ শিয়া মতবাদের সূচনার ইতিহাসও উল্লেখ করা হবে। কেননা, এটা ছাড়া শিয়া মতবাদ বিশুদ্ধরূপে বুঝা যায় না।

শিয়া মযহাব ও তার সূচনা হৃদয়ঙ্গম করা তাদের জন্যে খুব সহজ হয়, যারা বর্তমান খৃষ্টবাদ ও তার ইতিহাস সম্পর্কে ওয়াকিফহাল রয়েছে। তাই শুরুতে সংক্ষেপে তা-ও উল্লেখ করা হবে। আলোচনা হযরত আলী মুর্তযা সম্পর্কিত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অসাধারণ ভবিষ্যদ্বাণী এবং সে সম্পর্কে স্বয়ং হযরত আলীর একটি বর্ণনা দ্বারা শুরু করা হবে। এ ভবিষ্যদ্বাণী ইসলামে শিয়া মতবাদ এবং এর বিপরীতে অন্যান্য পথভ্রষ্টতা, যেমন খারেজী মতবাদ-আবির্ভাবেরও ভবিষ্যদ্বাণী। এতে করে শিয়া মতবাদ এবং বর্তমান খৃষ্টাব্দের সেই নৈকট্য ও সম্পর্কও পাঠকবর্গের সামনে এসে যাবে, যার কারণে খৃষ্টবাদের ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত ব্যক্তিদের জন্যে শিয়া মতবাদ হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হয়ে যায়।

শিয়া মতবাদ ও খৃষ্টধর্ম

মসনদে আহমদ, মুস্তাদরাক হাকেম, কামেল ইবনে আদী ইত্যাদি কতিপয় হাদীস গ্রন্থে হযরত আলী মুর্তযা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে এই হাদিস বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) স্বয়ং তাঁকে (হযরত আলীকে (রাঃ) বলেছিলেন ঃ

نيك مثل من عيسى بن مريم ابغضته اليهو د حتى بهتوا امه واحبته النصارى حتى انزلواه منزلته التى ليست له ثم قال يهلك فى من رجلان محب مفرط يقرظنى بما ليس فى و مبغض يحمله شنأنى على ان يبهتنى

হে আলী ঈসা ইবনে মরিয়মের সাথে তোমার বিশেষ মিল আছে। ইহুদীরা তার সাথে হিংসা ও শত্রুতামূলক আচরণ করে। এমন কি, তাঁর জননী মরিয়মের প্রতি (ব্যভিচারের) অপবাদ আরোপ করে। আর খৃষ্টানরা তাঁকে এমন মহব্বত করে যে, তাঁকে সেই স্তরে পৌঁছিয়ে দেয়, যে স্তর তাঁর ছিল না। (রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর এই উক্তি বর্ণনা করার পর) হযরত আলী (রাঃ) বললেনঃ (নিঃসন্দেহে তাই হবে) দু' প্রকার মানুষ আমার ব্যাপারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এক, যারা মহব্বতে বাড়াবাড়ি করবে। তারা আমার এমন মাহাত্ম্য বর্ণনা করবে, যা আমার মধ্যে নেই। দুই, যারা হিংসা ও শত্রুতায় সীমা ছাড়িয়ে যাবে। তাদের শত্রুতা তাদেরকে আমার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করতে উদ্বুদ্ধ করবে। (১)

এ হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যা কিছু বলেছেন এবং এরই ভিত্তিতে হযরত আলী মুর্তযা যা বলেছেন, তা তাঁর খেলাফতকামলেই প্রকাশ পেয়েছিল। খারেজী সম্প্রদায় তাঁর বিরোধিতা ও শত্রুতায় এতদূর অগ্রসর হয় যে, তাঁকে দ্বীন-ধর্ম বরবাদকারী, কাফের এবং অবশ্যহত্যাযোগ্য সাব্যস্ত করে। তাদেরই এক হতভাগা আবদুর রহমান ইবনে মুলজিম তাঁকে শহীদ করে এবং তার এই দুর্ভাগ্যপূর্ণ কাজকে সে উত্তম জেহাদ ফি সাবিলিল্লাহ' এবং জান্নাতে প্রবেশের ওছিলা জ্ঞান করে। পক্ষান্তরে তাঁর মহব্বতে বাড়াবাড়ি করার লোকও পয়দা হয়ে যায়, যারা তাঁকে উপাস্যের স্তরে পৌঁছিয়ে দেয়। এমন লোকও সৃষ্টি হয়, যারা বলে যে, নবুওয়ত ও রেসালতের যোগ্য আসলে তিনিই ছিলেন। আল্লাহ্ তাআলার লক্ষ্য তাঁকেই নবী ও রসূল করা ছিল। জিবরাঈলকে ওহী নিয়ে তাঁর কাছেই প্রেরণ করা হয়েছিল। কিন্তু জিবরাঈল সঠিকরূপে চিনতে পারলেন না এবং সেই ওহী নিয়ে মোহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে পৌঁছে গেলেন। তাদের ছাড়া এমন লোকও সৃষ্টি হয়, যারা বলে যে, হযরত আলী রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ভারপ্রাপ্ত তাঁর পরবর্তী সময়ের জন্যে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে মনোনীত ইমাম, খলিফা ও রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর মতই নিষ্পাপ ছিলেন। তিনি মর্যাদায়

---

(১) শিয়াদের প্রসিদ্ধ ও প্রমান্য نهج البلاغة গ্রন্থেও হযরত আলী মুর্তযা (রাঃ)-এর এ উক্তি প্রায় এমনিভাষায় বর্ণিত আছে। (নহজুল বালাগাত, মিসরীয় মুদ্রণ ১ম খণ্ড, ২৬১ পৃ)

অন্যান্য সকল নবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উর্ধ্বে ছিলেন। সৃষ্টজগতে ক্ষমতা প্রয়োগ ও অদৃশ্য জ্ঞানের মত খোদায়ী গুণাবলীরও তিনি বাহক ছিলেন। হজরত আলী মুর্তযা (রাঃ) সম্পর্কে শিয়া সম্প্রদায়ের এসব বাড়াবাড়ির কিছু ইতিহাস ও বিবরণ পাঠকবর্গ ইনশাআল্লাহ্ পরে জানতে পারবেন।

এক্ষণে উপরোক্ত হাদীসের আলোকে আরম্ভ করতে চাই যে, শিয়াবাদের স্বরূপ বুঝা তাদের জন্যে খুব সহজ হয়, যারা খৃষ্টবাদ ও তার ইতিহাস সম্পর্কে কিছু জ্ঞান রাখে আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে এরূপ লোকের সংখ্যা নিশ্চিতই কম হবে। তাই প্রথমে সংক্ষেপে এর বর্ণনা সমীচীন মনে হয়েছে।

হযরত ঈসা (আঃ) ও বর্তমান খৃষ্টবাদঃ

কোন মুসলমান এ বিষয়ে সন্দেহ করবে না যে, আল্লাহর নবী ও রসূল সাইয়েদুনা ঈসা (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে সেই তওহীদ ও আল্লাহ্ তাআলার সেই মুক্তি, শাস্তি, জান্নাত ও দোযখের আইনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের দাওয়াত দিয়েছিলেন, যার প্রতি তাঁর পূর্ববর্তী সকল পয়গাম্বর আপন আপন উম্মতকে দাওয়াত দিয়ে এসেছিলেন। তিনি নিজেকে আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর নবী ও রসূলরূপেই প্রকাশ করেছিলেন। এ ব্যাপারে কোরআন মজিদের বর্ণনা হচ্ছে সর্বাধিক প্রামাণ্য ও সকল প্রকার সন্দেহ সংশয় থেকে মুক্ত বর্ননা; বিশেষতঃ আমাদের মুসলমানদের মতে এবং বাস্তবের দিক দিয়েও সূরা মায়েদায় হযরত ঈসা (আঃ) এর দাওয়াত ও শিক্ষার বর্ণনায় বলা হয়েছেঃ

وَقَالَ الْمَسِيْحُ يَابَنِيْ إِسْرَائِيْلَ اعْبُدُوْا اللهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ

পয়গাম্বর মসীহ্ (ঈসা) বললেনঃ হে বনী ইসরাইল, আল্লাহ্ তাআলারই এবাদত কর, যিনি আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক। নিশ্চয়ই যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, আল্লাহ্ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন। তার ঠিকানা দোযখই হবে। এরূপ জালেমদের কোন সাহায্যকারী হবে না। (আয়াত ৭২)

সূরা আল-এমরানে আছে যে, আল্লাহ্ তাআলা ঈসা (আঃ)- কে যে উজ্জ্বল মোজেযা দান করেছিলেন, তিনি তা সম্প্রদায়ের সামনে পেশ করার পর সম্প্রদায়কে বলেনঃ

وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيْعُوْنِ إِنَّ اللهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ

আমি তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নিদর্শন (অর্থাৎ, মোজেযা) নিয়ে এসেছি। অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক। অতএব তাঁরই এবাদত কর। এটাই সরল পথ। (আয়াত ৫১)

সূরা মরিয়মে বলা হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) সম্প্রদায়কে নিজের সম্পর্কে বলেনঃ

إِنِّيْ عَبْدُ اللهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِيْ نَبِيًّا

নিশ্চয় আমি আল্লাহর দাস। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন। (আয়াত-৩০)
এর পর হযরত ঈসা (আঃ)-এর এ বর্ণনা দিয়ে আলোচনাশেষ করা হয়েছে।

وَاِنَّ اللهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ

নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলাই আমার ও তোমাদের প্রতিপালক। অতএব তাঁরই এবাদত কর। এটাই সরল পথ।

সূরা মায়েদার শেষে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন পথভ্রষ্ট খৃষ্টানদেরকে জব্দ করা এবং ঈসা (আঃ)-এর নির্দোষতা প্রকাশ করার জন্যে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে সর্বজন সমক্ষে ঈসা (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হবে তুমি কি মানুষকে বলেছিলে যে, তোমাকে ও তোমার জননীকে আল্লাহ্ ব্যতীত উপাস্য করে নিতে?

ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَاُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللهِ

ঈসা (আঃ) আরয করবেনঃ আমি এরূপ কথা কিরূপে বলতে পারতাম?

مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَا اَمَرْتَنِىْ بِهٖ اَنِ اعْبُدُوا اللهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ

আমি তাদেরকে কেবল তাই বলেছিলাম, যা আপনি বলতে আদেশ করেছিলেন। তা এই যে, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর, যিনি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক।

মোটকথা, কোরআন মজীদের এমন বর্ণনার আলোকে এতে কোন সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই যে, হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে নির্ভেজাল তাওহীদেরই দাওয়াত দিয়েছিলেন এবং এতেও সন্দেহ নেই যে, তার কাছ থেকে সরাসরি শিক্ষাপ্রাপ্ত হাওয়ারীগণও এ তাওহীদেরই বাহক ছিল। কিন্তু কিছু কাল পরেই অবস্থা এ দাড়ায় যে, খৃষ্টান সম্প্রদায় তাওহীদের পরিবর্তে ত্রিত্ববাদকে এবং ঈসা (আঃ) ও সকল পয়গাম্বরের প্রদর্শিত মুক্তি ও শাস্তির আইনের পরিবর্তে প্রায়শ্চিত্বকে বুনিয়াদী আকীদারূপে আপন করে নেয়। এর পর থেকে এদু' আকীদার উপরই খৃষ্টবাদের সমগ্র দালান দণ্ডায়মান রয়েছে। এখন যে ব্যক্তি ত্রিত্বাবদ ও প্রায়শ্চিত্বের বিশ্বাস রাখে না, বরং খাঁটি তাওহীদ ও শাস্তিদান আইনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, যার দাওয়াত ও শিক্ষা ঈসা (আঃ) দিয়েছিলেন, তাকে আজ কোন গির্জার আইন অনুযায়ী খৃষ্টান বলা যায় না।

এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক প্রশ্ন যে, হযরত ঈসা (আঃ) এর দাওয়াত ও শিক্ষার মধ্যে এত বড় পরিবর্তন কিরূপে ঢুকে পড়ল এবং কিভাবে তাঁর উম্মতের মধ্যে এটা এমন জনপ্রিয় হয়ে গেল যে, আজ সমগ্র খৃষ্টান জগত (মযহাব ও আকীদার ছোট বড় অনেক পারস্পরিক বিরোধ সত্বেও) ত্রিত্ববাদ ও প্রায়শ্চিত্বকে মৌলিক আকীদা মেনে নেওয়ার ব্যাপারে যেন সম্পূর্ণ একমত ও একমুখ?

আল্লাহ্ তাআলার অশেষ অনুগ্রহ ও কৃপা, সত্যান্বেষীদের পথপ্রদর্শন এবং আমাদের শিক্ষাগ্রহণের জন্যে এ পরিবর্তনের ইতিহাসও সংরক্ষিত আছে। মুসলিম আলেমগণের মধ্যে যারা পুংখানুপুংখ অনুসন্ধান সহকারে খৃষ্টবাদ ও তার ইতিহাস অধ্যয়ন এবং এর উপর কাজ

করছেন, তারা এ বিষয়টিকে এমন বিস্তারিত ও প্রামাণ্য করে লিখেছেন যে, এ পরিবর্তনের ইতিহাস চোখের সামনে এসে যায়। কিন্তু এখানে আমরা সংক্ষিপ্ত আকারেই বিষয়টি উল্লেখ করতে চাই। (১)

এ সম্পর্কে খৃষ্টাবাদের ইতিহাস পাঠ করে যা জানা যায়, তার সারমর্ম এই যে, যখন হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ তাআলা নবুওয়তের পদে অধিষ্ঠিত করলেন, তিনি নিজেকে নবীরূপেই তাঁর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈল ইহুদীদের সামনে পেশ করলেন, আল্লাহর পয়গাম পৌঁছালেন, আল্লাহর হুকুমে কোরআনে বর্ণিত উজ্জ্বল মোজেযা সমূহও তাঁর হাতে প্রকাশ পেল, তখন সর্বপ্রথম তাদের আলেম ও ধর্মীয় নেতারা এবং তাদের সাথে সমগ্র জাতি তাকে মিথ্যা নবুওয়ত দাবীদার, যাদুকর ও ভেল্কিবাজ আখ্যা দিল এবং ইহুদী শরীয়তের আইন অনুযায়ী অভিশপ্ত ও অবশ্যহত্যাযোগ্য সাব্যস্ত করল। তারা তাকে সর্বপ্রকারে জ্বালাতন করল এবং শোচনীয়রূপে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করল। এরপর ধর্মীয় আদালতে তাঁর উপর মোকাদ্দমা চালাল এবং শূলীতে চড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ফয়সালা করা হল। তদানীন্তন ক্ষমতাসীন রোমীয় সরকারের আইন অনুযায়ী এ মৃত্যুদণ্ডের রায় কার্যকর করার জন্যে রোমীয় গভর্নরের মঞ্জুরীও লাভ করা হল। গভর্নর নিজের কাছে হযরত ঈসা (আঃ)-কে শূলীতে চড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড দিয়েও দিল। নিয়ম ও প্রথা অনুযায়ী মৃতদেহ দাফনও করা হল। এরপর সকলেই নিশ্চিত হয়ে গেল যে, তারা এই নবুওয়ত দাবীদারকে খতম করে দিয়েছে। (২) এবং তাঁর ধর্মীয় দাওয়াতের শিকড় কেটে দিয়েছে। কিন্তু ঈসা (আঃ)-এর অকৃত্রিম ও নিষ্ঠাবান হাওয়ারীগণ এহেন চরম প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তাঁর আনীত হেদায়াতের দাওয়াত ও প্রচার দূরদূ রাস্ত এলাকায় যেয়ে যেয়ে করতে লাগলেন। তাঁদের ঐকান্তিক ও দরবেশসুলভ প্রচেষ্টা ও ত্যাগ জনপ্রিয়তা ও সাফল্য লাভ করতে থাকে এবং এ সম্ভাবনা প্রকট হয়ে পড়ে সে, এই ধর্মীয় দাওয়াত কোন সময় ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করবে।

(১) যারা এ ঐতিহাসিক ঘটনার পূর্ণ বিবরণ জানতে চায়, তারা এ সম্পর্কিত স্বতন্ত্র ও বিস্তারিত গ্রন্থাবলী পাঠ করুন; বিশেষত হযরত মওলানা রহমতুল্লাহ হিন্দী মোহাজিরে মক্কী (রহঃ)-এর বেনযীর রচনা "এযহারুল হক" পাঠ করুন। এটা এখন থেকে প্রায় সোয়া শ' বছর পূর্বে রচিত হয়েছিল এবং বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় এর অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে। উর্দূতে এর সর্বোত্তম অনুবাদ হযরত মওলানা মুফতী মোহাম্মদ শফী দেওবন্দীর সুযোগ্য পুত্র, আমাদের বন্ধু মওলানা মোহাম্মদ তকী (এম,এ,এল,এল,বি,) করেছেন, যা তার প্রায় সোয়া দু'শ পৃষ্ঠার ভূমিকাসহ কয়েক বছর পূর্বে তিন খণ্ডে করাচী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তার এ ভূমিকা স্বস্থানে একটি স্বতন্ত্র মূল্যবান রচনা।

(২) খৃষ্টান বিশ্বও হযরত ঈসা (আঃ)-এর দুশমন ইহুদীদের একথা মেনে নিয়েছে যে, ঈসা (আঃ)-কে ক্রুশে চড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এর উপরই তাদের "প্রায়শ্চিত্ব" আকীদার ভিত্তি। বর্তমান ইনজিল সমূহেও (যাদের পরিবর্তিত হওয়া অকাট্যরূপে প্রমানিত) একথাই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোরআন পাকের বর্ণনা এই যে, আল্লাহ্ তাআলা হযরত ঈসা (আঃ)-কে ক্রুশের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ইহুদী পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিয়েছেন। স্বীয় কুদরত দ্বারা তাঁকে আকাশে তুলে নিয়েছেন এবং অন্য এক ব্যক্তিকে, (যাকে আল্লাহ্ তাআলা আকার আকৃতিতে ঈসা (আঃ) এর অনুরূপ করে দিয়েছিলেন) শূলীতে চড়ানো হয়েছে। (কতক রেওয়ায়েত অনুযায়ী এ বিশ্বাসঘাতক মুনাফিক ব্যক্তিই তাঁর বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি করেছিল।) হযরত ঈসা (আঃ) এর একজন উচ্চস্তরের হাওয়ারী "বরনবাস"ও ও ছিল। তার সংকলিত ইনজিলের বর্ণনা কোরআন পাকের এ বর্ণনার সম্পূর্ণ অনুরূপ। কিন্তু খৃষ্টান জগত যখন পোলোসের শয়তানী প্রচেষ্টায় প্রভাবিত হয়ে ত্রিত্ববাদ ও প্রায়শ্চিত্বের আকীদা গ্রহণ করল, তখন খৃষ্টানরা বরনবাসের এ ইনজিলকে অবিশ্বাস্য যোগ্য সাব্যস্ত করল।

তখনই এ অসাধারণ ঘটনা সংঘটিত হয় যে, খৃষ্টধর্মের চরম দুশমন সাউল নামীয় জনৈক ইহুদী আলেম (সে খৃষ্টধর্ম গ্রহণকারীদেরকে প্রত্যেক সম্ভাব্য উপায়ে জ্বালাতন করত, তাদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালাত অন্যদের দ্বারা নির্যাতন করাত এবং এটাই ছিল তার পছন্দনীয় বৃত্তি) আমাদের মতে সুপরিকল্পিতভাবে ও নাটকীয় ভঙ্গিতে হঠাৎ দাবী করে বসল যে, সে খৃষ্টাবাদ ও খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে তার প্রচেষ্টার ব্যাপারেই দামেশক যাচ্ছিল। পথিমধ্যে এক মনযিলে আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত একটি নূর প্রকাশ পেল এবং আকাশ থেকেই ঈসা (আঃ)-এর কণ্ঠস্বর সে শুনতে পেল। তিনি তাকে সম্বোধন করে হবরাসী ভাষায় বললেনঃ হে সাউল, তুমি আমাকে জ্বালাতন কর কেন? এরপর তিনি তাকে ঈমান আনার এবং ধর্মের খেদমত ও ঘোষণা করার দাওয়াত ও উপদেশ দিলেন। সে এই মোজেযা দেখে ঈসা (আঃ) এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করল। এখন সে নিজেকে এ ধর্মের খেদমত ও প্রচারের জন্যে উৎসর্গ করে দিল এবং নিজের নামও পরিবর্তন করে "সাউল'-এর স্থলে পোলোস রেখে নিল।

এরপর পোলোস ঈসা (আঃ)-এর হাওয়ারীগণের কাছে যেয়ে এ অলৌকিক ঘটনা ও নিজের পরিবর্তনের কথা জানালে অধিকাংশ হাওয়ারী তার অতীত জীবন ও জালেমসুলভ আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে তার উপর আস্থা স্থাপন করতে এবং তার বর্ণনাকে সত্য বলে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলনা। তারা তার ব্যাপারে সন্দিগ্ধ ছিল। কিন্তু এক উচ্চস্তরের হাওয়ারী বরনবাস তার কথা মেনে নিল। সে অন্যদেরকেও মেনে নিতে সম্মত করল। এরপর থেকে পোলোস হাওয়ারীগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে এমন আচরণ শুরু করল যে, সাধারণ খৃষ্টানরা তাকে খৃষ্ট ধর্মের মহান নেতা মনে করতে লাগল। এভাবে জনসাধারণের মধ্যে সে অসাধারণ জনপ্রিয়তা ও অনুসৃতের মর্যাদা অর্জন করে নিল।

এরপর সে খৃষ্ট ধর্মের ভিতর থেকে ধ্বংস ও পরিবর্তনের কাজ শুরু করল (যা প্রকৃতপক্ষে তার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা ছিল)। সে তার অনন্য মেধা ও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বুঝে নিল যে, খৃষ্টানদেরকে ঈসা (আঃ) এর আনীত মূল ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন ও পথভ্রষ্ট করার সহজ উপায় হচ্ছে তাদের সামনে ঈসা (আঃ)-এর মর্যাদাকে সীমাতিরিক্ত বাড়িয়ে প্রকাশ করা, তাঁকে আল্লাহ্‌র বেটা অথবা খোদায়ীতে শরীক অথবা স্বয়ং খোদা বলা এবং ক্রুশের ঘটনার স্বরূপ এই ব্যক্ত করা সে, ঈসা (আঃ) তাঁর প্রতি বিশ্বাসী সকল মানুষের পাপের শাস্তি ও আযাবের বিনিময়ে নিজেই এ কষ্ট বরণ করে নিয়েছেন। এভাবে তার ক্রুশে চড়া তার প্রতি বিশ্বাসীদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও ত্রাণের ওছিলা হয়ে গেছে।

এরপর সে এ পথেই কাজ শুরু করল। তার তীর সঠিক লক্ষ্যস্থলে পতিত হল। সাধারণ খৃষ্টানদের মধ্যে ঈসা (আঃ)-এর উপাস্যতা, পুত্রত্ব, ত্রিত্ববাদ ও প্রায়শ্চিত্তের বিশ্বাস দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করল। অনুমান এই যে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর তদানীন্তন হাওয়ারীগণ এবং তাদের শুদ্ধবিশ্বাসী শিষ্যগণ খৃষ্টানদেরকে আসল খৃষ্টধর্মের উপর কায়েম রাখার এবং মুশরিক সুলভ আকীদা থেকে হেফাযতে রাখার চেষ্টা অবশ্যই করে থাকবে। কিন্তু মনে হয় তাদের এই সংস্কারমূলক প্রচেষ্টা অধিক ফলপ্রসূ হতে পারেনি। হযরত ঈসা (আঃ)-কে পৃথিবী থেকে তুলে নেওয়ার পর এক শতাব্দীর মধ্যেই সাধারণ খৃষ্টানদের মধ্যে ঈসা (আঃ)-এর আনীত খৃষ্টধর্মের স্থলে পোলাসের রচিত এই নতুন মুশরিকসুলভ ধর্মই খৃষ্টধর্মের শিরোনামে জনপ্রিয় হয়ে গেল।

এরপর পৃথিবীর প্রায় সকল খৃষ্টানই এ ধর্মকে আপন করে নিল। এবং ত্রিত্ববাদ প্রায়শ্চিত্ব খৃষ্টবাদের মৌলিক বিশ্বাস বলে স্বীকৃতি লাভ করল।
এটা খৃষ্টধর্মে পোলোস কর্তৃক পরিবর্তন ইতিহাসের খুবই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। বিস্তারিত বিবরন এ বিষয়ের উপর লিখিত স্বতন্ত্র গ্রন্থসমূহে দেখা যেতে পারে; বিশেষ করে হযরত মওলানা রসমতুল্লাহ (রহঃ) এর "এযহারুল হকের" অনুবাদ "বাইবেল ছে কোরআন তক" ও তার ভূমিকায় দ্রষ্টব্য।

ইসলামে শিয়াবাদের সূচনাঃ

ইসলামে শিয়াবাদের সূচনার ইতিহাস হুবহু তাই, যা পূর্বে বর্তমান বিকৃত খৃষ্টবাদের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। মূল ইসলামের সাথে শিয়াবাদের সম্পর্ক তাই, যা পোলোসের আবিস্কৃত খৃষ্টবাদের সম্পর্ক রয়েছে ঈসা (আঃ) এর আনীত মূল খৃষ্টধর্মের সাথে, যা নিঃসন্দেহে সত্য ধর্ম ছিল।
এক্ষনে শিয়াবাদ ও তার ইতিহাসের উপর কোন স্বতন্ত্র পুস্তক রচনার ইচ্ছা আমি করিনি; বরং সাময়িক তাগিদে কেবল একটি প্রবন্ধ লিখাই লক্ষ্য। এতেও আসল লক্ষ্য শিয়া মযহারের বুনিয়াদী ও প্রামান্য গ্রন্থসমূহের আলোকে তার পরিচিতি ও স্বরূপ সম্পর্কে তাদেরকে ওয়াকিফহাল করা, যারা অজ্ঞতার কারণে এ সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝিতে লিপ্ত এবং তার ধবজাধারীদের ক্রীড়নক হয়ে শিয়াবাদের প্রসার এবং মুসলমানদের মধ্যে তাকে জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে। তাই কেবল ভূমিকাস্বরূপ এর সূচনার উপর সংক্ষেপে আলোকপাত করতে চাই। ইবনে জরীর তাবারীর ("তারীখুল-উমামে ওয়াল মুলূক" ইবনে কাছির দামেশকীর আল-বেদায়া-ওয়াল-নেহায়া ইবনে হাযম আন্দালুসীর আল্-ফাসলু ফিল মিলালে ওয়াল নেহাল, শহরস্তানীর আল্-মিলাল ওয়াল নেহাল এবং এছাড়াও কতক ঐতিহাসিক উৎস অধ্যয়ন করে শিয়াবাদের সূচনা সম্পর্কে যা জানা গেছে, আমি এখানে কেবল তার সারসংক্ষেপই নিজের ভাষায় পাঠকবর্গকে উৎসর্গ করছি। (আমার বক্তব্য বর্ণিত উৎস সমূহে দ্রষ্টব্য)
সকলেই জানেন, প্রায় সমগ্র আরব উপদ্বীপ নবী করীম (সাঃ)-এর আমলেই ইসলামের শাসনাধীনে এসে গিয়েছিল। ইসলাম ও মুসলমানদের এমন কোন শত্রু শক্তি—না মুশরিকদের, না আহলে কিতাব ইহুদী ও খৃষ্টানদের—সেখানে অবশিষ্ট ছিল না, যারা ইসলামের দাওয়াতের পথ রুদ্ধ করতে পারত। এরপর হযরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর আমলে (যার সময়কাল প্রায় সোয়া দু'বছর) এ পরিস্থিতি আরও জোরদার হয় এবং উপদ্বীপের সীমানার বাইরে অগ্রাভিযান শুরু হয়ে যায়। এরপর ফারুকী খেলাফতের প্রায় দশ বছরের মধ্যে ইসলামী দাওয়াত ও সামরিক বিজয় এত দ্রুত প্রসার লাভ করে যে, তখনকার বিশ্বের দুটি পরাশক্তির (রোমও পারস্য) অধিকাংশ অধিকৃত এলাকা ইসলামের শাসনাধীনে চলে আসে। অতঃপর ফারুকে আযমের শাহাদত বরণের পর হযরত ওছমানের খেলাফতকালেও ইসলামী দাওয়াত ও বিজয় প্রায় সেই গতিতেই অব্যাহত থাকে। এ সময়ের মধ্যে বিভিন্ন দেশ, এলাকা, জাতি ও শ্রেণীর অসংখ্য লোক তাদের প্রাচীন মযহাব ও ধর্ম ত্যাগ করে ইসলামে প্রবেশ করে। তারা

সাধারনতঃ ইসলামকে সত্যধর্ম ও মুক্তির ওছিলা জ্ঞান করে মনেপ্রাণে ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেক এমনও ছিল, যারা মুনাফেকীর জন্যে ইসলাম গ্রহণ করে নিজেদেরকে মুসলমানদের দলে শামিল করে নিয়েছিল। তারা অন্তরে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিহিংসা ও শত্রুতা পোষণ করত। তারা এই উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে শামিল হয়েছিল যে, সুযোগ পেলেই তারা কোন অনর্থ সৃষ্টি করে ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি সাধন করবে।

এ শ্রেণীর মধ্যে এয়ামনের জনৈক ইহুদী আলেম আবদুল্লাহ্ ইবনে সাবা ছিল। সে হযরত ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতকালে তার ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করে। কতক রেওয়ায়েতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, সে মদীনা মুনাওয়ারায় হযরত ওছমানের কাছে হাযির হয় এবং তাঁরই হাতে ইসলাম গ্রহণ করে। সম্ভবতঃ সে আশা করে থাকবে যে, এভাবে সে এক বিশিষ্টতা ও হযরত ওছমানের বিশেষ সুধারণা ও আস্থা অর্জন করতে পারে। কিন্তু হযরত ওছমানের পক্ষ থেকে তার সাথে কোন স্বতন্ত্র ব্যবহার করা হয়নি। পরবর্তীকালে তার যে চরিত্র সামনে আসে, তা থেকে জানা যায় যে, সে সেই ইচ্ছা ও পরিকল্পনার অধীনে ইহুদী ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, যার অধীনে সাউল (পোলাস) ইহুদীধর্ম পরিত্যাগ করে খৃষ্টানধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। তার আসল লক্ষ্য) ছিল মুসলমানদের মধ্যে শামিল হয়ে বিশেষ কলাকৌশলের মাধ্যমে জনপ্রিয়তা অর্জন করতঃ ভিতর থেকে ইসলামকে ধ্বংস ও বিকৃত করা এবং মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ ও ফাটল সৃষ্টি করে ফেতনা ও গোলযোগ সৃষ্টি করা। মদীনায় সংক্ষিপ্ত অবস্থানকালে সম্ভবতঃ সে স্বীয় মেধারবলে অনুমান করে নিল যে, এখানে এবং সমগ্র হেজায এলাকার প্রয়োজনীয় ধর্মীয় চেতনা ব্যাপকভাবে বিদ্যমান এবং এখানে ধর্মের এমন রক্ষক রয়েছে, যাদের সামনে সে তার লক্ষ্য অর্জনে সফলকাম হতে পারবে না। তাই অতঃপর সে বসরাও সিরিয়া গমণ করল। সেখানেও সে তার পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করার সুযোগ পেল না। এরপর সে মিসরে গেল। এখানে সে এমন লোক পেয়ে গেল, যাদেরকে সে ক্রীড়নক ও দুরভিসন্ধিতে সাহায্যকারী বানাতে পারে। সে সম্ভবতঃ খৃষ্টধর্ম ধ্বংস ও বিকৃত করার কাজে পোলোসের সাফল্য থেকে এই সবক শিখেছিল যে, কোন উম্মত ও ধর্মীয় সম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করার সহজ পথ এই যে, তাদের দৃষ্টিতে পবিত্র ও প্রিয়তম ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জনের পন্থা অবলম্বন করতে হবে। ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেন যে, সে সর্বপ্রথম মিসরীয়দের মধ্যে এই ধোঁয়া ছাড়ল যে, সেই মুসলমানদের প্রতি আমার আশ্চর্য লাগে, যারা এ পৃথিবীতে ঈশা (আঃ)-এর পুণরাগমণের আকীদা রাখে এবং সাইয়িদুল আম্বিয়া মোহাম্মদ (সাঃ)-এর এ ধরণের আগমণে বিশ্বাস করে না। অথচ তিনি হযরত ঈসা (আঃ) ও সকল পয়গম্বরের তুলনায় শ্রেষ্ঠ ও উচ্চতম মর্যাদায় আসীন। তিনি অবশ্যই পুনরায় এ পৃথিবীতে আগমণ করবেন।

সে সেই মূর্খ ও অনভিজ্ঞ লোকদের সামনেই এ কথাটি রাখল, যাদের মধ্যে এ ধরনের প্রলাপোক্তি কবুল করে নেওয়ার যোগ্যতা দেখতে পেল। এরপর যখন সে দেখল যে, কথাটি মেনে নেওয়া হয়েছে (যা ইসলামী ও কোরআনী শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত), তখন সে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে হযরত আলী মুর্তযার বিশেষ আত্মীয়তার ভিত্তিতে তাঁর প্রতি অসাধারণ ভক্তি

ও মহব্বত প্রকাশ করে তার শানে নানারকম বাড়াবাড়ির কথাবার্তা শুরু করে দিল। তাঁর দিকে আশ্চর্য ধরণের মোজেযা সম্বন্ধযুক্ত করে তাঁকে এক মানবোধব সত্বারূপে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করল। যে মুর্খ ও সরলমনা শ্রেণী তার প্রতারণার শিকার হয়েছিল, তারা এসকল প্রলাপোক্তিও মেনে নিতে লাগল। এভাবে সে তার পরিকল্পিত স্কীম অনুযায়ী আস্তে আস্তে হযরত আলীর প্রতি এ হেন বিশ্বাস পোষণ কারীদের নিয়ে আপন ভক্তবর্গের একটি হালকা (বৃত্ত) তৈরী করেনিল। অতঃপর এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে এই মানসিকতা সৃষ্টি করল যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পরে খলিফা, ইমাম ও রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার অধিকার প্রকৃতপক্ষে হযরত আলীরই ছিল। প্রত্যেক নবীর একজন ভারপ্রাপ্ত হয়েছে এবং ভারপ্রাপ্তই নবীর পরে তার জায়গায় উম্মতের প্রধান হয়ে থাকে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ভারপ্রাপ্ত হযরত আলী (রাঃ) ছিলেন। সে বললঃ তৌরাতেও তাঁকেই ভারপ্রাপ্ত বলা হয়েছিল। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ওফাতের পর লোকেরা চক্রান্ত করে তাঁর অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছে এবং তাঁর স্থলে আবুবকরকে খলিফা করেছে। সে তার পরবর্তী সময়ের জন্যে ওমরকে মনোনীত করেছে। অতঃপর ওমরের পরেও হযরত আলীর বিরুদ্ধে চক্রান্ত হয়েছে এবং ওছমানকে খলিফা করা হয়েছে, যে এর মোটেই যোগ্য ছিলনা। এখন সে এবং তাঁর গভর্ণররা এমন এমন ভ্রান্ত কাজ করছে।

লক্ষণীয় যে, এটা ছিল সেই সময়কাল, যখন মিসর ও কতক অন্য শহরেও কতিপয় গভর্ণরের বিরুদ্ধে অভিযোগের সিলসিলা শুরু হয়ে গিয়েছল। এ পরিস্থিতি ও পরিমণ্ডলকে আবদুল্লাহ্ ইবনে সাবা পুরাপুরি কাজে লাগাল। সে বলতে শুরু করল যে, সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজে নিষেধ এবং উম্মতের মধ্যে সৃষ্ট অনর্থক, ভ্রষ্টতা সংশোধনের চিন্তা ও চেষ্টা করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। তাই ওছমান ও তার গভর্ণরদের কারণে উম্মতের মধ্যে যে ভ্রষ্টতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তা দূর করার জন্যে আমাদের তৎপর হওয়া উচিত এবং একে খতম করার জন্যে সম্ভাব্য সবকিছু করা দরকার।

এসব কিছু আবদুল্লাহ্ ইবনে সাবা চরম চতুরতা, গোপনীয়তা ও ইহুদী স্বভাবের প্রতারণা ও ধূর্তামী দ্বারা এভাবে করল, যেমন গোপন আন্দোলন পরিচালনা করা হয়। সে মিসর ছাড়া অন্যান্যকতক এলাকা ও শহরেও তার কিছু সংখ্যক সমমনা ভক্ত তৈরী করে নিল।

এরপর এক সময়ে সে তার ফাঁদে আটকা ভক্তদের মাধ্যমে অন্য অনেক মূর্খ ও সরলপ্রাণ ব্যক্তিকে হযরত ওছমান (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে সম্মত করে নিল। অতঃপর এক পর্যায়ে গোপনে প্রোগ্রাম তৈরী করা হলো যে, অমুক দিন সকলেই সঙ্ঘবদ্ধভাবে একটি বাহিনীর আকারে মদীনা পৌঁছবে। অতঃপর তাই হল। আবদুল্লাহ্ ইবনে সাবা ও তার চেলাদের বিভ্রান্ত করা বিদ্রোহী লম্পটদের গোটা বাহিনী মদীনায় পৌঁছে গেল।

পরে যা কিছু হয়েছে, তা এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। হযরত ওছমান তৎকালে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে শক্তিপ্রয়োগ করার কেবল অনুমতি দিলে তা কখনও হতে পারত না, যা হয়েছে। কিন্তু তিনি চাননি যে, তাঁর প্রাণের হেফাযতের জন্যে কোন কলেমা উচ্চারণকারী মুসলমানের রক্তের ছিটা মাটিতে পড়ুক। এর পরিবর্তে নিজে মজলুমের মত শহীদ হয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে পৌঁছে যাওয়াই তিনি পছন্দ করলেন। এভাবে তিনি দুনিয়াতে মজলুমের মত শাহাদাত ও কোরবানীর এক অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত

স্থাপন করলেন। (১)

এহেন রক্তক্ষয়ী পরিবেশে হযরত আলী (রাঃ) চতুর্থ খলিফা নির্বাচিত হলেন। তিনি নিঃসন্দেহে সত্য খলিফা ছিলেন। উম্মতের মধ্যে তখন অন্য কোন ব্যক্তিত্ব ছিল না, যে এই মহান পদের জন্যে তাঁর চেয়ে অধিক যোগ্য বিবেচিত হত। কিন্তু হযরত ওছমানের মজলুমসুলভ শাহাদতের ফলস্বরূপ (অথবা এ শাহাদাতের খোদায়ী শাস্তিস্বরূপ) মুসলিম উম্মা দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়ল এবং পারস্পরিক যুদ্ধ বিগ্রহও সংঘটিত হল। জঙ্গে জমল ও জঙ্গে ছিফ্‌ফীন হল। আবদুল্লাহ ইবনে সাবার বিপুল সংখ্যক ভক্তের দল হযরত আলী মুর্তযার সঙ্গে ছিল। এ মসময় ও এ পরিবেশে সে বাহিনীর মুর্খ ও স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে হযরত আলীর প্রতি মহব্বত ও ভক্তির কথা বলে বাড়াবাড়ি মূলক পথ ভ্রষ্টতায় লিপ্ত করার পূর্ণ সুযোগ পেল। সে কিছু সংখ্যক সরলপ্রাণ ব্যক্তিকে সেই সবক দিল, যা পোলোস খৃষ্টানদেরকে দিয়েছিল। ফলে তারা বিশ্বাস করতে লাগল যে, হযরত আলী এ পৃথিবীতে খোদার রূপ এবং তাঁর দেহে খোদায়ী আত্মা রয়েছে এবং তিনিই যেন খোদা। সে কিছু সংখ্যক নির্বোধের কানে এ কথা ঢেলে দিল যে, আল্লাহ নবুওয়ত ও রেসালতের জন্যে আসলে হযরত আলীকে মনোনীত করেছিলেন। তিনিই এর যোগ্য পাত্র ছিলেন। ওহীবাহক ফেরশতা জিবরাঈলকে তার কাছেই পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তিনি ভুল বশতঃ ওহী নিয়ে মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর কাছে পৌঁছে গেলেন। আস্তাগফেরুল্লাহ ওয়ালা হাওয়া ও ওয়ালা কওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ।

ঐতিহাসিকগণ আরও বর্ণনা করেন, হযরত আলী যখন কোনরূপে জানতে পারেন যে, তাঁর বাহিনীতে কিছু লোক তাঁর সম্পর্কে এ ধরনের কথা প্রচার করছে, তখন তিনি এ শয়তানদেরকে হত্যা করার এবং সাধারণের শিক্ষার জন্যে তাদেরকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করার সংকল্প করেন। কিন্তু তার চাচাত ভাই, বিশেষ সহকারী ও উপদেষ্টা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ও তাঁর মত কিছু লোকের পরামর্শে তখনকার বিশেষ পরিস্থিতিতে এ সংকল্পের বাস্তবায়নকে উপযুক্ত সময়ের জন্যে মুলতবী করে দেন।(১)

মোটকথা, জমল ও ছিস্‌ফীন যুদ্ধের সময় আবদুল্লাহ্ ইবনে সাবা ও তার চেলারা তখনকার বিশেষ পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে হযরত আলীর বাহিনীতে তাঁর সম্পর্কে বাড়াবাড়ির গোমরাহী প্রচার করার পুরাপুরি সুযোগ পেয়ে যায়। অতঃপর তিনি যখন এরাক অঞ্চলে কুফাকে স্বীয়

(১) এখানে প্রশ্ন হয় যে, আবদুল্লাহ্ ইবনে সাবা ও তার দল সেই অনর্থের জন্যে দায়ী ছিল, যার ফলস্বরূপ হযরত ওছমান (রাঃ) শহীদ হন। উপরে বলা হয়েছে যে, তাদের পরিকল্পনা ছিল ইসলামের সর্বনাশ সাধন এবং মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে স্বয়ং ইসলামের ক্ষতি করা ও তার শক্তি ভেঙ্গে দেওয়া। তারা যা কিছু করেছে, এ লক্ষ্য অর্জনের জন্যেই করেছে। এহেন গোলযোগকারী ও ফেৎনা সৃষ্টিকারীদের মূলোৎপাটন করা এবং তাদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করা ইসলামী হুকুমতের অর্থাৎ হযরত ওছমানের অবশ্য কর্তব্য ছিল। এটা তার ব্যক্তিগত সমস্যা ছিলনা। এমতাবস্থায় তিনি দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করলেন না কেন? কিন্তু বাস্তব ঘটনা এই যে, তাদের এই আন্দোলন ও সকল কর্মতৎপরতা গোপন ছিল বিধায় তখন এসব সত্য সম্মুখে আসেনি। এটা পরবর্তী ঘটনাবলী ও ইতিহাস ঘাটাঘাটি করে জানা যায়। তখন এটাই সকলের সম্মুখে ছিল যে, তারা হযরত ওছমানের রাষ্ট্রপ্রধান পদে বহাল থাকার বিরুদ্ধে। তাই হযরত ওছমান এপথে ধরেন এবং নিজের প্রাণ ও ক্ষমতার হেফাজতের জন্যে রক্তপাত ও অন্যের প্রাণ সংহার করার পরিবর্তে নিজের প্রাণ বিসর্জন দেওয়া তিনি নিজের জন্যে উত্তম জ্ঞান করেছেন।

রাজধানী করে নেন, তখন এই এলাকা এ দলের কর্মতৎপরতার বিশেষ কেন্দ্রে পরিণত হয়। বিভিন্ন কারণে এ এলাকার লোকদের মধ্যে এহেন বাড়াবাড়িমূলক মতবাদ কবুল করার অধিক যোগ্যতা ছিল বিধায় এ দল এখানে তাদের মিশনে অধিকতর সাফল্য অর্জন করে।

শিয়াদের মধ্যে বিভিন্ন দল উপদলঃ

এ পর্যন্ত শিয়াবাদের সূচনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করা হল। এ দাওয়াত ও আন্দোলন গোপনে ও কানাকানির মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছিল বিধায় এর দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিবর্গ সকলেই একই আকীদায় বিশ্বাসী ছিল না। এর আহবায়ক যার কাছে যে কথা এবং যতটুকু কথা বলা উপযুক্ত মনে করত, ততটুকুই বলত। সে তা কবুল করে নিলে তাই তার আকীদা হয়ে যেত। এ কারণে তাদের মধ্য এমন লোকও ছিল, যারা হযরত আলীর উপাস্যতা অথবা তাঁর মধ্যে খোদায়ী আত্মার প্রবিষ্টতায় বিশ্বাসী ছিল। এমন লোকও ছিল, যারা তাঁকে রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকেও শ্রেষ্ঠ এবং নবুওয়ত ও রেসালতের আসল হকদার মনে করত। এমন লোকও ছিল, যারা তাঁকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পরবর্তী সময়ের জন্যে আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে মনোনীত ইমাম, আমীর ও ভারপ্রাপ্ত রসূল জ্ঞান করত এবং এর ভিত্তিতে খলিফাত্রয় হযরত আবুবকর, ওমর ও ওছমান (রাঃ)-কে এবং যে সকল ছাহাবী রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাতের পর তাদেরকে খলিফা মেনেছে, তাদের সকলকে (নাউযুবিল্লাহ) কাফের, মুনাফিক অথবা কমপক্ষে অধিকারহরণকারী, জালেম ও বিশ্বাসঘাতক বলত। তাদের সকলের মধ্যে অভিন্ন বিন্দু ছিল হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করা। তবে এ বাড়াবাড়ির বিভিন্ন স্তর ছিল। প্রাথমিক যুগে তারা পরস্পর থেকে আলাদা আলাদা দল ছিল না। পরবর্তী কালে ঐতিহাসিকগণের বর্ণিত বিভিন্ন কারণে তারা বিভিন্ন দলে ও উপদলে বিভক্ত হতে থাকে। অবশেষে এসব দলের সংখ্যা সত্তুরেরও বেশী হয়ে যায়। এর কিছুটা বিবরণ মিলাল ওয়ানেহাল গ্রন্থ পাঠ করে জানা যায়। " তুহফায়ে ইছনাআশারিয়া" গ্রন্থে হযরত শাহ্ আবদুল আজিজ (রহঃ) ও এসব দল, আকীদা ও মতবাদ এবং পারস্পরিক বিরোধ উল্লেখ করেছেন। হযরত আলী (রাঃ)-এর পরে কে কে ইমাম হবে, সে সম্পর্কেও তাদের মধ্যে এত মতবিরোধ রয়েছে, যা গণনা করা মুশকিল। তাদের মধ্যে অনেক দল এমন, যার সম্ভবতঃ এখন দুনিয়াতে কোথাও অস্তিত্ব নেই। ইতিহাসের পৃষ্ঠায়ই তাদের নাম নিশানা বাকী রয়ে গেছে। কিন্তু কয়েকটি দল আমাদের এ যুগেও বিভিন্ন দেশে পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে সংখ্যার দিক দিয়ে এবং কতক অন্য দিকদিয়েও "ইছনা আশারীয়া" সম্প্রদায় অধিক স্বতন্ত্র ও গুরুত্বপূর্ণ। এ-গ্রন্থে আমরা এ ফেরকা সম্পর্কেই আরয করতে চাই।

---

(১) কতক রেওয়ায়েত থেকে জানা যা যে, হযরত আলীর উপাস্যতার আকীদা পোষনকারী এবং এ আকীদার প্রতি আহবানকারী এসব শয়তানকে তাঁরই আদেশে হত্যা করা হয় এবং অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) মিনহাজুস সুন্নাহ গ্রন্থে একথা বর্ণনা করেছেন। (১ম খণ্ড, ৭ পৃষ্ঠা) শিয়াদের রিজাল বিষয়ক সর্বাধিক প্রামাণ্য "রিজালকুশী" গ্রন্থেও ইমাম জা'ফর ছাদেক থেকে একাধিক রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করা হয়েছে। এগুলো থেকে এটাই জানা যায় যে, আবদুল্লাহ ইবনে সাবা হযরত আলী মূর্তযাকে উপাস্য বিশ্বাস করত এবং মানুষকে এ বিশ্বাসের প্রতি দাওয়াত দিত। অবশেষে হযরত আলী তাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করে খতম করে দেন। (মুদ্রিত বোম্বাই, ১৩১৭ হিঃ—পৃষ্ঠা ৭০)

কেননা, রুহুল্লাহ্ খোমেনী ইছনা আশারিয়া । তার ইসলামী ধ্যান ধারণা, মযহাব, আকীদা ও মতবাদ তাই, যা ইছনা আশারিয়াদের স্বীকৃত মৌলিক গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত হয়েছে এবং যেগুলোকে তিনি তার নিষ্পাপ ইমামগণের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেন এবং তাদের শিক্ষা ও উপদেশ বলে বিশ্বাস করেন। (১)

এ মযহাবের বিস্তারিত জ্ঞান এর প্রামাণ্য গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করেই অর্জন করা যায়। এখানে আমরা কেবল এর কয়েকটি আকায়েদ উল্লেখ করব, যার উপর ইছনা আশারিয়া মযহাবের ভিত্তিস্থাপিত এগুলো পাঠ করে পাঠকবর্গ জানতে পারবেন যে, তাদের ইসলামী ধ্যানধারণা ও মৌলিক আকীদাসমূহ কোরআন, সুন্নাহ্ ও অধিকাংশ উম্মতের মত ও পথ থেকে কতটুকু ভিন্ন এবং এই মতভেদের প্রকার কি? যারা এ মতভেদকে হানাফী শাফেয়ী মালেকী, হাম্বলী, আহলেহাদীস প্রমুখ মুসলমানদের বিভিন্ন চিন্তাক্ষেত্রের মত মতভেদ মনে করে এবং জনগণকে এই ধারণা দিতে চায়, তারা সত্য সম্পর্কে কতটুকু অজ্ঞ, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে কতবড় ভ্রান্তির মধ্যে লিপ্ত এবং ধর্মীয় ব্যাপারে তাদের উপর আস্থাশীল মুসলমানদের পথ ভ্রষ্টতার কি বিরাট দায়িত্ব তারা নিচ্ছে, তাও জানা যাবে। আল্লাহতায়ালা তাদেরকে তওফীক দান করুন, যাতে তারা প্রকৃত সত্য বুঝে এবং যে ভুল হয়ে গেছে, তা পূরণ করার চিন্তা করে।

---

(১) ইসলামে শিয়াবাদের সূচনা এবং শিয়াদের বিভিন্ন ফেরকা সম্পর্কে এ পর্যন্ত যা আরয করা হয়েছে, তা থেকে বিজ্ঞ পাঠকবর্গ বুঝে থাকবেন যে, আবদুল্লাহ্ ইবনে সাবা শিয়াবাদের কেবল ভিত্তি স্থাপন করেছিল এবং বীজ বপন করেছিল। এরপর শিয়াদের যে বিভিন্ন দল উপদল ও মযহাব সৃষ্টিহয়েছে, তা আবদুল্লাহ্ ইবনে সাবার প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ শিষ্যদের রচনা। ইছনা আশারিয়া মহহাব ও এমনি ধরনের কিছু লোকের রচনা। আমি জানি যে, শিয়া আলেম ও গ্রন্থকারগণ আবদুল্লাহ ইবনে সাবার সাথে সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করে থাকেন; বরং নিকট অতীতের কতক শিয়া গ্রন্থকার তো তাকে এক কাল্পনিক ব্যক্তি সাব্যস্ত করেছেন এবং তার অস্তিত্বই অস্বীকার করেছেন। কিন্তু এটা এমন দাবীর মত যে, কারবালায় হযরত হুসায়ন (রাঃ)-এর শাহাদতের যে ঘটনা বর্ণনা করা হয়, তা নিছক কাল্পনিক উপন্যাস, যার কোন সত্য নেই। শিয়াদের প্রামাণ্যতম রেজালগ্রন্থ "রিজাল কুশীতে" আবদুল্লাহ ইবনে সাবার উল্লেখ আছে এবং বিভিন্ন সনদ দ্বারা ইমাম জাফর ছাদেক থেকে বর্ণিত আছে যে, সে হযরত আলীর উপাস্যতায় বিশ্বাস করত এবং শেষ পর্যন্ত হযরত আলী তাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করে খতম করে দেন। এ গ্রন্থেই আবদুল্লাহ ইবনে সাবা সম্পর্কে শেষ কথা এই লিখিত আছেঃ

ذكربعض اهل العلم ان عبد الله بن سباكان يهوديا فاسلمو والى علياعليه السلام وكان يقول و هوعلى يهوديته فى يوشع بن نون وصى موسى بالغلو فقال فى اسلامه بعد وفات رسول الله صلى الله عليه وسلم فى على عليه السلام مثل ذلك وكان اول من اشهر بالقول بابفرض امامة على واظهر البراءة من اعدائه وكاشف مخالفيه واكفرهم ٥

কোন কোন আলেম বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে সাবা পূর্বে ইহুদী ছিল, এরপর ইসলাম গ্রহণ করে এবং হযরত আলীর সাথে বিশেষ সম্পর্ক প্রকাশ করে। ইহুদী থাকাকালে সে হযরত মূসা (আঃ) এর ভারপ্রাপ্ত 'ইউশা' ইবনে নূন সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করত। মুসলমান হওয়ার পর সে এমনি ধরনের বাড়াবাড়ি হযরত আলী সম্পর্কে করতে থাকে। সেই প্রথম ব্যক্তি, যে হযরত আলীর ইমামতের আকীদা ফরজ বলে ঘোষণা করে এবং তার দুশমনদের সাথে সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করে। সে প্রকাশ্যে তাদের বিরোধিতা করেছে এবং তাদেরকে কাফের সাব্যস্ত করেছে। (মুদ্রিত বোম্বাই, ১৩ পৃষ্ঠা)

ইছনা আশারিয়া ও তার ভিত্তি ইমামত

আমাদের অধিকাংশ আলেমও এ বিষয়ে ওয়াকিফহাল নয় যে, শিয়া ইছনা আশারিয়ার ইমামতের স্বরূপ কি? তাদের মতে ধর্মে এর মর্তবা কি? তাদের মতে ইমামত ধর্মের এমন একটি রুকণ, যেমন তওহীদের আকীদা, রেসালতের আকীদা এবং কিয়ামত ও আখেরাতের অকীদা।

খুব সংক্ষেপে ইমামতের আলোচনা পূর্বেও করা হয়েছে। এখন আমরা ওয়াদা অনুযায়ী এর প্রয়োজনীয় বিস্তারিত বিবরণ ইছনা আশারীদের স্বীকৃত বুনিয়াদী প্রস্থাবলী এবং তাদের নিষ্পাপ ইমামগণের উক্তি থেকে পেশ করতে চাই। কিন্তু এসবের সারমর্ম প্রথমে নিজের ভাষায় আরয করা সমীচীন মনে হয়। আশা করি, এরপর শিয়া মসহাব ও ইমামত সম্পর্কে অজ্ঞ পাঠকবর্গের জন্যেও ইমামগণের বর্ণনা ও উক্তি থেকে এ বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ হৃদয়ঙ্গম করা ইনশাআল্লাহ্ সহজ হয়ে যাবে।

ইছনা আশারিয়ার আকীদা বরং ঈমান এই যে, আল্লাহতায়ালা তাঁর ন্যায় বিচার, প্রজ্ঞা ও রহমতের অপরিহার্য তাগীদে নবুওয়ত ও রেসালত জারি করেছেন। বান্দার হেদায়াত ও পথপ্রদর্শন এবং নেতৃত্বের জন্যে তাঁর পক্ষ থেকে নবী রসূলগণ মনোনীত হয়ে এসেছেন। তারা নিষ্পাপ ও আনুগত্যশীল হতেন এবং তাদের দাওয়াতেই বান্দার উপর আল্লাহর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হত এবং বান্দা ছোয়াব ও আযাবের যোগ্য হত। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তাআলা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাতের পর থেকে বান্দার পথ প্রদর্শন ও নেতৃত্বের জন্যে এবং তাদের উপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে ইমামত শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্যে বারজন ইমাম মনোনীত করে দিয়েছেন। দ্বাদশতম ইমামের উপর পৃথিবীর লয় ও কিয়ামত হবে। এই বারজন ইমাম পয়গাম্বরগণের মতই আল্লাহ্র প্রমাণ, নিষ্পাপ ও আনুগত্যশীল এবং মর্তবায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সমান এবং অন্য পয়গাম্বরগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উর্ধ্বে। এই ইমামগণের ইমামত স্বীকার করা এবং তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা তেমনি নাজাতের শর্ত, যেমন পয়গাম্বরগণর নবুওয়ত ও রেসালত স্বীকার করা এবং তাঁদের প্রতিবিশ্বাস স্থাপন করা নাজাতের শর্ত। এই বারজনের মধ্যে প্রথম ইমাম হযরত আলী মুর্তযা ছিলেন। ইমামতের পদ তাঁর মনোনয়নের ঘোষণা স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ওফাতের প্রায় আশি দিন পূর্বে বিদায় হজ্ব থেকে ফেরার পথে আল্লাহ্ তাআলার জোর নির্দেশে গাদীরে খুম নামক স্থানে করেছিলেন। এমনিভাবে আল্হতায়ালার পক্ষ থেকেই তার পরবর্তী সময়ের জন্যে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হাসান এ পদের জন্যে মনোনীত হয়েছিলেন। তাঁর পরবর্তী সময়ের জন্যে তার ছোটভাই হযরত হুসাইন, এরপর তার পুত্র আলী ইবনে হুসাইন (জয়নুল আবেদীন), এরপর তার পুত্র মোহাম্মদ ইবনে আলী (ইমাম বাকের), এরপর তার পুত্র জা'ফর ছাদেক, এরপর তার পুত্র মুসা কাযেম, এরপর তারপুত্র মুসা রেযা, এরপর তার পুত্র মোহাম্মদ ইবনে আলী তকী, এরপর হাসান ইবনে আলী আসকারী এবং তার পরবর্তী সময়ের জন্যে দ্বাদশতম ও সর্বশেষ ইমাম মোহাম্মদ ইবনে হাসান

(অন্তর্হিত ইমাম মেহদী), যিনি শিয়া আকীদা অনুযায়ী এখন থেকে প্রায় সাড়ে এগার শ' বছর পূর্বে ২৫৫ অথবা ২৫৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করে চার অথবা পাঁচ বছর বয়সে অলৌকিকভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যান এবং এখন পর্যন্ত একটি গুহায় আত্মগোপন করে আছেন। তাঁর উপর ইমামত শেষ হয়ে গেছে। (১) শিয়া আকীদা অনুযায়ী দুনিয়াতে আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট ও মনোনীত জীবিত ইমাম থাকা জরুরী, যে বান্দাদের জন্যে আল্লাহর প্রমাণ হবে এবং এটা আল্লাহ্র দায়িত্ব। তাই তিনি কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকবেন এবং কিয়ামতের পূর্বে কোন সময় গুহা থেকে আত্মপ্রকাশ করবেন। তিনি সঙ্গে সেই আসল কোরআন নিয়ে আসবেন, যা হযরত আলী (রাঃ) সংকলন করেছিলেন (যা বর্তমান কোরআন থেকে ভিন্ন)। এছাড়া মছহাফে ফাতেমা, বান্দাদের হেদায়াতের সমস্ত উপকরণ, জ্ঞান বিজ্ঞানের সমস্ত ভাণ্ডার "আলজফর" ও "আলজামেয়া" ইত্যাদিও সঙ্গে নিয়ে আসবেন। এগুলো তিনি পূর্ববর্তী ইমামগণের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

শিয়া ইছনা আশারিয়ার আকীদা ও তাদের ইমামগণের বাণী অনুযায়ী এই বারজন আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে মনোনীত ইমাম ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রকৃত খলিফা ও স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। তারা সকলেই রসূলগণের ন্যায় নিষ্পাপ ছিলেন। তাদের আনুগত্য তেমনি ফরয ছিল এবং ফরয রয়েছে। যেমন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও অন্য সকল নবী-রসূলে আনুগত্য তাদের উম্মতের উপর আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে ফরয করা হয়েছিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পরে এই ইমামগণই বান্দাদের উপর আল্লাহর প্রমাণ। তাদের মর্তবা এই যে, দুনিয়া তাদেরই বলে কায়েম রয়েছে। যদি সামান্য সময়ের জন্যেও দুনিয়া ইমাম থেকে খালি হয়ে যায় তবে পৃথিবী ধ্বসে যাবে এবং সমগ্র সৃষ্টজগত ফানা হয়ে যাবে। এই ইমামগণ সকলেই মোজেযাসম্পন্ন ছিলেন। তাদের কাছে এমনিভাবে ফেরেশতা আগমন করত, যেমন পয়গাম্বরগণের কাছে আগমন করত। তাদের মেরাজও হত। তাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাবও নাযিল হত। তারা সকলেই অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন এবং সকল পয়গাম্বরের জ্ঞানগরিমার অধিকারী ছিলেন। তাদের কাছে প্রাচীন ঐশীগ্রন্থ সমূহ তওরাত, যবূর, ইঞ্জিল ইত্যাদি আসল আকৃতিতে বিদ্যমান ছিল এবং তারা সেগুলো সেই ভাষায় পাঠ করতেন। তাদের কাছে এমন অনেক জ্ঞানও ছিল, যা কোরআন অথবা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মাধ্যমে নয় বরং সরাসরি আল্লাহ্ তাআলা থেকে অথবা অন্যান্য বিশেষ সূত্র থেকে অর্জিত হত। তাদের যে বস্তু অথবা যে কাজকে ইচ্ছা হালাল অথবা হারাম করার ক্ষমতা ছিল। তাদের প্রত্যেকেই আপন মৃত্যুর সময় জানতেন এবং তাদের মৃত্যু স্বয়ং তাদের ক্ষমতাধীন ছিল।

ইমামত ও নিষ্পাপ ইমামগণ সম্পর্কে এ পর্যন্ত যা আরয করা হল, তা আমার নিজের ভাষায় ইমামগণের সেইসব বাণী ও রেওয়ায়েতের সারসংক্ষেপ, যা ইছনা আশারিয়া শিয়াদের প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহে সংরক্ষিত আছে। এসব গ্রন্থ অধ্যয়ন করে আমি এসব তথ্য জানতে পেরেছি। এসব রেওয়ায়েত ও বাণী তাদেরই ভাষায় পাঠকবর্গ এরপরে দেখতে পারেন। এগুলো থেকে সুধী

(১) লক্ষণীয় যে, এটা ইছনা আশারি আকীদার বর্ণনা। ঐতিহাসিক সাক্ষ্য এবং গবেষণা লব্ধ তথ্য এই যে, হাসান ইবনে আলী আসকারীর কোন পুত্র জন্মগ্রহণই করেনি। তার সহোদর ভাই জা'ফর ইবনে আলীর বর্ণনা তা-ই। এ কারণেই তিনি হাসান ইবনে আলীর উত্তরাধিকার স্বত্ব লাভ করেছিলেন।

পাঠকবর্গ তাদের ইমামগণের আরও অনেক অত্যাশ্চর্য কামাল ও স্বাতন্ত্র্য জানতে পারবেন, যেগুলোর প্রতি এখানে ইঙ্গিতও করা যায়নি।

আমাদের ইচ্ছা এ গ্রন্থে শিয়া আকীদা নিয়ে তর্কবিতর্ক করা নয়; বরং আমরা এগুলো যেমন আছে তেমনি পাঠকবর্গের সামনে পেশ করে দিতে চাই। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এখানে আমাদের সম্বোধন সুন্নী আলেম ও সুধী ব্যক্তিবর্গের প্রতিই যারা শিয়াবাদ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয় এবং যাদের এ অজ্ঞতার অনুভূতিও নেই। ফলে তারা ভুলের উপর ভুল করে যাচ্ছে এবং এতে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর ভীষণ ক্ষতি হচ্ছে।

এখন আমরা সুধী পাঠকবর্গের সামনে ইছনা অশারি শিয়াদের প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে ইমামত সম্পর্কিত তাদের ইমামগণের বাণী ও রেওয়ায়েত পেশ করব, যেগুলোতে সেই সবকিছু বলা হয়েছে, যা আমরা উপরে নিজের ভাষায় আরয করেছি।

এস্থলে শিয়াদের হাদীসগ্রন্থ ও রেওয়ায়েত সম্পর্কে একথা বলে দেওয়া সমীচীন মনে করি যে, আমাদের সুন্নীদের কাছে যেমন ছহীহ্ বুখারী, ছহীহ্ মুসলিম ইত্যাদি হাদীসের গ্রন্থাবলী রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বাণী, তাঁর ক্রিয়াকর্ম, ঘটনাবলী ও অবস্থা সনদ সহকারে বর্ণিত হয়েছে, তেমনি শিয়াদের কাছেও হাদীস ও রেওয়ায়েতের গ্রন্থাবলী রয়েছে। কিন্তু এগুলোতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর হাদীসসমূহের অংশ খুবই কম; বরং বিরলও বলা যায় (সম্ভবতঃ পাঁচশতাংশ)। এ গুলোতে অধিকতর তাদের নিষ্পাপ ইমামগণেরই বাণী, কর্ম ও অবস্থা তাদের সনদ সহকারে বর্ণিত হয়েছে। শিয়া দৃষ্টিকোণে এরূপই হওয়া উচিত। কেননা, তাদের মতে এখন কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্যে ইমামগণই বান্দাদের জন্যে আল্লাহর প্রমাণ, তাঁর প্রতিনিধি, ভাষ্যকার এবং উম্মতের জন্যে হেদায়াতের ওছিলা। তাদের মর্তবা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সমান এবং অন্য সকল নবী ও রসূল থেকে শ্রেষ্ঠ ও উর্ধ্বে।

ইছনা আশারিয়া শিয়াদের এসব হাদীসগ্রন্থের মধ্যে তাদের মতে সর্বাধিক প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে আবু জা'ফর এয়াকুব কুলায়নী রাযীর (মৃত্যু ৩২৮ হিঃ) "আল-জামিউল কাফী"। বিশুদ্ধতা ও সনদের দিক দিয়ে তাদের মতে এর মর্তবা তাই, যা আমাদের সুন্নীদের মতে ছহীহ বুখারীর মর্তবা অথবা এরচেয়েও কিছু বেশী (১) আমাদের সামনে এর যে সংস্করণ রয়েছে, তা এখন থেকে একশ দু'বছর পূর্বে ১২০২ হিজরীতে নওলকিশোর লক্ষ্মৌয়ের ছাপাখানা থেকে

---

(১) আমাদের এ কথা বলার কারণ এই যে, এ গ্রন্থের গ্রন্থকার অথবা সংকলক আবু জাফর এয়াকুব কুলায়নী রাযী সেই যুগ পেয়েছেন, যাকে শিয়াদের পরিভাষায় غيبت صغرى এর যুগ বলা হয়; অর্থাৎ যে যুগে (শিয়া আকীদা অনুযায়ী) অন্তর্হিত ইমাম ইমাম মেহদীর কাছে তার বিশেষ দূতদের আসাযাওয়া হত। শিয়া আলেমগণের মধ্যে খ্যাত এবং তাদের কতক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, আবূ জা'ফর এয়াকুব কুলায়নী এ গ্রন্থ সংকলন করার পর জনৈক দূতের মাধ্যমে অন্তর্হিত ইমামের কাছে প্রেরণ করেন। তিনি গ্রন্থটি পাঠ করে এর সত্যায়ন করেন এবং বলেনঃ هذا كاف لشيعتنا (এটা আমাদের শিয়াদের জন্যে যথেষ্ট)। এই প্রসিদ্ধ রেওয়ায়েত অথবা গল্পের ভিত্তিতে এ গ্রন্থ একজন নিষ্পাপ ইমাম দ্বারা সত্যায়িত। কিন্তু আমাদের সুন্নীদের মতে ছহীহ্ বুখারী কোন নিষ্পাপ ব্যক্তি দ্বারা সত্যায়িত নয়। প্রকাশ থাকে যে, অন্তর্হিত ইমাম, তার غيبت صغرى এবং দূতদের গোপনে তার কাছে আসা যাওয়া সম্পর্কে এখানে যা লিখা হয়েছে, তা ইছনা আশারি শিয়াদের আকীদা। এখন বাস্তব ঘটনা কি, তা পাঠকবর্গ ইনশাআল্লাহ পরে জানতে পারবেন, সেখানে অন্তর্হিত ইমাম ও তার অন্তর্ধান সম্পর্কে বিস্তারিত লিখা হবে।

প্রকাশিত হয়েছিল। আমরা বেশীর ভাগ এ গ্রন্থের বরাত দিয়েই আরম্ভ করব। এটাই ইছনা আশারি মযহাবের সর্বাধিক প্রমাণ্য উৎস। এ গ্রন্থটি চার খণ্ডে সমাপ্ত। পৃষ্ঠাসংখ্যা আড়াই হাজারের কাছাকাছি। এতে ষোল হাজারের অধিক রেওয়ায়েত আছে।
এখন পাঠকবর্গ শিয়া গ্রন্থাবলীর সেইসব রেওয়ায়েত এবং তাদের ইমামগণের সেইসব বাণী লক্ষ্য করুন, যার মধ্যে ইমামত ও ইমামগণ সম্পর্কে ইছনা আশারী আকীদা সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে। আমরা প্রয়োজন অনুযায়ী শিরোনাম স্থাপন করে রেওয়ায়েতসমূহ পেশ করব।

ইমামত সম্পর্কে শিয়া গ্রন্থাবলীর রেওয়ায়েত ও ইমামগণের বাণী

সৃষ্টজীবের উপর আল্লাহর প্রমাণ ইমামগণ ব্যতীত প্রতিষ্ঠিত হয় নাঃ

উছূলুল কাফি কিতাবুল হুজ্জাত-এ একটি অধ্যায় রয়েছে, যার শিরোনাম ان الحجة لا تقوم للهعلى خلقه الابامام (এর অর্থ তাই, যা শিরোনামে লিখা হয়েছে।) এ অধ্যায়ে সনদ সহকারে স্পষ্ট ইমাম জা'ফর ছাদেক থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ

ان الحجةلاتقوم للهعزوجل على خلقه الابامام حتى يعرف

সৃষ্ট জীবের উপর আল্লাহ্ তাআলার প্রমাণ ইমাম ব্যতীত প্রতিষ্ঠিত হয় না, যাতে তার মাধ্যমে আল্লাহর এবং তাঁর ধর্মে মারেফত অর্জিত হয়। (১০২ পৃষ্ঠা)
এ অধ্যায়ে এ বিষয়বস্তুর আরও কয়েকটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করা হয়েছে, যাদের ভাষা প্রায় কাছাকাছি।

ইমাম ব্যতীত দুনিয়া কায়েম থাকতে পারে না।ঃ

উছূলে কাফীতে উপরোক্ত অধ্যায়ের পরে দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম باب ان الارض لاتخلومن حجة (দুনিয়া প্রমাণ অর্থাৎ ইমাম থেকে খালি থাকতে পারে না।)
এ অধ্যায়ে এ বিষয়বস্তুর কয়েকটি রেওয়ায়েত পূর্ণ সনদ সহকারে বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে কেবল দু'টি রেওয়ায়েত এখানে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছেঃ—

عن ابى حمزة قال قلت لابى عبدالله تبقى الارض بغيرامام؟ قال لوبقيت الارض بغيرامام لساخت

আবু হামযা থেকে বর্ণিত আছে— আমি ইমাম জা'ফর ছাদেককে বললাম, এ পৃথিবী ইমাম ব্যতীত কায়েম থাকতে পারে কি? তিনি বললেনঃ যদি পৃথিবী ইমাম ব্যতীত বাকী থাকে, তবে ধ্বসে যাবে (কায়েম থাকতে পারবে না)। (১০৪ পৃষ্ঠা)

عن ابى جعفر قال لوان الامام رفع من الارض ساعة لماجت باهلهاكمايموج البحرباهله

ইমাম বাকের থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ যদি ইমামকে এক মুহূর্তের জন্যেও পৃথিবী থেকে তুলে নেওয়া হয়, তবে পৃথিবী তার অধিবাসীদের নিয়ে এমন উদ্বেলিত হবে, যেমন সমুদ্রে তরঙ্গ উঠে।

ইমামগণকে চিনা ও মানা ঈমানের শর্ত ঃ

এ গ্রন্থেরই এক অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে— باب معرفة الامام والرداليه এতে একটি রেওয়ায়েত আছে—

عن احدهماانهقال لا يكون العند مومناحتى يعرف الله ورسوله والائمة كلهم وامام زمانه

ইমাম বাকের অথবা ইমাম জা'ফর ছাদেক থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ কোন বান্দা মুমিন হতে পারে না যে পর্যন্ত সে আল্লাহ্, তাঁর রসূল এবং সকল ইমাম বিশেষতঃ সমসাময়িক ইমামের মারেফত অর্জন না করে। (১০৫ পৃষ্ঠা)

এ অধ্যায়েই পূর্ণ সনদ সহকারে অন্য একটি রেওয়ায়েত—

عن ذريح قال سالت ابا عبدالله عن الائمة بعد النبى صلى الله عليه وسلم فقال كان امير المؤ منين عليه السلام اماما ثم كان الحسن اماما ثم كان الحسين اماما ثم كان على بن الحسين اماما ثم كان محمد بن على اماما من انكرذلك كان كمن انكرمعرفةالله تبارك و تعالى ومعرفة رسول الله........

যুরায়হ থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেনঃ আমি ইমাম জা'ফর ছাদেককে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পরবর্তী ইমামগণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেনঃ নবী করীম (সাঃ) এর পরে আমিরুল মুমিনীন আলী (আঃ) ইমাম ছিলেন। তাঁর পরে হাসান ইমাম ছিলেন। তাঁর পরে হুসাইন ইমাম ছিলেন। তাঁর পরে আলী ইবনে হুসায়ন ইমাম ছিলেন। যে এটা অস্বীকার করে, সে আল্লাহ ও রসূলের মারেফত অস্বীকারকারীর মতই। (১০৬ পৃষ্ঠা)

ইমামত, ইমামগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও তা প্রচারের আদেশ সকল পয়গাম্বর ও সকল ঐশী গ্রন্থের মাধ্যমে এসেছে ঃ

উছুলে কাফী গ্রন্থেই ইমাম জা'ফর ছাদেক থেকে বর্ণিত আছে—

قال ولايتناولاية الله التى لم يبعث نبى قط الابها তিনি বলেনঃ আমাদের বেলায়েত (অথ্যাৎ মানুষের উপর আমাদের শাসনকর্তৃত্ব) হুবহু আল্লাহ্ তাআলার বেলায়েত ও শাসনকর্তৃত্ব। আল্লাহর পক্ষ থেকে যে নবীই প্রেরিত হয়েছেন, তিনি এ আদেশ নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন। (২৭৬ পৃষ্ঠা)।

এর-পর এ পৃষ্ঠাতেই ইমাম জা'ফর ছাদেকের পুত্র সপ্তম ইমাম আবুল হাসান মুসা কাযেম থেকে বর্ণিত আছে।

قال ولاية على(ع)مكتوبة فى جميع صحف الانبياءولن يبعث الله رسولاالابنبوةمحمد صلى الله عليه وسلم ووصية على عليه السلام

তিনি বলেনঃ আলী (আঃ)-এর বেলায়েত (অর্থাৎ ইমামত ও শাসনকর্তৃত্ব) পয়গাম্বরগণের সকল ছহিফায় লিখিত আছে। আল্লাহ্ তাআলা এমন কোন নবী প্রেরণ করেননি, যে মোহাম্মদ (সাঃ)-এর নবী হওয়া এবং আলী (রাঃ) এর ভারপ্রাপ্ত হওয়ার প্রতি বিশ্বাসস্থাপনের আদেশ আনেননি এবং তা প্রচার করেননি। (২৭৬ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ ও রসূলগণের সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ যে নূরের প্রতি বিশব্স স্থাপনের আদেশ কোরআনে দেওয়া হয়েছে, তার অর্থ ইমামগণঃ

উছুলে কাফীতে একটি অধ্যায় এই যে, ان الائمة نورالله عزوجل এ অধ্যায়ের প্রথম রেওয়ায়েত এইঃ

عن ابی خالد الکابلی سألت اباجعفرعن قول الله عزوجل امنوابالله ورسله والنوراالذی انزلنا -فقال یاابا خالد النوروالله الائمة

আবু খালদ কাবুলী থেকে বর্ণিত আছে— আমি ইমাম বাকেরকে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম— "তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহ্র প্রতি, তাঁর রসূলগণের প্রতি এবং আমার অবতীর্ণ নূরের প্রতি"। ইমাম বাকের বললেনঃ হে আবু খালেদ, আল্লাহর কসম, এখানে নূর মানে ইমামগণ। (১১৭ পৃষ্ঠা)।

কোরআন মজীদে যেখানে যেখানে আল্াহ্ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ নূরের কথা আছে সেখানেই সমগ্র উম্মতের মতে এবং আরবী ভাষায় সামান্যও ব্যুৎপত্তি রাখে, এমন প্রত্যেক ব্যক্তির মতে অর্থ কোরআন পাক, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হেদায়াতের নূর। আল্াহর ও রসূলের সাথে সাথে এর প্রতিও বিশ্বাস স্থাপনের আদেশ দেওয়া হয়েছে। (এসব আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্কও একথাই ব্যক্ত করে।) কিন্তু শিয়া রেওয়ায়েতসমূহে ইমাম বাকের ইমাম জাফর ছাদেক ও ইমাম মুসা কাযেম সকলেই বলেন যে, এ সব আয়াতে نور من الله (আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর) বলে কোরআন নয়— শিয়াদের বার ইমাম বুঝানো হয়েছে এবং আল্লাহ ও রসূলের সাথে তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বলা হয়েছে।

ইমামগণের আনুগত্যকরণ ফরযঃ

উছুলে কাফী গ্রন্থেই এক অধ্যায়ের শিরোনাম— باب فرض طاعة الائمة এ অধ্যায়ের একটি রেওয়াতের এইঃ

عن ابی الصباح قال اشهد انی سمعت اباعبدالله یقول اشهد ان علیاامام فرض الله طاعته وان الحسن امام فرض الله طاعته، وان الحسین امام فرض الله طاعته وان علی بن الحسین امام فرض الله طاعته وان محمد بن علی امام فرض الله طاعته-١٠٩

আবুছ ছাবাহ্ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দেই যে; আমি ইমাম জাফর ছাদেকের কাছ থেকে শুনেছি তিনি বলতেন যে, আমি সাক্ষ্য দেই যে, আলী ইমাম। আল্লাহ্ তার আনুগত্য ফরয করেছেন। হাসান ইমাম আল্লাহ তাঁর আনুগত্য ফরয করেছেন। হুসাইন ইমাম। আল্লাহ তার আনুগত্য ফরয করেছেন। আলী ইবনে হুসায়েন ইমাম। আল্লাহ তাঁর আনুগত্য ফরয করেছেন। মোহাম্মদ ইবনে আলী ইমাম। আল্লাহ তাঁর আনুগত্য ফরয করেছেন। (১০৯ পৃঃ)

এ অধ্যায়ে ইমাম জাফর ছাদেক থেকেই বর্ণিত আছে যে, তিনি বলতেনঃ

نحن الذين فرض الله طاعتنا لا يسع الناس الا معرفتنا ولايعذرالناس بجهالتنا من عرفناكان مومناومن انكرنا كان كافرا ومن لم يعرفناولم ينكرناكان ضالا حتى يرجع الى الهدى الذى افترض الله عليه من طاعتناالواجبة-١١٠

আল্লাহ্ আমাদের আনুগত্য ফরয করেছেন। আমাদেরকে চিনা ও মানা সকল মানুষের জন্যে জরুরী। আমাদের সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে মানুষ ক্ষমাযোগ্য মনে করা হবে না। যে আমাদেরকে চিনে ও মানে, সে মুমিন। যে আমাদেরকে অস্বীকার করে, সে কাফের। আর যে আমাদেরকে চিনে না এবং অস্বীকারও করে না, সে পথভ্রষ্ট যে পর্যন্ত সে হেদায়েতের পথে না আসে এবং আমাদের ফরয আনুগত্য কবুল না করে। (১১০ পৃঃ)

এ বিষয়বস্তুর একটি রেওয়াতে ইমাম জাফর ছাদেকের পিতা ইমাম বাকের থেকেও বর্ণিত আছে। তার উপসংহারে ইমাম বাকের ইমামগণের আনুগত্য ফরয হওয়ার কথা বর্ণনা করার পর বলেনঃ هذا دين الله ودين ملائكته এটাই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণের ধর্ম।) (১১১ পৃঃ)

ইমামগণের আনুগত্য রসূলগণের মতই ফরযঃ

عن ابى الحسن العطار قال سمعت اباعبد الله يقول اشرك بين الاوصياءوالرسل فى الطاعةاصول كافى ١١٠

আবুল হাসান আত্তার রেওয়ায়েত করেন— আমি ইমাম জাফর ছাদেক'কে বলতে শুনেছি ওছি অর্থাৎ ইমামগণকে আনুগত্য রসূলগণের সাথে শরীক কর। (১১০ পৃঃ)

ইমামগণ যা ইচ্ছা হালাল অথবা হারাম করার ক্ষমতা রাখেনঃ

উছুলে কাফীতে মোহাম্মদ ইবনে সিনান থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতে তিনি বলেনঃ আমি আবু জাফর ছানীকে (মোহাম্মদ ইবনে আলী তকী) হালাল ও হারাম সম্পর্কে শিয়াদের পারস্পরিক মতভেদের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেনঃ

يامحمد ان الله تبارك وتعالى لم يزل منفردابوحدانيته ثم خلق محمدا وعلياو فاطمة فمكثوا الف دهر ثم خلق جميع الاشياء فاشهد هم خلقها واجرىٰ طاعتهم عليهاو فوض امورها اليهم فهم يحلون ما يشاءون و يحرمون مايشاءون ولن يشاءوا الاان يشاءالله تبارك وتعالى-

হে মোহাম্দ, আল্লাহ্ তাআলা অনাদিকাল থেকে আপন একক সত্তায় ভূষিত ছিলেন। অতঃপর তিনি মোহাম্মদ, আলী ও ফাতেমাকে সৃষ্টি করেন। এরপর তারা হাজারো শতাব্দী অবস্থান করলেন। এর পর আল্লাহ্ তাআলা দুনিয়ার সকল বস্তু সৃষ্টি করেন এবং তাদের সৃষ্টির উপর তাদেরকে সাক্ষী করলেন। তাদের আনুগত্য সকল সৃষ্টির উপর ফরয করলেন এবং সৃষ্টির সকল ব্যাপারাদি তাদের হাতে সোপর্দ করলেন। কাজেই তাঁরা যাকে ইচ্ছা হালাল করেন এবং যাকে ইচ্ছা হারাম করেন। তবে তাঁরা তাই ইচ্ছা করেন, যা আল্লাহ ইচ্ছা করেন। (২৭৮ পৃঃ) এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, আল্লামা কজভিনী এ রেওয়ায়েতের ব্যাখ্যায় বলেন—এখানে মোহাম্মদ, আলী ও ফাতেমা বলে তাঁদের তিন জন এবং তাদের বংশের সকল ইমামকে বুঝানো হয়েছে।

মোটকথা, ইমাম আবু জাফর ছাদীর (যিনি নবম ইমাম) জওয়াবের সারকথা এই যে, ইমামগণকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে, তারা যে বস্তুকে ইচ্ছা হালাল অথবা হারাম করতে পারবেন। তাই এ ক্ষমতার অধীনে কোন বস্তুকে অথবা কোন কাজকে এক ইমাম হালাল করেছেন এবং অন্য ইমাম হারাম করেছেন। ফলে আমাদের শিয়াদের মধ্যে হালাল-হারামের মতভেদ সৃষ্টি হয়ে গেছে।

ইমামগণ পয়গাম্বরগণের মত নিষ্পাপঃ

উছুলে কাফীতে এক শিরোনাম আছে— অষ্টম ইমাম ইবনে মুসা রেযার একটি দীর্ঘ খুতবা রয়েছে। এতে ইমামগণের শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বারবার তাদের নিষ্পাপতা উল্লেখ করা হয়েছে। এক জায়গায় বলা হয়েছেঃ الامام المطهرمن الذنوب والمبرأمن العيوب ইমাম সর্বপ্রকার পাপ ও দোষ থেকে পবিত্র ও মুক্ত হন। এর পর এ খুতবায় ইমাম সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

فهو معصوم مويد موفق مسدد قدامن من الخطاء والزلل والعثار، يخصر الله بذلك ليكون حجة على عباده وشاهده على خلقه

তিনি নিষ্পাপ। আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ সমর্থন ও তওফীক তাঁর সাথে থাকে। আল্লাহ তাঁকে সোজা রাখেন। তিনি ভুলত্রুটি ও পদস্খলন থেকে হেফাযতে থাকেন। আল্লাহ এসব নেয়ামত দ্বারা তাঁকে খাছ করেন, যাতে তিনি তাঁর বান্দাদের উপর তাঁর প্রমাণ হন এবং তাঁর সৃষ্টির উপর সাক্ষী হন। (২২১-২২২ পৃঃ)

ইমামগণের গর্ভ ও জন্ম সম্পর্কে জাফর ছাদেকের অদ্ভুত বর্ণনাঃ

উছুলে কাফীতে একটি অধ্যায় আছে— باب مواليد الائمة عليهم السلام এতে ইমামগণের জন্ম সম্পর্কে আশ্চর্য ও অভাবনীয় রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। এ অধ্যায়ের সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য রেওয়ায়েতটি অনেক দীর্ঘ। তাই তার কেবল সারমর্মই নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছেঃ

ইমাম জাফর ছাদেকের বিশেষ মুরীদ আবু বছীর বর্ণনা করেনঃ যে দিন ইমাম সাহেবের পুত্র ইমাম মুসা কাযেম জন্মগ্রহণ করেন (যিনি সপ্তম ইমাম), সেদিন তিনি বর্ণনা করলেন যে, প্রত্যেক ইমামের জন্ম এমনিভাবে হয়। যে রাত্রিতে মায়ের গর্ভে তার গর্ভসঞ্চার আল্লাহর পক্ষ থেকে অবধারিত থাকে, সে রাত্রিতে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে এক আগন্তুক (ফেরেশতা) অত্যন্ত সুস্বাদু শরবতের একটি গ্লাস নিয়ে তাঁর পিতার কাছে আসে এবং তা তাকে পান করিয়ে দেয়। এর পর আগন্তুক বলেঃ এখন আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে সহবাস করুন। সহবাসের পর ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণকারী ইমামের গর্ভ মায়ের জরায়ুতে স্থির হয়ে যায়। এ স্থলে ইমাম জাফর ছাদেক সবিস্তারে বর্ণনা করলেনঃ আমার প্রপিতামহ (ইমাম হুসাইন)-এর সাথে তাই হয়েছে এবং এর ফলশ্রুতিতে আমার পিতামহ ইমাম জয়নুল আবেদীন জন্মগ্রহণ করেন। এরপর তার সাথেও তাই হয় এবং এর ফলশ্রুতিতে আমার পিতা ইমাম বাকের জনন্মগ্রহণ করেন। এরপর তার সাথেও সম্পূর্ণ এমনি ধরনের ঘটনা ঘটে এবং এর ফলশ্রুতিতে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। যে রাত্রিতে আমার এই নবজাতক পুত্রের (মুসা কাযেম) গর্ভ আমার স্ত্রীর জরায়ুতে স্থিতি লাভ করে, সে রাত্রিতে আমার সাথেও এ ঘটনাই ঘটে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে এক আগন্তুক (ফেরেশতা) অত্যন্ত সুস্বাদু ও উৎকৃষ্ট শরবতের গ্লাস নিয়ে আমার কাছে আসে এবং আমাকে স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে বলে। আমি সহবাস করলে এ পুত্রের গর্ভ স্থিতি লাভ করে। এ রেওয়ায়েতে আরও আছে যে, ইমাম যখন মায়ের গর্ভ থেকে বাইরে আসে, তখন তার হাত মাটিতে এবং মস্তক আকাশের দিকে উঠানো থাকে। (সংক্ষেপিত—২৪৪ পৃঃ) এ অধ্যায়ের সর্বশেষ রেওয়ায়েতটিও পাঠকবর্গ দেখে নিন।

| সাধারণ মানবীয় স্বভাবের বিপরীতে ইমামগণের দশটি বৈশিষ্ট্যঃ

যুবারা বর্ণনা করেন যে, ইমাম বাকের বলেছেনঃ—

للامام عشرعلامات يولد مطهرا مختوناواذا وقع على الارض وقع على راحتيه رافعا صوته بالشهادتين ولا يجنب ينام عيناه ولا ينام قلبه ولا يتثاؤ ب ولا يتمطى ويرى من خلفه كمايرى من امامه ونجوه كرائحة المسك والارض مامورة بستره وابتلاعه واذالبس درع رسول الله صلى الله عليه اله كانت وفقاواذاالبسها غيره من الناس طويلهم وقصيدهم زادت عليه شبرا

ইমামের দশটি বিশেষ আলামত আছে। সে
সম্পূর্ণ পাকছাফ ও লিঙ্গাগ্রার্মচ্ছেদিত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। যখন মায়ের গর্ভে থেকে মাটিতে পড়ে, তখন উভয় হাতের তালু মাটিতে রাখা থাকে এবং উচ্চঃস্বরে শাহাদতের দু'কালেমা পাঠ করে। তার কখনও "জানাবত" (গোসলের প্রয়োজন) হয় না। নিদ্রাবস্থায় কেবল তার চক্ষু নিদ্রা যায়— অন্তর জাগ্রত থাকে। তার কখনও হাই আসে না এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গে মোচড় হয় না। সে যেমন সামনের দিকে দেখে, তেমনি পিছনের দিকেও দেখে। তার পায়খানায় মেশকের মত সুগন্ধি থাকে। আল্লাহর পক্ষ থেকে মৃত্তিকাকে আদেশ করা হয়েছে সেটি ঢেকে নিতে ও গিলে নিতে। সে যখন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর লৌহবর্ম পরিধান করে, তখন তা তার গায়ে সম্পূর্ণ ফিট হয়ে যায়। আর যখন অন্য কোন ব্যক্তি এটা পরিধান করে, তখন সে দীর্ঘদেহী হোক কিংবা বেঁটে হোক—লৌহবর্ম অর্ধহাত বড় হয়ে যায়। (২৪৬ পৃঃ)

ইমামগণের গর্ভ মায়ের জরায়ুতে নয়— পার্শ্বে কায়েম হয় এবং তারা মায়েদের উরু দিয়ে ভূমিষ্ট হনঃ

উছূলে কাফীতে সাধারণ মানবীয় স্বভাবের বিপরীতে ইমামগণের উপরোক্ত দশটি বৈশিষ্ট্যই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আল্লামা মজালসী "হক্কুল এয়াকীন" গ্রন্থে একাদশতম ইমাম হাসান আসকারী থেকে আরও রেওয়ায়েত করেছেন যে, তিনি বলেনঃ
আমাদের ইমামগণের গর্ভ জননীর পেটে অর্থাৎ জরায়ুতে স্থিত হয় না : বরং পার্শ্বে থাকে এবং আমরা জরায়ু থেকে বাইরে আসি না ; বরং জননীর উরু থেকে জন্মগ্রহণ করি। কেননা, আমরা আল্লাহ্ তাআলার নূর। তাই আমাদেরকে নোংরামী, আবর্জনা ও নাপাকী থেকে দূরে রাখা হয়। (১২৬ পৃঃ ইরানী মুদ্রণ)
পূর্বোক্ত রেওয়ায়েতে ইমামগণের যে প্রথম বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, অর্থাৎ তাঁরা পাকছাফ জন্মগ্রহণ করেন, সম্ভবতঃ তার মতলব তাই, যা আল্লামা মজালমী ইমাম হাসান আসকারীর রেওয়ায়েত থেকে বর্ণনা করেছেন।

ইমামতের মর্তবা নবুওয়তের উর্ধেঃ

এই আল্লামা বাকের মজলিসী তার "হায়াতুল কুলুব" গ্রন্থে লিখেনঃ
ইমামতের মর্তবা নবুওয়ত ও পয়গাম্বরীর উর্ধে। (৩য় খণ্ড, ১০ পৃঃ)

ইমামগণকে ইমাম মান্যকারী (শিয়া) জালেম ও পাপিষ্ট হলেও জান্নাতী এবং তাদের ছাড়া মুসলমান মুত্তাকী পরহেযগার হলেও দোযখীঃ

উছূলে কাফীতে ইমাম বাকের থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ
আল্লাহতায়ালা এমন উম্মতকে আযাব দেওয়া থেকে বিরত থাকবেন না, যে আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত নয়—এমন ইমামকে মান্য করে (যেমন হযরত আবু বকর, ওমর ও ওছমানকে উম্মতের ইমাম ও সত্য খলিফা মান্যকারী মুসলমান) যদিও এই উম্মত আমলের দিক দিয়ে পরহেযগার ও মুত্তাকী হয়। পক্ষান্তরে এমন উম্মতকে শাস্তি দেওয়া থেকে আল্লাহ বিরত থাকবেন, যে আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত ইমামগণকে মান্য করে যদিও তারা আমলের দিক

দিয়ে জালেম, পাপাচারী ও অসচ্চরিত্র হয়। (২৩৮ পৃঃ)

এ অধ্যায়ে আরও একটি রেওয়ায়েত আছে যে, ইমাম জাফর ছাদেকের এক অকৃত্রিম শিয়া মুরিদ আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াকুব একবার ইমাম জাফর ছাদেকের খেদমতে আরয করলেনঃ আমি সাধারণভাবে মানুষের সাথে মেলামেশা করি। তখন এটা দেখে খুবই আশ্চর্যবোধ করি যে, যারা আপনাদের ইমামতে বিশ্বাস করে না (অর্থাৎ শিয়া নয়) এবং অমুককে অমুককে (আবূ বকর ও ওমরকে) খলিফা বলে বিশ্বাস করে, তাদের মধ্যে বিশ্বস্ততা, সত্যতা ও অঙ্গীকার পালনের গুণাবলী রয়েছে। পক্ষান্তরে যারা আপনাদেরকে ইমামতে বিশ্বাস করে (অর্থাৎ শিয়া), তাদের মধ্যে বিশ্বস্ততা, অঙ্গীকার পালন ও সত্য পরায়ণতার গুণাবলী নেই (বরং তারা বিশ্বাসঘাতক, মিথ্যাবাদী ও প্রতারক)।

আবদুল্লাহ ইবনে আবূ ইয়াকুব বর্ণনা করেন যে, তার এ কথা শুনে ইমাম জাফর ছাদেক সোজা হয়ে বসে গেলেন এবং ক্রুদ্ধ অবস্থায় তাকে বললেনঃ

সেই ব্যক্তির ধর্ম এবং ধর্মীয় আমল, গ্রহণযোগ্য নয়, যে কোন অন্যায় ইমামের ইমামতে বিশ্বাসী হয়— এমন ইমাম, যে আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত নয়। পক্ষান্তরে এমন ব্যক্তির উপর আল্লাহর কোন ক্রোধ ও আযাব হবে না, আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত ইমাম আদেলের ইমামতে বিশ্বাসী হয়। (উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ যতবড় পাপিষ্টই হোক, যদি সে ইছনা আশারী ইমামগণের ইমামতে বিশ্বাস করে, তবে সে ক্ষমা পাবে।) (২৩৮ পৃঃ)

ইমামগণের মর্তবা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সমান এবং সমগ্র সৃষ্টি ও অন্য সকল পয়গম্বরের উর্ধ্বেঃ

উছূলে কাফীতে আমিরুল মুমিনীন হযরত আলী মুর্তযা ও তাঁর পরবর্তী ইমামগণের ফযিলত ও মর্তবার বর্ণনায় ইমাম জাফর ছাদেকের একটি নাতিদীর্ঘ বক্তব্য উদ্বৃত করা হয়েছে। তার প্রাথমিক অংশ এইঃ—

ماجاءبه على أخذبه ومانهى عنه انتهى عنه جرى له من الفضل مثل ماجرى لمحمد ولمحمد الفضل على جميع خلق الله عزوجل المتعقب عليه فى شيئى من احكامه كالمتعقب على الله وعلى رسوله والراد عليه فى صغيرة او كبيرة على حدالشرك بالله كان امير المؤمنين باب الله الذى لايؤتى الامنه ووسيله الذى من سلك بغيره يهلك وكذلك جرى لائمة الهدى واحدبعد واحد

আলী যে সকল বিধান এনেছেন, আমি তা মেনে চলি। আর যে কাজ তিনি নিষেধ করেছেন, আমি তা করি না। তার ফযিলত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর অনুরূপ। আর মোহাম্মদ সকল মখলূকের উপর ফযিলত রাখেন। আলীর কোন আদেশে আপত্তিকারী রসূলের আদেশে আপত্তিকারীর মত। কোন ছোট অথবা বড় বিষয়ে তার খণ্ডনকারী আল্লাহর সাথে শিরক করার পর্যায়ে থাকে। আমিরুল মুমিনীন আল্লাহর এমন দরজা ছিলেন যে, এ দরজা ছাড়া অন্য কোন

দরজা দিয়ে আল্লাহর কাছে যাওয়া যায় না এবং তিনি আল্লাহর এমন পথ ছিলেন যে, কেউ অন্য পথে চললে ধ্বংস হয়ে যাবে। এমনিভাবে ইমামগণের একের পর একের জন্যে ফযিলত অব্যাহত রয়েছে। অর্থাৎ সকলের এই মর্তবা।

আমিরুল মুমিনীনের উক্তি ঃ সকল ফেরেশতা এবং সকল পয়গম্বর আমার জন্যে তখনই স্বীকৃতি দিয়েছিল, যেমন মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জন্যে দিয়েছিল এবং আমিই মানুষকে জান্নাত ও দোযখে প্রেরণকারী ঃ

উপরোক্ত রেওয়ায়েতেই এর পরে আছে—

وكان اميرالمؤمنين كثيرامايقول اناقسيم الله بين الجنة والنار وانا صاحب العصا والميسم

ولقداقرت لى جميع الملا ئكة والروح والرسل مثل مااقروا به لمحمد

আমিরুল মুমিনীন প্রায়ই বলতেন—আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে জান্নাত ও দোযখের মধ্যে বন্টনকারী (আর্থাৎ আমি মানুষকে জান্নাত ও দোযখে প্রেরণ করব)। আমার কাছে মূসার লাঠি ও সোলায়মানের আংটি আছে। আমার জন্যে সকল ফেরেশতা রুহ (যে জিবরাঈল ও সকল ফেরেশতার উর্ধ্বে এক মহান মখলুক) এবং সকল গয়গাম্বর তেমনি স্বীকৃতি দিয়েছিল, যেমন তারা মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জন্যে দিয়েছিল। (১১৭ পৃঃ)

ইমামগণের জন্যে অতীত ও ভবিষ্যতের জ্ঞান অর্জিত ছিল। তারা জ্ঞানে হযরত মূসার ন্যায় উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন পয়গাম্বরেরও উর্ধ্বে ছিলেন ঃ

উছুলে কাফীর এক অধ্যয়ের শিরোনামা হচ্ছে—

ان الائمة عليهم السلام يعلمون ماكان وما يكون وانه لا يخفى عليهم شيئى صلوات الله عليهم

(অর্থাৎ ইমামগণ ভূত ও ভবিষ্যতের জ্ঞান রাখেন এবং কোন বস্তু তাদের দৃষ্টি থেকে উধাও হতে পারে না।) এ অধ্যায়ের প্রথম রেওয়ায়েত এই যে, ইমাম জাফর ছাদেক তার বিশেষ অন্তরঙ্গ সহচরদের এক মজলিসে বললেন ঃ—

لوكنت بين موسى والخضرلا خبرتهما انى اعلم منهما ولانبأتهماماليس فى ايديهما لان موسى والخضر عليهما السلام اعطياعلم ماكان ولم يعطيا علم ما يكون وماهو كائن حتى تقوم الساعة وقدورثناه من رسول الله صلى الله عليه واله وراثة

ان الائمة شهداءالله عزوجل على خلقه

যদি আমি মূসা ও খিযিরের মধ্যে হতাম, তবে তাদেরকে বলতাম যে, আমি তাদের উভয়ের চেয়ে বেশী জ্ঞান রাখি এবং যা তারা জানত না, সে সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করতাম।

কেননা, মূসা ও খিযির কেবল অতীতের জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং ভবিষ্যতের ও কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হওয়ার, তার জ্ঞান তাদেরকে দেওয়া হয়নি। আমরা এ জ্ঞান রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছি। (১৬০ পৃঃ)

ইমামগণ কিয়ামতের দিন সমসাময়িক লোকদের জন্যে সাক্ষ্য দিবেনঃ

উছূলে কাফীর এক অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছেঃ

ইমামগণ আল্লাহর মখলূক সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবেন

এ অধ্যায়ের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, ইমাম জাফর ছাদেককে নিম্নোক্ত আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়—

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَامِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا

"তখন কি অবস্থা হবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষ্যদাতা আনব এবং হে পয়গাম্বর, আপনাকে তাদের সকলের উপর সাক্ষ্যদাতারূপে আবন ?" জওয়াবে ইমাম জাফর ছাদেক বললেনঃ

نزلت فى امة محمد خاصة فى كل قرن منهم امام منا شاهد عليهم ومحمد شاهد علينا

এ আয়তটি (অন্যান্য উম্মতের সাথে সম্পর্ক যুক্ত নয়) বিশেষভাবে উম্মতে মোহাম্মদীয়া সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। প্রতি যুগে তাদের মধ্যে আমাদের মধ্য থেকে একজন ইমাম হবেন। তিনি সমসাময়িক লোকদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবেন এবং মোহাম্মদ (সাঃ) আমাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবেন। (১১২ পৃঃ)

এ অধ্যায়ের শেষ রেওয়ায়েত এই যে, আমিরুল মুমিনীন বলেনঃ

ان الله تبارك وتعالى طهرناوعصمنا وجعلناشهداء على خلقه و حجة فى ارضه

আল্লাহতায়ালা আমাদেরকে পবিত্র করেছেন, নিষ্পাপ করেছেন এবং স্বীয় মখলূকের উপর আমাদেরকে সাক্ষ্যদাতা এবং পৃথিবীতে স্বীয় প্রমাণ করেছেন। (১১৩ পৃঃ)

পূর্ববর্তী পয়গাম্বরগণের প্রতি অবতীর্ণ সকল গ্রন্থ তওরাত, ইঞ্জিল, যবুর ইত্যাদি ইমামগণের কাছে থাকে এবং তারা এগুলো মূল ভাষায় পাঠ করেনঃ

উছূলে কাফীর একটি শিরোনাম হচ্ছে—

ان الائمة عند هم جميع الكتب التى نزلت من عندالله عزوجل وانهم يعرفو نها على اختلاف السنتها •

(ইমামগণের পূর্ববর্তী পয়গাম্বরগণের প্রতি অবতীর্ণ সকল কিতাব রয়েছে। ভাষার বিভিন্নতা সত্বেও তারা এগুলো পাঠ করেন এবং জানেন।) এ অধ্যায়ে এ বিষয়বস্তুর রেওয়ায়েত এবং ইমাম জাফর ছাদেক ও তার পুত্র মূসা কাসেমের এ সম্পর্কিত ঘটনাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। এর পূর্ববর্তী অধ্যায়েও এ বিষয়বস্তুর রেওয়ায়েত রয়েছে। উদাহরণতঃ এক রেওয়ায়েতে আছে যে, ইমাম জাফর ছাদেক বলেনঃ

وان عندنا علم التوراة والانجيل والزبور وتبيان مافى الالواح

"আমাদের কাছে তওরাত, ইঞ্জিল ও যবূরের এলম আছে এবং আলওয়াহে যা ছিল, তবর সুস্পষ্ট বর্ণনা আছে। "অন্য এক অধ্যায়ে ইমাম জাফর ছাদেকেরই এই উক্তি বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমাদের কাছে "আলজাফরুল আবইয়াম" আছে। এটা কি,.প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ

زبورداودعليه السلام وتوراة موسى وانجيل عيسى و صحف ابراهيم

তাতে রয়েছে দাউদের যবূর, মূসার তওরাত, ঈসার ইঞ্জিল এবং ইবরাহীম (আঃ)-এর ছহিফাসমূহ। (১৭৪ পৃঃ)

ইমামগণের জন্যে কোরআন ও হাদীস ছাড়া জ্ঞানের অন্যান্য অত্যাশ্চর্য সূত্র ঃ

উছূলে কাফীর এক অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে—

باب فيه ذكرالصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة عليها السلام

(ছহিফা, জাফর, জামেয়া ও ফাতেমার মাছহাফের আলোচনা)

এ অধ্যায়ের প্রথম রেওয়ায়েতটি নাতিদীর্ঘ। তাই একে সংক্ষেপিত আকারেই পাঠকবর্গের জন্যে উৎসর্গ করা হচ্ছে।

শিয়া রেওয়ায়েত অনুযায়ী ইমাম জাফর ছাদেকের বিশেষ অন্তরঙ্গ শিয়া মুরিদ আবূ বছির বর্ণনা করেন—আমি একদিন ইমাম জাফর ছাদেকের খেদমতে হাজির হয়ে আরয করলাম ঃ আমি একটি বিশেষ কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। এখানে ভিন্ন মতাবলম্বী কেউ নেই তো? ইমাম সাহেব এ গৃহ ও অন্য গৃহের মাঝখানে ঝুলানো একটি পর্দা তুলে ভিতরে দেখে বললেন ঃ এখন এখানে কেউ নেই। যা মনে চায় জিজ্ঞেস করতে পার।

(১) সেমতে আমি জিজ্ঞেস করলাম (প্রশ্নটি হযরত আলী মর্তুযা ও ইমামগণের ইমামগণের এলম সম্পর্কে ছিল।) ইমাম জাফর ছাদেক এ প্রশ্নের বিস্তারিত জওয়াব দিলেন। এর শেষাংশ এই ঃ—

وان عند نالجفر ومايدريهم ماالجفر؟ قال قلت وماالجفر؟ قال وعاءمن ادم فيه علم النبيين
والو صيين وعلم العلماء الذين مضوا من بنى اسرائيل

---

(১) রেওয়ায়েতের এ অংশ দ্বারা শিয়া মযহাবের পূর্ণস্বরূপ বুঝা যেতে পারে। ইমাম জাফর ছাদেক ইমাম বাকের প্রমুখ ইমামগণ থেকে শিয়া মযহাবের শিক্ষা রেওয়ায়েতকারী আবূ বছীর ও যুরারা প্রমুখরা নিজেদেরকে ইমাম জাফর ছাদেক ও ইমাম বাকেরের বিশেষ অন্তরঙ্গ বলে ব্যক্ত করত। তারা তাদের সম্প্রদায়ের বিশেষ লোকদেরকে বলত ঃ এই ইমামগণ আমাদেরকে শিয়া মযহাবের কথাবার্তা গোপনীয়তা সহকারে একান্তে বলতেন। এভাবে তারা যা চাইত, তাই এই ইমামগণের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে বলতে পারতো। তারা তাই করেছে। বাস্তব ঘটনা এই যে, শিয়া মযহাবের প্রকৃত স্বরূপ ব্যস এটাই। নতুবা আমাদের এবং উম্মতে মোহাম্মদীর অধিকাংশের মতে এই ইমামগণ আল্লাহর প্রিয় বান্দা এবং উচ্চস্তরের আলেম ও পরহেযগার ছিলেন। তাদের যাহের ও বাতেন এক ছিল। তারা সকলকে প্রকাশ্যে ধর্মশিক্ষা দিতেন। তাদের জীবনে নিফাকের নামগন্ধও ছিল না, যার নাম শিয়ারা "তাকায়উ্যহ" রেখেছে।

আমাদের কাছে আলজফর রয়েছে। মানুষ জানে না আলজফর কি ? আমি আরয করলামঃ আমাকে বলুন আলজফর কি ? ইমাম বললেনঃ এটা চামড়ার একটা থলে। এতে সকল নবী ও ওহীর এলম রয়েছে। বনী ইছরাঈলের মধ্যে যত আলেম পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে, তাদের এলেমও এতে রয়েছে। (ফলে এটা সকল অতীত নবী, ওছী ও ইসরাঈলী আলেমগণের এলেমের ভাণ্ডার।)

ثم قال وان عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام ومايدريهم مامصحف فاطمة قال فيه مثل قرانكم هذا ثلاث مرات والله مافيه من قرانكم حرف واحد

এরপর ইমাম বললেনঃ আমাদের কাছে "মছহাফে ফাতেমা" রয়েছে। মানুষ জানে না মছহাফে ফাতেমা কি ? ইমাম বললেনঃ এটা তোমাদের এই কোরআনের চেয়ে তিনগুণ বড়। আল্লাহর কসম, এতে তোমাদের কোরআনের একটি অক্ষরও নেই। (১৪৬ পৃঃ)

একটি জরুরী হুঁশিয়ারি

এখানে বিশেষভাব লক্ষণীয় যে, রেওয়ায়েতের বর্ণনাকারী আবূ বছীর ইমাম জাফর ছাদেকের যে জওয়াব ও বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, তাতে কোরআন পাককে দু'জায়গায় (তোমাদের কোরআন) বলা হয়েছে। আর মছহাফে ফাতেমা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সেটা তোমাদের কোরআনের তিনগুণ এবং এতে তোমাদের কোরআনের একটি অক্ষরও নেই। আমাদের মতে, এটা সেইসব মিথ্যা অপবাদের মধ্য থেকে একটি যা আবূ বছীর প্রমুখদের পক্ষ থেকে উছূলে কাফী ইত্যাদি শিয়া গ্রন্থাবলীর রেওয়ায়েতে থাকলে বায়ত ইমামগণ সম্পর্কে সম্ভবতঃ হাজারো সংখ্যায় করা হয়েছে। কোন ঈমানদার সম্পর্কে এরূপ কুধারণা করা যায় না যে, সে নিজেকে কোরআন থেকে আলাদা রেখে তাকে অন্যের কোরআন বলবে। হ্যাঁ, আমরা আর্য সমাজী ও খৃষ্টান বিতর্ককারীদেরকে দেখেছি যে, তারা মুসলমানদের সাথে এভাবে কথা বলে যে, তোমাদের কোরআনে এরূপ বলা হয়েছে এবং তোমাদের কোরআনে এটা আছে। আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস যে, হযরত ইমাম জাফর ছাদেক কখনও একথা বলেননি। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের রেওয়ায়েত তারাই গড়েছে, যারা শিয়া মযহাব রচনা করে ইমাম জাফর ছাদেক, ইমাম বাকের ও আহলে বায়তের অন্য বুযুর্গদের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করেছে। আমাদের মতে, এ রেওয়ায়েতের বর্ণনাকারী আবূ বছীর তাদেরই একজন। এ কাজে তার বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, আবূ বছীর, যুরারা প্রমুখ (যারা এ ধরনের রেওয়ায়েতসমূহের বর্ণনাকারী এবং আমাদের মতে শিয়া মযহাবের রচয়িতা) কুফায় বসবাস করতো এবং হযরত ইমাম বাকের ও ইমাম জাফর ছাদেক মদীনা মুনাওওরায় থাকতেন। তারা কুফা থেকে মাঝে মাঝে মদীনায় আসত এবং এখান থেকে ফিরে যেয়ে কুফায় বিশেষ লোকদের মধ্যে এই ইমামগণের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে এ ধরনের রেওয়ায়েত বর্ণনা করতো। এসব রেওয়ায়েতের উপরই শিয়া মযহাবের ভিত্তি স্থাপিত।

মছহাফে ফাতেমা কি?

পূর্বোক্ত রেওয়ায়েতে মছহাফে ফাতেমার উল্লেখ আছে। এ সম্পর্কে ইমাম জাফর ছাদেকেরই বিস্তারিত বর্ণনা উছূলে কাফীর এ অধ্যায়ের দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে উল্লেখিত হয়েছে। পাঠকবর্গ এটিও দেখে নিন। আবু বছীরেরই রেওয়ায়েত অনুযায়ী ইমাম জাফর ছাদেক মছজাফে ফাতেমা সম্পর্কে এক প্রশ্নের জওয়াবে বলেনঃ—

ان الله لما قبض نبيه عليه السلام ذخل فاطمة من الحزن مالا يعلمه الاالله عزوجل فارسل اليها ملكا يسلى غمها ويحد ثها فشكت ذلك الى امير المئو منين عليها السلام فقال اذا احست بذلك وسمعت الصوت قولى لى فاعلمته بذلك فجعل امير المؤمنين عليه السلام يكتب كلما سمع حتى اثبت من ذلك مصحفا—

আল্লাহ্তায়ালা যখন তাঁর নবী (সাঃ)-কে দুনিয়া থেকে তুলে নেন, তখন ফাতেমার এত দুঃখ হলো, যা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না। তখন আল্লাহ এক ফেরেশতাকে তার কাছে পাঠালেন দুঃখে তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে এবং তাঁর সাথে কথা বলার জন্যে। ফাতেমা আমীরুল মুমিনীনকে একথা জানালে তিনি বললেনঃ যখন তুমি এই ফেরেশতার আগমন অনুভব কর এবং তার আওয়াজ শুন, তখন আমাকে বল। অতঃপর ফেরেশতা আগমন করলে ফাতেমা তাকে জানালেন। অতঃপর আমীরুল মুমিনীন ফেরেশতার কাছে যা শুনতেন, তা লিখতে লাগলেন। অবশেষে তিনি এর দ্বারা একটি মছহাফ তৈরী করে নিলেন (এটাই মছহাফে ফাতেমা, ১৪৭ পৃঃ)।

পাঠকবর্গ প্রথম রেওয়ায়েত থেকে জানতে পেরেছেন যে, এই মছহাফে ফাতেমা কোরআন মজীদের তিনগুণ ছিল।

ইমামগণের সামনেও মানুষের দিবারাত্রির আমল পেশ হয়ঃ

উছূলে কাফীর একটি শিরোনাম হচ্ছে—

باب عرض الاعمال على النبى والائمة عليهم السلام

(বান্দার আমল রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও ইমামগণের সামনে পেশ হয়।)

এ অধ্যায়ের এক রেওয়ায়েতে আছে যে, ইমাম রেযা (আঃ)-এর কাছে তার এক বিশেষ লোক আবদুল্লাহ ইবনে আবান সাইয়াত আবেদন করলঃ ادع الله لى ولاهل بيتى فقال اولست افعل والله ان اعمالكم لتعرض على فى كليوم وليلة

আমার জন্যে এবং আমার পরিবার-পরিজনের জন্যে দোয়া করুন। তিনি বললেনঃ আমি দোয়া করি না। আল্লাহর কসম, প্রত্যেক দিনে ও রাত্রে তোমাদের আমলসমূহ আমার সামনে পেশ

করা হয় (মতলব এই যে, প্রত্যেক দিনে ও রাত্রে যখন তোমাদের আমল আমার সামনে আসে, তখন আমি দোয়া করি)।

এরপর রেওয়ায়েতে আছে যে, আবেদনকারী আবদুল্লাহ্ ইবনে আনাস একে অসাধারণ ব্যাপার মনে করলে ইমাম রেযা বললেনঃ তুমি কি কোরআনের এই আয়াত পাঠ করো না?—

فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُه وَالْمُؤ مِنُوْنَ (তোমাদের

আমল আল্লাহ্ দেখবেন এবং তাঁর রসূল ও মুমিনগণ দেখবেন।) এ আয়াতে "মুমিনগণ" বলে খোদার কসম আলী ইবনে আবী তালেবকে বুঝনো হয়েছে। (১৪৪ পৃঃ)

এর ব্যাখ্যায় আল্লামা কসভিনী লিখেনঃ ইমাম রেযা "মুমিনগণের" তফসীরে কেবল হযরত আলীর কথা বলেছেন। কেননা, তার দ্বারাই ইমামতের সিলসিলা চলে। নতুবা এর অর্থ তিনি এবং তার বংশে জন্মগ্রহণকারী সকল ইমাম। (ছাফী ১৪০ পৃঃ)

ইমামগণের কাছে ফেরেশতারা আসা-যাওয়া করেঃ

উছূলে কাফীর এক অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছেঃ

ان الائمة معدن العلم وشجرة النبوة و مختلف الملائكة

(ইমামগণ এলমের উৎস, নবুওয়তের বৃক্ষ এবং তাদের কাছে ফেরেশতারা যাতায়াত করে।) এ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম জাফর ছাদেক বলেনঃ

نحن شجرة النبوة و بيت الرحمة ومفا تيح الحكمة ومعدن العلم وموضع الرساله و مختلف الملائكة

"আমরা নবুওয়তের বৃক্ষ, রহমতের গৃহ, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার চাবি, এলমের ভাণ্ডার, রেসালতের স্থান এবং ফেরেশতাদের যাতায়াতের জায়গা"। (১৩৫ পৃঃ)

প্রত্যেক জুমুআর রাত্রিতে ইমামগণের মেরাজ হয়, তারা আরশ পর্যন্ত পৌঁছেন এবং সেখানে তারা অসংখ্য নতুন জ্ঞান ও প্রজ্ঞা প্রাপ্ত হনঃ

উছূলে কাফীতে ইমাম জাফর ছাদেক থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ

ان لنا فى ليالى الجمعة لشانامن الشان..... يوذن لارواح الانبياء الموتى عليهم السلام و ارواح الاوصياء الموتى وروح الوصى الذى بين اظهركم يعرج بهاالى السماء حتى توانى عرش ربها فتطوف به اسبوعا فتصلى عند كل قائمة من قوائم العرش ركعتين ثم ترد الى الابدان التى كانت فيها فتصبح الانبياء والاوصياء قدملؤا سرورا ويصبح الو صى الذى بين ظهرانيكم وقد زيدفى علمه مثل الجم الغفير

আমাদের জন্যে জুমুআর রাত্রিগুলাতে এক মহান শান হয়ে থাকে। ওফাতপ্রাপ্ত পয়গাম্বরগণের রুহ, ওফাতপ্রাপ্ত ওছীগণের রুহ এবং তোমাদের সামনে বিদ্যমান জীবিত ওছীর রুহকে অনুমতি দোয়া হয়। তাদেরকে আকাশে তুলে নেওয়া হয়। এমনকি, তারা সকলেই খোদায়ী আরশ পর্যন্ত পৌছে যায়। সেখানে পৌছে তারা আরশকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে। অতঃপর আরশের প্রত্যেক পায়ার কাছে দু'রাকাত নামায পড়ে। এরপর তাদের প্রত্যেক রুহকে সেই দেহে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, যেখানে পূর্বে ছিল। তারা আনন্দে ভরপুর অবস্থায় সকাল করে এবং তোমাদের মধ্যবর্তী ওছীর সকাল এমতাবস্থায় হয় যে, তার এলম বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। (১৫৫ পৃঃ)
এ রেওয়ায়েতের পরে এ বিষয়েরই আরও একাধিক রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে।

আল্লাহতায়ালা ফেরেশতা, নবী ও রসূলগণকে যে সকল এলম দান করেছেন, তা সমস্তই ইমামগণের অর্জিত হয়। এছাড়া এমন আরও এলম অর্জিত হয়, যা ফেরেশতা ও নবীগণকেও দান করা হয়নি ঃ

উছূলে কাফীতে শিরোনাম আছে—

ان الائمة عليهم السلام يعلمون جميع العلوم التى حرجت الى الملائكة والانبياء والرسل عليهم السلام •

(ইমামগণ সেই সকল এলমের আলেম হন, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতা, নবী ও রসূলগণকে দান করা হয়।) এ অধ্যায়ের হাদীস এই ঃ

عن ابى عبدالله السلام قال ان الله تبارك وتعالى علمين علما اظهر عليه ملائكته وانبياؤه ورسله فقد علمناه وعلما استاثرالله فاذابد أالله بشيئى منه اعلمناذلك وعرض على الائمة الذين كانوامن قبلنا

ইমাম জাফর ছাদেক থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহতায়ালার দু'প্রকার এলম আছে। এক প্রকার এলম সম্পর্কে তিনি ফেরেশতা, নবী ও রসূলগণকে অবহিত করেছেন। অতএব এ সম্পর্কে আমরাও অবহিত হয়েছি। দ্বিতীয় প্রকার এলম তিনি নিজের জন্যে নির্দিষ্ট রেখেছেন। (অর্থাৎ নবী, রসূল ও ফেরেশতাগণকেও এ সম্পর্কে অবহিত করেননি।) আল্লাহ যখন এই বিশেষ এলমের কোন কিছু শুরু করেন, তখন আমাদেরকে এ সম্পর্কে অবহিত করেন এবং আমাদের পূর্ববর্তী ইমামগণের সামনেও তা পেশ করেন। (১৫৬ পৃঃ)

ইমামগণের প্রতি প্রতিবছরের সবে কদরে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক কিতাব নাযিল হয়, যা ফেরেশতা ও "আররুহ" নিয়ে আসে ঃ

উছূলে কাফীতে ইমাম জাফর ছাদেক থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি কোরআনের আয়াত

يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ

এর তফসীর ও ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে,

وهل يمحى الاماكان ثابتا وهل يثبت الا ما لم يكن

কিতাবের সেই বিষয় মিটানো হয়, যা পূর্বে বিদ্যমান ছিল এবং সেই বস্তুই প্রতিষ্ঠিত করা হয়, যা পূর্বে ছিল না। (৮৫ পৃঃ)

এ কথার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আল্লামা কযভিনী লিখেনঃ

برائی هر سال کتاب علحده است مرادکتاب است که دران تفسیر احکام حوادث که محتاج الیه امام است تاسال دیگر نازل بان کتاب ملائکه وروح درشب قدربرامام زمان ٭

প্রতি বছরের জন্যে একটি আলাদা কিতাব থাকে। এর অর্থ সেই কিতাব যাতে পরবর্তী বছর পর্যন্ত' সমসাময়িক ইমামের প্রয়োজনীয় বিধানাবলীর তফসীর থাকে। এ কিতাব নিয়ে ফেরেশতারা এবং "আহরুহ" শবেকদরে সমসাময়িক ইমামের প্রতি অবতীর্ণ হয়। (২২৯ পৃঃ) প্রকাশ থাকে যে, শিয়াদের মতে, "আররুহ" অর্থ জিবরাঈল নন, বরং এটি এমন একটি মখলূক যে জিবরাঈল ও সকল ফেরেশতা অপেক্ষা মহান। (ব্যাখ্যাগ্রন্থ আছছাফীতে একথা পরিষ্কার লিখা আছে)

উছুলে কাফীতেই এর আরেকটি অধ্যায় আছে باب فى شان انانزلناهفى ليلة القدر।

এ অধ্যায়ে ইমাম বাকের থেকে বর্ণিত এক দীর্ঘ রেওয়ায়েতে তিনি বলেনঃ

ولقد قضى ان يكون فى كل ليلة يهبط فيها بتفسير الامورالى مثلهامن السنة المقبلة

আল্লাহর পক্ষ থেকে একথা স্থিরীকৃত যে, প্রতি বছর এক রাত্রে পরবর্তী বছরের এ রাত্রি পর্যন্ত সময়ের সকল ব্যাপারে ব্যাখ্যা ও তফসীর নাযিল করা হবে। (১৫৩ পৃঃ)

এ রেওয়ায়েতের মতলব ও সারমর্মও তাই যা আছছাফীর উপরোক্ত ব্যাখ্যা থেকে জানা গেছে, অর্থাৎ প্রত্যেক বছরের শবেকদরে এক কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে ইমামের প্রতি অবতীর্ণ হয়, যাতে পরবর্তী বছরের শবেকদর পর্যন্ত সময়ে সংঘটিতব্য ব্যাপার ও ঘটনাবলীর বিস্তারিত বর্ণনা থাকে।

ইমামগণ তাদের মৃত্যুর সময়ও জানেন এবং তাদের মৃত্যু তাদের ইচ্ছাধীন থাকেঃ

উছুলে কাফীতে এক অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে——

ان الائمة عليهم السلام يعلمون متى يموتون انهم لايموتون الاباختيار منهم

(ইমামগণ জানেন তাদের ওফাত কবে হবে এবং তাদের ওফাত তাদের ইচ্ছায় হয়। এ অধ্যায়ে ইমামগণ থেকে বর্ণিত সকল রেওয়ায়েতে সারমর্ম এক। তবে এর শেষ রেওয়ায়েতটি শিয়াদের জন্যে বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য। তাই এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

عن ابي جعفر عليه السلام قال انزل الله عزوجل النصر على الحسين عليه السلام حتى
كان بين السماء والارض ثم خير النصر ولقاء الله فاختار لقاءالله عزوجل

ইমাম বাকের থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহতায়ালা (কারবালায়) হুসাইন (আঃ)-এর জন্যে আকাশ থেকে সাহায্য (ফেরেশতাদের সৈন্যবাহী) প্রেরণ করেছিলেন, যা আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে এসে পড়েছিল। এরপর আল্লাহ্তায়ালা হুসায়ন (আঃ)কে ক্ষমতা দিলেন যে, তিনি খোদার সাহায্য (আসমানী ফওজ) কবুল করবেন এবং একে কাজে লাগাবেন, অথবা আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাত (অর্থাৎ শাহাদত ও ওফাত) পছন্দ করবেন। তিনি আল্লাহ্র সাক্ষাত (অর্থাৎ শাহাদত) পছন্দ করলেন। (১৫৯ পৃঃ)

এ রেওয়ায়েতের আলোকে শিয়াদের হযরত হুসাইনের শাহাদতের কারণে "হায় হুসাইন হায় হুসাইন" বলে কান্নার আচরণ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত।

ইমামগণের কাছে পূর্ববর্তী পয়গাম্বরগণের মোজেযাত ছিলঃ

উছূলে ফাকীতে একটি অধ্যায় আছে— باب ماعند الائمة من ايات الانبياء

অর্থাৎ পূর্ববর্তী পয়গাম্বরগণের যে সকল মোজেযা ইমামগণের কাছে ছিল।)

এ অধ্যায়ে প্রথম রেওয়ায়েত ইমাম বাকেরের। এর সারমর্ম এই যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর বিশেষ মোজেযা (কোরআনে যার উল্লেখ বার বার করা হয়েছে) লাঠি প্রকৃতপক্ষে হযরত আদম (আঃ)-এর ছিল। এটা হাত বদলের মাধ্যমে হযরত মূসা (আঃ) পর্যন্ত পৌছেছিল। এখন সেটা আমাদের হাতে রয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত সর্বশেষ ইমাম (মেহদী) পর্যন্ত পৌছবে। তখন এলাঠি সেই কাজ করবে, যা মূসা (আঃ)-এর যমানায় করত। (১৪১ পৃঃ)

অতঃপর এ অধ্যায়েই ইমাম বাকের বর্ণনা করেন যে, আমিরুল মুমিনীন (হযরত আলী মুর্তযা) এক রাত্রে এশার পর বাইরে বের হয়ে বললেনঃ

خرج عليكم الامام عليه قميص ادم وفى يده خاتم سليمان وعصاموسى

যমানার ইমাম বের হয়ে তোমাদের সামনে এসেছেন। তার গায়ে হযরত আদমের জামা, হাতে হযরত সোলায়মানের আংটি এবং মূসার লাঠি। (১৪২ পৃঃ)

ইমামগণ দুনিয়া ও আখেরাতের মালিক। তারা যাকে ইচ্ছা দেন ও ক্ষমা করেনঃ

উছূলে কাফীতে একটি অধ্যায় আছে— (অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবী ইমামের মালিকানাধীন।)

এ অধ্যায়ের এক রেওয়ায়েতে আবু বছীর বলেনঃ আমার এক প্রশ্নের জওয়াবে ইমাম জাফর ছাদেক বললেনঃ

اماعلمت ان الدنياوالاخرة للامام يصنعها حيث شاءويدفعها الى من يشاء

তুমি কি জান না যে, দুনিয়া ও আখেরাত সকলই ইমামের মালিকানাধীন? তিনি যাকে ইচ্ছা দেন এবং দান করেন। (২৫৯ পৃঃ)

ইমামত, নবুওয়ত ও উলুহিয়্যত (উপাস্যতা)ঃ

ইমাম ও ইমামত সম্পর্কে শিয়াদের প্রামান্যতম গ্রন্থাবলী থেকে এ পর্যন্ত যা উদ্বৃত করা হল, তা একথা জানা ও বুঝার জন্যে যথেষ্ট যে, ইছনা আশারী মযহাবের দৃষ্টিতে পয়গাম্বরগণের সকল বৈশিষ্ট্য, গুণাবলী ও মোজেযা ইমামগণের অর্জিত ছিল। তাদের মর্তবা পূর্ববর্তী সকল পয়গাম্বর, এমন কি, হযরত নূহ, হযরত ইবরাহীম, হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (আঃ)-এর ন্যায় উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পয়গাম্বরগণেরও উর্ধ্বে ছিল। তাদের মর্তবা খাতামুল আম্বিয়া সাইয়্যিদুনা মোহাম্মদ (সাঃ)-এর সম্পূর্ণ সমান ছিল। আরও আগে এই যে, তারা উপাস্যতা গুণেরও বাহক ছিলেন। তারা ভূত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জ্ঞানী। কোন বস্তু তাদের থেকে গোপন নয়। তাদের জন্যে কোন কিছু গায়ব তথা অদৃশ্য নয়। তাদের সম্পর্কে অনবধানতা, ভুল-ত্রুটি ও বিস্মৃতি কল্পনাও করা যায় না। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি কনার উপর তাদের সৃষ্টিগত রাজত্ব রয়েছে; অর্থাৎ আদেশের সাথে সৃষ্টি করার ক্ষমতা তাদের অর্জিত আছে। তারা দুনিয়া ও আখেরাতের মালিক। যাকে ইচ্ছা দেন এবং যাকে ইচ্ছা বঞ্চিত করেন।

এসব আকীদা নিয়ে চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, খৃষ্টবাদ ও শিয়াদের মধ্যে কতটুকু নৈকট্য ও মিল রয়েছে।

কোরআন মজীদে ইমামত ও ইমামগণের বর্ণনা

উছূলে কাফীর এক অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছেঃ

باب فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولاية

(উদ্দেশ্য এই যে, এ অধ্যায়ে ইমামগণের সেইসব রেওয়ায়েত ও বাণী লিপিবদ্ধ করা হবে, যেগুলোতে ইমামত ও ইমামগণের শান সম্পর্কে আল্লাহতায়ালার অবতীর্ণ কিতাব কোরআন মজীদের তত্ত্বাবলী বর্ণিত হয়েছে।) এ অধ্যায়টি অত্যন্ত দীর্ঘ। এতে প্রায় একশ' রেওয়ায়েত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রায় সবগুলো রেওয়ায়েতই পাঠকবর্গের সামনে পেশ করার যোগ্য। কিন্তু গ্রন্থের সীমিত পরিসরের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এখানে নমুনাস্বরূপ কয়েকটিই পেশ করব। আমাদের বিশ্বাস জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী সকল পাঠকই অনুভব করবেন যে, এ অধ্যায়ের প্রায় সকল রেওয়ায়েতই কোরআন মজীদের সাথে উপহাস বরং তার আত্মার উপর জুলুমের শিক্ষাপ্রদ দৃষ্টান্ত।

আল্লাহতায়ালা আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার কাছে যে আমানত পেশ করেছিলেন এবং যা বহন করতে তারা অস্বীকার করেছিল, সেটা ছিল ইমামতঃ

(১) সূরা আহযাবের ৭২ নং আয়াত—

اِنَّاعَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْاِ نْسَانُ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًاجَهُوْلًا

উছূলে কাফীতে ইমাত জা'ফর ছাদেক থেকে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, هى الولاية لامير المؤمنين عليه السلام অর্থাৎ আয়াতে "আমানত" বলে হযরত আলী মুর্তযার ইমামত বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহতায়ালা হযরত আলীর ইমামতের বিষয়টি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে পেশ করেছিলেন এবং তাদেরকে তা কবুল করতে বলেছিলেন। কিন্তু আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালা আমিরুল মুমিনীনের ইমামতের বিষয়টি কবুল করার মহাদায়িত্ব বহন করার সাহস করতে পারল না এবং তারা ভীত হয়ে অস্বীকার করল।

এর উপর কেবল এ মন্তব্যই করা যায় যে, আয়াতের অর্থ আমিরুল মুমিনীনের ইমামত করা এমন অর্থহীন ও বেখাপপা কথা, যেমন কোন কাদিয়ানী দাবী করে বসে যে, এর অর্থ মির্যা গোলাম আহমদের নবুওয়তের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। এ অধ্যায়ের সকল রেওয়ায়েতের একই অবস্থা। বাস্তবে যারা এসব রেওয়ায়েত এই ইমামগণের (অর্থাৎ হযরত ইমাম জাফর ছাদেক অথবা তার পিতা হযরত ইমাম বাকেরের) দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেছে, তারা তাদের জ্ঞানগত ও ধর্মগত মর্যাদাকে ভীষণভাবে আহত করেছে। এসব রেওয়ায়েতের উপরই শিয়াবাদের মৌলিক বিষয় ইমামতের ভিত্তি স্থাপিত।

কোরআন মজীদ নয়—ইমামত ঃ

(২) সূরা শোয়ারার শেষ রুকুর ১৯৩-১৯৪ নং আয়াত ঃ

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْاَمِيْنُ عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ بِلِسَانٍ عَرَبِىٍّ مُّبِيْنٍ

যে, রুহুল আমীন অর্থাৎ জিবরাঈল এ কোরআন নিয়ে যা সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জল আরবী ভাষায় রয়েছে—হে রসূল আপনার অন্তরে অবতীর্ণ হয়েছে (অর্থাৎ আপনার অন্তর পর্যন্ত পৌঁছিয়েছে), যাতে আপনি (কুপরিনাম সম্পর্কে) সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। কিন্তু উছূলে কাফীতে ইমাম বাকের থেকে রেওয়ায়েত আছে যে, তিনি এ আয়াতের উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

জিবরাঈল যে বিষয় নিয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অন্তরে নাযিল হয়েছিল তা ছিল আমিরুল মুমিনীন হযরত আলীর ইমামত। (২৬১ পৃঃ)

অর্থ এই হল যে, এ আয়াতটি কোরআন মজীদের সাথে নয়; বরং ইমামতের সাথে সম্পৃক্ত।

(৩) সূরা মায়েদার নবম রুকুর ৬৬ আয়াত ঃ

وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ......

আয়াতে ইহুদী ও খৃষ্টানদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, যদি তারা তওওরাত, ইঞ্জিল এবং সেই সর্বশেষ ওহী কোরআন মজীদের উপর যা তাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে তাদের জন্যে নাযিল করা হয়েছে—ঠিকঠিক আমল করত, তবে তাদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ রহমত ও বরকত নাযিল হত। কিন্তু উছূলে কাফীতে ইমাম বাকের থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি এ

আয়াতের তফসীরেও — الو لاية — বলেছেন। (২৬২ পৃঃ) উদ্দেশ্য এই যে, مَاأُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ এর অর্থ কোরআন মজীদ নয়—ইমামত।
আমাদের ধারণা এই যে, যে ব্যক্তি কোরআন পাক খুলে এসব আয়াতকে পূর্বাপর সম্পর্কের সাথে দেখবে ; সে বিস্মিত হবে যে, যারা ইমাম বাকেরের মত জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি সম্পর্কে এসব রেওয়ায়েত গড়েছে, তারা কত মূর্খ, কুবুদ্ধিসম্পন্ন ও অবুঝ ছিল!

কোরআনে "পাঞ্জতন পাক" ও সকল ইমামের নাম ছিল। এগুলো বের করে দেওয়া হয়েছে এবং পরিবর্তন করা হয়েছেঃ

(৪) সূরা তোয়াহার আয়াত ১১৫—

وَلَقَدْ عَهِدْنَا اِلٰى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِىَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا.......

আমি আদমকে প্রথমেই এক আদেশ দিয়েছিলাম (যে, এ বৃক্ষের কাছে যেয়ো না।) অতঃপর আদম তা ভুলে গেল।
এখন শুনুন উছূলে কাফীতে রেওয়ায়েত আছে যে, ইমাম জা'ফর ছাদেক কসম খেয়ে বলেছেনঃ এই পূর্ণ আয়াত এভাবে নাযিল হয়েছিল—

ولقد عهدنا الى ادم من قبل كلمات فى محمد وعلى وفاطمة و الحسن والحسين والائمة من ذريتهم فنسى......هكذا والله انزلت على محمد صلى الله عليه واله وسلم-

বাহ্যিক অর্থ এই যে, এই আয়াত আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি এভাবে নাযিল হয়েছিল যে, এতে এ সকল নাম ছিল। (অর্থাৎ, আমি আদমকে আলী, ফাতেমা, হাসান, হুসাইন এবং তাদের বংশে জন্মগ্রহণকারী ইমামগণ সম্পর্কে কিছু বিধান বলে দিয়েছিলাম।) কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ওফাতের পরে (শিয়া আকীদা অনুযায়ী) যারা জোরপূর্বক খলিফা হয়ে গিয়েছিল, তারা কোরআনে পরিবর্তন করেছে। তাদের অন্যতম পরিবর্তন এই যে, তারা সূরা তোয়াহার এই আয়াত থেকে পাঞ্জতনের নাম ও তাদের বংশে জন্মগ্রহণকারী ইমামগণের আলোচনা অপসারণ করে দেয়।
কোরআন পাকে এ ধরনের পরিবর্তনের কথা উছূলে কাফীর শত শত রেওয়ায়েতে উল্লেখ করা হয়েছে।

কোরআন পাকে এমনি ধরনের আরও একটি পরিবর্তনঃ

(৫) সূরা বাকারার শুরুতে আয়াত ২৩—

اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ

বলাবাহুল্য, এ আয়াতে ইসলাম ও কোরআন অস্বীকারকারীদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে এবং চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে যে, আমার বান্দা মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ এই কোরআনের ঐশী গ্রন্থ হওয়ার ব্যাপারে যদি তোমাদের কিছু সন্দেহ ও সংশয় থাকে, তবে এর অনুরূপ কেটি সূরাই (রচনা করে অথবা রচনা করিয়ে) নিয়ে এস।
কিন্তু উছূলে কাফী ইমাম বাকের থেকে রেওয়ায়েত করা হয়েছেঃ

نزل جبرئيل بهذه الاية على محمد صلى الله عليه واله وسلم هكذا ان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فى على فاتوا بسورة من مثله

জিবরাঈল মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি এ আয়াতটি এভাবে নিয়ে নাযিল হয়েছিল যে, এতে عَلىٰ عَبْدِنَا পরে এবং فَأْتُوْا এর পূর্বে فِىْ عَلِيٍ শব্দটি ছিল। (ফলে এ আয়াতে হযরত আলীর ইমামতের প্রসঙ্গ ছিল।)
রেওয়ায়েতের বাহ্যতঃ মতলব এটাই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ওফাতের পরে যারা অন্যায়ভাবে ক্ষমতা লাভ করেছিল, তারা এ আয়াত থেকে শব্দটি ফেলে দিয়েছে এবং এ পরিবর্তন করেছে।
(৬) সূরা রূমের আয়াত ৩০— فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا এর পরিষ্কার অর্থ এই যে, চতুর্দিক থেকে একাগ্র হয়ে তোমার মুখ করে নাও ইসলামের অনুসরণ এবং আল্লাহর আনুগত্যের দিকে। কিন্তু উছূলে কাফীতে ইমাম বাকের এ আয়াত সম্পর্কে বলেনঃ هيالولاية অর্থাৎ, এর অর্থ বেলায়েত ও ইমামত। (অর্থাৎ আয়াতে একে মেনে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।)

নাউযুবিল্লাহ! হযরত আলীর ইমামত না মানার কারণে খলিফাত্রয় ও সাধারণ ছাহাবায়ে কেরাম নিশ্চিতই কাফের ও ধর্মত্যাগীঃ

(৭) সূরা নিসার আয়াত ১৩৭—

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْاثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْاثُمَّ ازْدَادُوْاكُفْرًا لَّمْ يَكُنِ الله لِيَغْفِرَ لَهُمْ . . . .

যারা বাহ্যতঃ ইসলাম কবুল করে, কিন্তু এরপর মুখ ফিরিয়ে কুফরের পথ বেছে নেয়, এরপর পুনরায় ঈমান প্রকাশ করে এবং এরপর আবার কুফরের দিকে ফিরে যায় এবং কুফরের মধ্যেই সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকে, আয়াতে এহেন হতভাগাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ কখনও তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। বলা বাহুল্য, এতে এমন মুনাফিকদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, যারা তাদের পার্থিব স্বার্থের তাগিদে কখনও মুসলমানদের মধ্যে শামিল হয়ে যেত এবং কখনও কাফেরদের সাথে হাত মিলাত। কিন্তু উছূলে কাফীতে ইমাম জাফর ছাদেক থেকে রেওয়ায়েত আছে যে, তিনি এ আয়াত সম্পর্কে বলেছেন—(রেওয়াতটি পাঠ করার পূর্বে পাঠকবর্গ মনে রাখুন যে, শিয়া রেওয়ায়েতসমূহে যেখানে যেখানে
(অমুক ও অমুক) শব্দ আসে, সেখানে অর্থ হযরত আবুবকর ছিদ্দীক ও ওমর ফারুক (রাঃ)

হয়ে থাকে। আর যেখানে এ শব্দটি তিনবার আসে, সেখানে তৃতীয় হযরত ওছমান (রাঃ) অর্থ হয়। এখন রেওয়ায়েতটি দেখুন।)

نزلت فى فلان وفلان وفلان امنوا بالنبى صلى الله عليه وسلم فى اول الامروكفروا حيث عرضت عليهم الولاية حين قال النبى صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فهذا على مولاه ثم امنوا بالبيعة لامير المؤ منين عليه السلام ثم كفرواحيث مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقروا بالبيعة ثم ازدادواكفراباخذهم من بايعه بالبيعة لهم فهؤلاء لم يبق فيهم من الايمان شئى

এ আয়াতটি অমুক, অমুক ও অমুক (অর্থাৎ আবুবকর, ওমর ও ওছমান) সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তারা তিনজনই শুরুতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। এরপর যখন তাদের সামনে হযরত আলীর ইমামত পেশ করা হল এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন যে, مولاه فهذاعلى مولاه তখন তারা তা অস্বীকার করে কাফের হয়ে গেল। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কথায় তারা আমিরুল মুমিনীনের বয়াত করে নিল এবং পুনরায় ঈমান আনল। এরপর যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাত হয়ে গেল, তখন তারা আবার বয়াত অস্বীকার করে কাফের হয়ে গেল এবং কুফরে আরও অগ্রসর হল। তারা যখন সেইসব লোকের কাছ থেকেও নিজেদের খেলাফতের বয়াত নিয়ে নিল, যারা হযরত আলীর হাতে বয়াত করেছিল, তখন তাদের সকলের অবস্থা এই দাঁড়াল যে, তাদের মধ্যে বিন্দুমাত্রও ঈমান বাকী রইল না। (অর্থাৎ, নিশ্চিতই কাফের হয়ে গেল।) (২৬৫ পৃঃ)

(৮) সূরা মোহাম্মদের আয়াত ২৫—

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوْا عَلَى اَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى

এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে উছুলে কাফীতেই উপরোক্ত রেওয়ায়েতের পর ইমাম জাফর ছাদেক থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতে তিনি বলেন ঃ এ আয়াতে যাদের কাফের ও ধর্মত্যাগী হওয়ার কথা বলা হয়েছে, তারা

فلان وفلان وفلان ارتدوا عن الايمان فى ترك ولاية امير المؤمنين عليه السلام

অমুক, অমুক এবং অমুক (অর্থাৎ খলিফাত্রয়)। তারা তিনজনই আমিরুল মুমিনীন (আঃ)-এর বেলায়েত ও ইমামত বর্জন করার কারণে ঈমান ও ইসলামত্যাগী হয়ে গেছে। (২৬৫ পৃঃ)

"ঈমান" অর্থ আমিরুল মুমিনীন আলী, "কুফর" অর্থ আবুবকর "ফিসক" (পাপাচার) অর্থ ওমর এবং "ইছয়ান" (অবাধ্যতা) অর্থ ওছমান (নাউযুবিল্লাহ) ঃ

(৯) সূরা হুজুরাতের আয়াত ৭—

وَلٰكِنَّ اللهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَا نَ وَزَيَّنَه فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ اُولٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُوْنَ

এ আয়াতের পরিষ্কার ও সোজা অর্থ এই যে, হে মোহাম্মদের সহচরগণ, তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামত এই যে, তিনি ঈমানের মহব্বত তোমাদের অন্তরে সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তোমাদের অন্তরকে ঈমানের সৌন্দর্য দ্বারা শোভিত করে দিয়েছেন এবং কুফর, পাপাচার ও অবাধ্যতার প্রতি ঘৃণা তোমাদের মধ্যে জাগরুক করে দিয়েছেন। তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত। এখন উছুলে কাফীর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ইমাম জাফর ছাদেক এ আয়াতের তফসীর ও ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কি বলেছেন, তাই শুনুনঃ—

قوله حبب اليكم الايمان وزينه فى قلوبكم يعنى امير المؤمنين عليه السلام وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان الاول والثانى والثالث

حبب الكم الايمان এ ঈমান অর্থ আমিরুল মুমিনীন (আঃ)-এর পবিত্র সত্তা। كرهاليكم الكفر والفسوق والعصيان এ কুফর অর্থ প্রথম খলিফা (আবুবকর), ফুসূক অর্থ দ্বিতীয় খলিফা (ওমর) এবং ইছয়ান অর্থ তৃতীয় খলিফা (ওছমান)। (২৬৯ পৃঃ)
নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালা যাদেরকে জ্ঞানবুদ্ধি এবং ঈমানের নূর থেকে বঞ্চিত করেননি, তারা এসব রেওয়ায়েতের কারণে হযরত ইমাম জাফর ছাদেক, হযরত ইমাম বাকের প্রমুখ আহলে বায়তের বুযুর্গগণের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হবে না। বরং তারা এসব রেওয়ায়েতকে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর দুশমনদের চক্রান্তেরই অংশ মনে করবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ এসব রেওয়ায়েতের উপরই শিয়া মযহাবের ভিত্তি স্থাপিত।

যারা আমিরুল মুমিনীনের ইমামত মানে না, তারা জাহান্নামীঃ

(১০) সূরা বাকারার আয়াত ৮১—

بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِه خَطِيْئَتُه فَاُولٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ

এর সোজা অর্থ এই যে, যারা কুকর্মই উপার্জন করে, দুশ্চরিত্রতাকেই সম্বল করে নেয় এবং দুষ্কর্ম যাদেরকে ঘিরে ফেলে (এটা কাফের ও মুশরিকদের অবস্থা), তারা জাহান্নামী, তারা অনন্তকাল জাহান্নামে থাকবে। কিন্তু উছূলে কাফীতে ইমাম জাফর ছাদেক থেকে এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে যে,

بلى من كسب سيئة واحاطت به خطيئته قال اذا جحدامامة اميرالمؤمنين فاولٰئك اصحاب النار هم فيها خالدون

অর্থাৎ, আয়াতের মতলব এই যে, যারা আমিরুল মুমিনীনের ইমামত অস্বীকার করবে, তারা জাহান্নামী হবে এবং অনন্তকাল জাহান্নামে থাকবে। (২৭০ পৃঃ) (লক্ষণীয় যে, এখানে ইমামত অর্থ শিয়াদের পারিভাষিক ইমামত, যার অর্থ পাঠকবর্গের অজানা নেই।)
উছূলে কাফীর এ অধ্যায়ে এ ধরনের বহু রেওয়ায়েত রয়েছে। নমুনার জন্যে এ দশটিই যথেষ্ট।

নবী যেমন আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত হন, তেমনি আমিরুল মুমিনীন (আলী) থেকে নিয়ে বার জন ইমাম কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত হয়েছেন। স্বয়ং ইমামেরও ক্ষমতা নেই যে, তিনি পরবর্তী ইমাম ও স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করবেনঃ

উছূলে কাফীতে একটি অধ্যায়—

باب ان الامامة عهد من الله عزوجل معهودمن واحدالى واحد عليهم السلام

(অর্থ এই যে, ইমামত আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি অঙ্গীকার, যা এক ইমাম থেকে অন্য ইমামের দিকে স্থানান্তরিত হয়।) এ অধ্যায়ের এক রেওয়ায়েতে ইমাম জাফর ছাদেক বলেনঃ

ان الامامة عهد من الله عزوجل معهود لرجال مسمين عليهم السلام ليس للامام ان يزويها عن الذى يكون من بعده

ইমামত আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট লোকদের জন্যে একটি অঙ্গীকার। ইমামেরও অধিকার নেই যে, সে তার পরবর্তী সময়ের জন্যে মনোনীত ইমাম ছাড়া অন্যের কাছে ইমামত হস্তান্তর করবে। (১৭০ পৃঃ)
এছাড়া এ অধ্যায়েরই এক রেওয়ায়েতে ইমাম জাফর ছাদেকের উক্তি বর্ণিত আছে। তিনি তার বিশেষ সহচরদেরকে বলেনঃ

اتدرون الموصى منا يوصى الى من يريد؟ لاوالله ولكن عهد من الله ورسوله صلى الله عليه واله لرجل فرجل حتى ينتهى الامر الى صاحبه

তোমরা কি মনে কর, আমাদের মধ্যে ওছিয়্যতকারী ইমাম তার পরবর্তী সময়ের জন্যে যাকে ইচ্ছা ইমাম বানিয়ে দেবে? আল্লাহর কসম, এরূপ নয়। বরং এঁটা আল্লাহ ও তার রসূলের পক্ষ থেকে একটি অঙ্গীকার একের পর এক নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের জন্যে। অবশেষে এটা খতম হবে শেষ যমানার ইমাম (অর্থাৎ, অন্তর্হিত ইমাম) পর্যন্ত পৌঁছে। (১৭০ পৃঃ)
এ অধ্যায়ে এ বিষয়ে একাধিক রেওয়ায়েতের সারমর্ম একই। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পরে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বারজন ইমাম মনোনীত হয়ে

গেছে। তাদের মনোনয়ন ও নিযুক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়েছে; যেমন তিনি নবী ও রসূলগণকে নিযুক্ত করেছেন। এতে কোন মানুষের মতামত ও ক্ষমতার দখল থাকে না।

প্রত্যেক ইমামের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি মোহর আঁটা খাম রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি নাযিল হয়েছিল, যাতে সেই ইমামের জন্যে নির্দেশাবলী ছিল। প্রত্যেক ইমাম তা মোহর আঁটা অবস্থায় পেয়েছেঃ

উছুলে কাফীতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ইমামগণের মনোনয়ন এবং বিশেষ নির্দেশ ও ওছিয়্যত প্রসঙ্গে ইমাম জাফর ছাদেক থেকে একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। সম্পূর্ণ রেওয়ায়েতটি ১৭১, ১৭২ পৃষ্ঠাব্যাপী। এখানে এর কেবল সারমর্মই পাঠকবর্গকে উৎসর্গ করা হচ্ছে।

ইমাম জাফর ছাদেক বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি জিবরাঈলের মাধ্যমে আকাশ থেকে ইমামত ও ইমামগণ সম্পর্কে নির্দেশনামা মোহর আঁটা কিতাবের আকারে নাযিল হয়েছিল। এটি ছাড়া কোন বস্তু মোহর আঁটা অবস্থায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি নাযিল হয়নি। এতে প্রত্যেক ইমামের জন্যে আলাদা আলাদা মোহর আঁটা খাম ছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সেগুলো হযরত আলীর হাতে সমর্পণ করেন। হযরত আলী কেবল নিজের নামের খামটির মোহর ভেঙ্গে তাঁর সম্পর্কিত নির্দেশনামা পাঠ করেন। এরপর প্রত্যেক ইমাম এমনিভাবে তার নামের মোহর আঁটা খাম পেয়েছে এবং সে-ই নিজের খামের মোহর ভেঙ্গে তা পাঠ করত। সর্বশেষ খাম এমনিভাবে দ্বাদশ ইমাম মেহদী (অন্তর্হিত ইমাম) পাবে।

মূল রেওয়ায়েতটি খুব দীর্ঘ। গোটা রেওয়ায়েত ও তার অনুবাদ লিখা হলে ৫/৬ পৃষ্ঠা লেগে যেত। তাই এর সারসংক্ষেপই লিখা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বার ইমামের মনোনয়ন এবং আকাশ থেকে অবতীর্ণ একটি আশ্চর্যজনক ফলকের কিস্সাঃ

উছুলে কাফীর একটি অধ্যায়— باب ماجاءفى الاثنى عشروالنص عليهم

এ অধ্যায়ে বর্ণিত রেওয়ায়েতসমূহে বার ইমামের নামের সাথে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাদের ইমামতের মনোনয়ন পরিষ্কার ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে। এ অধ্যায়ের এক রেওয়ায়েতে আকাশ থেকে অবতীর্ণ সবুজ রঙের একটি ফলকের অদ্ভূত কিসসা বর্ণনা করা হয়েছে, যার উপর নূরানী অক্ষরে ক্রমিক অনুসারে বার ইমামের নাম তাদের বিস্তারিত পরিচিতসহ লিপিবদ্ধ ছিল। এ রেওয়ায়েতটিও অনেক দীর্ঘ। তাই এরও কেবল সারসংক্ষেপই পাঠকবর্গের সামনে উপস্থিত করা হচ্ছে।

আবূ বছীর ইমাম জাফর ছাদেক থেকে বর্ণনা করেন— আমার পিতা (ইমাম বাকের) জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনছারী (ছাহাবী)কে বললেনঃ আপনার সাথে আমার একটি বিশেষ কাজ আছে।। তাই একান্তে আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই এবং একটি ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস

করতে চাই। জাবের বললেনঃ আপনি যখন ইচ্ছা করেন, আসতে পারেন। সেমতে একদিন আমার পিতা তার কাছে গেলেন এবং বললেনঃ আমাকে সেই ফলক সম্পর্কে বলুন, যা আপনি আমাদের (পরদাদী) আম্মা হযরত ফাতেমা বিনতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর হাতে দেখেছিলেন। এ ফলক সম্পর্কে তিনি আপনাকে যা বলেছিলেন এবং তাতে যা লিখা ছিল, তাও বলুন। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বললেনঃ আমি আল্লাহকে সাক্ষী করে এ ঘটনা বর্ণনা করছি যে, আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর জীবদ্দশায় আপনার (পরদাদী) আম্মা হযরত ফাতেমার কাছে তার পুত্র হুসায়নের জন্ম উপলক্ষে মোবারকবাদ দিতে গিয়েছিলাম। আমি তার হাতে একটি সবুজ রঙের ফলক দেখলাম। আমি ধারণা করলাম যে, সেটি পান্নার এবং তাতে সূর্যের ন্যায় চকচকে সাদা রঙে কিছু লিখা রয়েছে। আমি তাকে বললামঃ হে রসূল তনয়া, আমার মিতামাতা আপনার জন্যে উৎসর্গ হোক— আমাকে বলুন এ ফলকটি কি এবং কেমন? তিনি বললেনঃ এ ফলক আল্লাহ তাআলা তাঁর রসূলের কাছে প্রেরণ করেছেন। এতে আমার আব্বাজান (রসূলুল্লাহ্ সাঃ), আমার স্বামী (আলী), আমার উভয় পুত্র (হাসান-হুসায়ন) এবং আমার আওলাদের মধ্যে আরও যারা ঈমাম হবে, তাদের সকলের নাম রয়েছে। আব্বাজান আমাকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্যে এই ফলক আমাকে দান করেছেন।

এরপরে জাবের (ইমাম বাকের থেকে) বর্ণনা করেনঃ এরপর আপনার (পরদাদী) আম্মা দেখার জন্যে ফলকটি আমাকে দিলেন। আমি তা পড়লাম এবং যা কিছু তাতে লিখিত ছিল, তা নকল করে নিজের কাছে রেখে দিলাম। (এ ঘটনা বর্ণনা করার পর ইমাম জাফর ছাদেক বলেনঃ) আমার পিতা (ইমাম বাকের) জাবেরকে বললেনঃ আপনি সেই নকল আমাকে দেখাতে পারেন? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, আপনি দেখতে পারেন। সমতে আমার পিতা জাবেরের সাথে তার গৃহে গেলেন। তিনি একটি লিখিত পাতলা চামড়ার পত্র বের করলেন। আমার পিতা বললেনঃ আপনি আপনার লেখা দেখুন। আমি আপনাকে পড়ে শুনাচ্ছি (যা ফলকে লিখা ছিল) সেমতে আমার পিতা পাঠ করে শুনালেন। জাবের যা লিখেছিলেন, তার সাথে এর এক অক্ষরেরও অমিল ছিল না। জাবের বললেনঃ আমি আল্লাহকে সাক্ষী করে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি সেই ফলকে সম্পূর্ণ এমনিভাবে লিখিত দেখেছিলাম। (৩৪৩ পৃষ্ঠা)।

এরপরে রেওয়ায়েতে সেই ফলকের গোটা বিষয়বস্তু উদ্ধৃত করা হয়েছে, যা উছূলে কাফীর পূর্ণ এক পৃষ্ঠা ব্যাপী। এতে হযরত আলী থেকে দ্বাদশতম ইমাম (অন্তর্হিত ইমাম) পর্যন্ত সকলের নাম বিস্তারিত পরিচিতিসহ উল্লেখিত হয়েছে। (৩৪৪ পৃঃ)

হযরত আলী হযরত আবূ বকরের খেলাফতকালে একদিন তার হাত ধরে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দেন। তিনি আবূ বকরকে আলী ও তার সন্তানদের মধ্য থেকে এগারজন ইমামের প্রতি ঈমান আনার এবং তার খেলাফত সম্পর্কে যা কিছু করেছেন, তা থেকে তওবা করার নির্দেশ দেনঃ

উছূলে কাফীর উপরোক্ত অধ্যায়ের আরও একটি অদ্ভূত ও অত্যাশ্চর্য রেওয়ায়েত পাঠ করে নিনঃ

ان امير المؤمنين عليه السلام قال لابى بكريوما لاَتَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْافِىْ سَبِيْلِ الله اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ٠واشهدان رسول الله صلى الله عليه واله مات شهيدا وانه ليأتينك فايقن اذاجاءك فان الشيطان غير متخيل بهفاخذ على بيد ابى بكر فاراه النبى(ص)فقال يا ابابكر اٰمن بعلى و باحد عشرمن ولده انهم مثلى الاالنبوة وتب الى الله مما بيدك وانه لاحق لك فيه ثم ذهب فلم يرىٰ ۔

আমিরুল মুমিনীন (হযরত আলী) একদিন আবূ বকরকে বললেনঃ কোরআন পাকে বলা হয়েছেঃ "যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয় তাদেরকে মৃত মনে করো না; বরং তারা তাদের প্রতিপালকের কাছে জীবিত। সেখানে তারা অদৃশ্য জগতের রিযিক পায়"।
আমি সাক্ষ্য দিই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আল্লাহর পথে শহীদ হয়েছেন। আল্লাহর কসম, তিনি আপনার সম্মুখে আসবেন। তিনি যখন আসেন, তখন বিশ্বাস করবেন যে, তিনিই। কেননা, শয়তান তার আকৃতিতে কারও কল্পনায় আসতে পারে না। অতঃপর আলী অবূ বকরের হাত ধরলেন এবং তাকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)কে দেখালেন। তিনি বললেনঃ হে আবূ বকর, আলীর প্রতি ঈমান আন এবং তার বংশধরের মধ্যে এগারজনের প্রতি ঈমান আন। নবুওয়ত ছাড়া সকল বিষয়ে তারা সকলেই আমার মত। হে আবূ বকর, তুমি যে খেলাফত অধিকার করে বসে আছ, আল্লাহর দরবারে তার জন্যে তওবা কর। এতে তোমার কোন হক নেই। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একথা বলে চলে গেলেন। অতঃপর দৃষ্টিগোচর হলেন না। (৩৪৮ পৃষ্ঠা)।

অন্তর্হিত ইমাম শিয়া আকীদায় একটি তেলেসমাতী উপাখ্যান

আমিরুল মুমিনীন হযরত আলী থেকে দ্বাদশতম ইমাম পর্যন্ত শিয়াদের বারজন ইমামের আল্লাহর পক্ষ থেকে পয়গাম্বরগণের ন্যায় মনোনয়ন, তাদের মর্যাদা ও মর্তবা এবং তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের জোর নির্দেশ সম্পর্কে মেসকল রেওয়ায়েত এ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, আশা করা যায় যে, এ সম্পর্কে শিয়াদের অধিষ্ঠান ও আকীদা হৃদয়ঙ্গম করার জন্যে এগুলো যথেষ্ট হবে। কিন্তু এই আলোচ্য বিষয় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি শেষ যমানার ইমাম (অন্তর্হিত ইমাম)-এর জন্ম ও তার অন্তর্ধান সম্পর্কে শিয়াদের আকীদা বর্ণনা না করা হয়, যা নিশ্চিতই পৃথিবীর আশ্চর্যতম বিয়সমূহের অন্যতম। এ বিষয়টি এমন নাতিদীর্ঘ যে, যদি শিয়াদের গ্রন্থাবলী সামনে রেখে এগুলোতে যা লিখিত আছে, কেবল, তাই উদ্ধৃত করা হয়, তবে একটি বিরাটকায়

পুস্তক তৈরী হতে পারে। কিন্তু এখানে আমরা কেবল তাই লিখব, যে সম্পর্কে আমাদের পাঠকবর্গকে অবহিত করার জন্যে আমরা জরুরী মনে করব।

দ্বাদশতম অন্তর্হিত ইমামের অভূতপূর্ব জন্মকাহিনী। পরিবারের লোকদের তার জন্ম সম্পর্কে অস্বীকৃতি ঃ

ইছনা আশারী শিয়াদের মতে যে বারজন ইমাম আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মনোনীত এবং যাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অত্যাবশ্যক ও মুক্তির শর্ত, তাদের একাদশতম ইমাম হলেন হাসান আসকারী ইবনে আলী। উছূলে কাফীর বর্ণনা অনুযায়ী ইনি রমযান ২৩২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রায় আটাশ বছর বয়স পেয়ে রবিউল আউয়াল ২৬০ হিজরীতে পরলোকগমন করেন। (৩১৪ পৃঃ)

তার সহোদর ভাই জাফর ইবনে আলী এবং পরিবারের অন্য লোকদের বর্ণনা এই যে, হাসান আসকারী নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। সরকারী অনুসন্ধান ও তদন্তের পরও তাই প্রমাণিত হয়। এরই ভিত্তিতে তার ত্যাজ্যসম্পত্তি শরীয়তের আইন অনুযায়ী তার ভ্রাতা ও অন্যান্য জীবিত ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করা হয়। উছূলে কাফীরই রেওয়ায়েতে এ তথ্য বর্ণিত হয়েছে। (৩০৯ পৃঃ)

ইছনা আশারী শিয়াদের আরও বিশ্বাস যে, তৃতীয় ইমাম হুসায়নের পরে ইমামের পুত্রই ইমাম হয়। উছূলে কাফীতে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় আছে—باب اثبات الامامة فى الاعقاب (১৭৫ পৃঃ) এতে ইমামগণের একাধিক রেওয়ায়েতের সারমর্ম এই যে, ইমামের পুত্রই ইমাম হয়—অন্য কোন নিকট আত্মীয়ও হতে পারে না। এসব রেওয়ায়েতের উপরই এ আকীদার ভিত্তি। এ আকীদার কারণে শিয়া জনগণের সামনে এই সমস্যা দেখা দেয় যে, একাদশতম ইমাম হাসান আসকারীর পরে ইমামত কিরূপে চালু থাকবে এবং দ্বাদশতম ও সর্বশেষ ইমাম কাকে সাব্যস্ত করা হবে? এ সমস্যার সমাধানকল্পে দাবী করা হয়েছে এবং খ্যাত করা হয়েছে যে, ইমাম হাসান আসকারীর ওফাতের চার অথবা পাঁচ বছর পূর্বে (এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী ২৫৫ হিজরীতে এবং অপর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী ২৫৬ হিজরীতে) তার এক পুত্র তার জনৈকা বাঁদীর গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যাকে সাধারণের দৃষ্টি থেকে গোপন রাখা হত। ফলে তাকে কেউ দেখতে পেতনা। (১) এই পুত্র তার পিতা হাসান আসকারীর ওফাতের মাত্র দশ দিন পূর্বে অন্তর্হিত হয়ে যায়। যে সকল বস্তু ও সাজসরঞ্জাম হযরত আলী থেকে হস্তান্তর হয়ে প্রত্যেক ইমামের কাছে থাকত এবং সবশেষে ইমাম হাসান আসকারীর কাছে ছিল, (যেমন হযরত আলীর সংকলিত ও লিখিত আসল ও পূর্ণাঙ্গ কোরআন, তওরাত, ইঞ্জিল, যবুর ইত্যাদি প্রাচীন ঐশীসমূহ, অন্যান্য পয়গাম্বরের ছহিফা আসল আকৃতিতে, মছহাফে ফাতেমা, আল জফর ও আলজামেয়ার থলি, পূর্ববর্তী পয়গাম্বরগণের মোজেযা মূসা (আঃ)-এর লাঠি, আদম (আঃ)-এর জামা এবং সোলায়মান (আঃ)এর আংটি ইত্যাদি। এ সম্পর্কে পাঠকবর্গ বিস্তারিত রেওয়ায়েত ইতিপূর্বে দেখেছেন)। সবগুলো শিয়া রেওয়ায়েত অনুযায়ী এই চার অথবা পাঁচ বছরের বালক একাকী সঙ্গে নিয়ে অন্তর্হিত হয়ে গেল এবং তার শহর

"সুররামানরায়ারই" এক গুহায় আত্মগোপন করল।

শিয়াদের আকীদা যে, ইমাম হাসান আসকারীর এ পুত্রই শেষ যমনার ইমাম। তার উপর ইমামত খতম হয়ে গেছে। যতদিন এ পৃথিবী থাকবে, ততদিন একজন নিষ্পাপ ইমামও পৃথিবীতে থাকবেন—এটা জরুরী বিধায় এই যে যমানার ইমাম কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকবেন এবং এমনিভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপন করে থাকবেন। তার আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত সময় এলে তিনি গুহা থেকে বের হবেন। তখন সমগ্র পৃথিবীতে তারই রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এটা হবে, ওটা হবে।

এ ইমামের জন্ম, অন্তর্ধান ও আত্মগোপন সম্পর্কিত রেওয়ায়েত উছূলে কাফীর একাধিক অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে—এক অধ্যায় باب الاشارة الى صاحب الدارعليه السلام অপর অধ্যায় باب تسمية من راه এবং এর পরে রয়েছে باب مولدصاحب الزمان عليه السلام যথাক্রমে ২০২—২০৭ পৃঃ এবং ৩৩৩—৩৪২ পৃঃ

আমরা মনে করি, আল্লাহতায়ালা যাকে সামান্যও জ্ঞান ও অন্তদৃষ্টি দান করেছেন, এসব রেওয়ায়েত অধ্যয়ন করে তার ধারণা এটাই হবে যে, একটি "মোকাদ্দমা" (কেস) তৈরী করা হয়েছে; কিন্তু উত্তম তৈরী করা গেল না এবং বাহ্যতঃ ইমাম হাসান আসকারীর ভ্রাতা জাফর ইবনে আলী এবং পরিবারের অন্যদের বর্ণনাই বিশুদ্ধ ও যুক্তিসিদ্ধ যে, হাসান আসকারী নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগমণ করেছেন।

মোটকথা, উভয় বিষয়ের মধ্যে কোনটি বিশুদ্ধ ও যুক্তিসঙ্গত, তা নির্ণয় করা এক্ষনে আমাদের কাজ নয়। এখানে আমাদের উদ্দেশ্য কেবল দ্বাদশতম ইমাম সম্পর্কে শিয়া ইছনা আশারীদের আকীদা বর্ণনা করা, যা স্বস্থানে চমকপ্রদ, অভূতপূর্ব এবং সকল মন্তব্যের উর্ধ্বে। প্রথমে তার শ্রদ্ধেয়া জননীর কিস্সা জেনে নিন, যা শিয়া গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত হয়েছে। তার নাম মুলায়কা এবং তাকে রোম সম্রাটের পৌত্রী বলা হয়েছে। অপর নাম নার্গিসও রেওয়ায়েতসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে।

অন্তর্হিত ইমামের জননীর বিস্ময়কর কাহিনীঃ

আল্লামা মজলিসী جلاءالعيون ও حق اليقين গ্রন্থে দ্বাদশতম অন্তর্হিত ইমামের শ্রদ্ধেয়া জননীর বিস্ময়করু কাহিনী (যা ইশ্ক ও মহব্বতের ও অদ্বিতীয় কাহিনী) ইবনে বাবওয়াইহি ও শায়খ তূসীর বরাত দিয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন এবং লিখেছিন যে, এই উভয় ব্যক্তি (যারা শিয়া মযহাবের অন্যতম স্তম্ভ) নির্ভরযোগ্য সনদ দ্বারা বিশর ইবনে সোলায়মান থেকে এ কাহিনী রেওয়ায়েত করেছেন। উভয় গ্রন্থে ঘটনার বর্ণিত রেওয়ায়েত খুবই দীর্ঘ। এখানে তার সংক্ষিপ্তসার পাঠকবর্গকে উৎসর্গ করা হচ্ছে।

---

(১) উছূলে কাফীতে দশম ইমাম আলী রেযা থেকে এ বিষয়ের একাধিক রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। তিনি দ্বাদশ ইমাম সম্পর্কে বলেছেন— انكم لاترون شخصه তোমরা তাকে দেখতে পাবে না। আরেক রেওয়ায়েতে বলেছেন— لايرى جسمه অর্থাৎ সে দৃষ্টিগোচর হবে না। (২০৭ পৃঃ)

রেওয়ায়েতের সারসংক্ষেপ এই যে, ইমাম হাসান আসকারীর শহর "সুররামানরায়ায়" তার প্রতিবেশী এক ব্যক্তি ছিল বিশর ইবনে সোলায়মান। সে তার ও তার পিতা ইমাম আলী নকীরও বিশ্বস্ত মুরিদদের অন্যতম ছিল। সে গোলাম ও বাঁদী ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসা করত। সে বর্ণনা করে যে, ইমাম আলী নকী একবার ইংরেজী ভাষা ও বর্ণমালায় একটি চিঠি লিখে আমাকে দেন এবং এর সাথে দু'শ বিশটি স্বর্ণমুদ্রাও দেন। তিনি আমাকে বললেনঃ এগুলো নিয়ে বাগদাদ চলে যাও (যা তখন রাজধানী ছিল)। সেখানে নদীর তীরে তুমি একটি নৌকা দেখতে পাবে, যাতে বিক্রয়ের জন্যে বাঁদী থাকবে। তুমি সেখানে এক বাঁদীকে পর্দার মধ্যে থাকতে দেখবে। যে পছন্দ করবে না যে, কেউ তাকে দেখুক। জনৈক আরব যুবক তাকে ক্রয় করতে চাইবে এবং তিনশ' স্বর্ণমুদ্রা দাম বলবে। কিন্তু সেই বাঁদী তার সাথে যেতে কিছুতেই সম্মত হবে না। তখন তুমি বাঁদীর মালিককে এ চিঠিটি বাঁদীর কাছে পৌঁছিয়ে দিতে বলবে। (বিশর বর্ণনা করেনঃ) আমি ইমাম আলী নকীর আদেশ পালনার্থে বাগদাদ রওয়ানা হয়ে গেলাম এবং ইমামের বর্ণিত সকল ঘটনা সংঘটিত হল। অবশেষে ইমাম সাহেবের চিঠি সেই বাঁদীর হাতে পৌঁছে গেল। চিঠি দেখা মাত্রই সে বার বার তা চুম্বন করল এবং মালিককে বললঃ আপনি চিঠিওয়ালার হাতে আমাকে বিক্রয় করুন। নতুবা আমি আত্মহত্যা করব। মালিক দু'শ স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে তাকে আমার হাতে সমর্পণ করতে রাযী হল এবং আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে এলাম। এই বাঁদী আমাকে বললঃ আমি রোম সম্রাটের পৌত্রী আমার নাম মুলায়কা। আমার জননী হযরত ইসা (আঃ)-এর ভারপ্রাপ্ত শামউনের বংশধর। আমার কাহিনী এই যে, আমার বয়স যখন তের বছর, তখন আমার দাদা তার এক ভ্রাতুষ্পুত্রের সাথে আমার বিবাহ স্থির করে। নির্দিষ্ট দিনে বিবাহ উপলক্ষে বিরাট উৎসবের আয়োজন করা হল। সিংহাসনের উপর ক্রুশ রাখা হল। বরকে সেই সিংহাসনে বসানো হল। পাদ্রীরা হাত ইঞ্জিল নিয়ে দণ্ডায়মান হল। তারা তাদের নিয়ম অনুযায়ী বিবাহের কার্যক্রম শুরু করল। হঠাৎ ক্রুশ অবনমিত হয়ে পড়ে গেল। সিংহাসন ভেঙ্গে গেল। আমার বর সিংহাসনের উপর থেকে নীচে পড়ে যেয়ে সঙ্গা হারাল। এই অলক্ষুনে দুর্ঘটনার পর আমার দাদা তার অন্য এক ভ্রাতুষ্পুত্রের সাথে আমাকে বিয়ে দিতে চাইল এবং নির্দিষ্ট দিনে তেমনিভাবে উৎসবের আয়োজন করা হল। কিন্তু ঠিক বিবাহ পড়ানোর সময় পূর্বের অনুরূপ ঘটনা ঘটল। আমার দাদা অত্যন্ত দুঃখিত হল। সে রাত্রিতেই আমি স্বপ্নে দেখলাম—হযরত ইসা (আঃ) ও তার ভারপ্রাপ্ত শামউন এবং একদল হাওয়ারী আমার দাদার রাজপ্রাসাদে আগমন করলেন। নূরের একটি মিম্বর রাখা হল। এরপর হযরত মোহাম্মদ (সাঃ), তার ভারপ্রাপ্ত আলী অন্য ইমামগণকে সাথে নিয়ে আগমন করলেন এবং নূরের মিম্বরে অধিষ্ঠিত হলেন। তিনি হযরত ইসা (আঃ)-কে বললেনঃ আমার আগমনের কারণ এই যে, আপনার ভারপ্রাপ্ত শামউনের কন্যা (অর্থাৎ তার বংশধর) মোলায়কাকে আমার এই সন্তানের জন্যে চাই। একথা বলতে বলতে তিনি ইমাম হাসান আসকারীর দিকে ইশারা করলেন। তিনি তখন মোহাম্মদ (সাঃ)-এর সঙ্গে ছিলেন। (মুলায়কা বিশর ইবনে সোলায়মানকে সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিয়ে বললঃ ইনিই ইমাম হাসান আসকারী, যার পিতার চিঠি আপনি আমাকে দিয়েছেন। এরপর মুলায়কা স্বপ্নের অবশিষ্টাংশ শুনানোর জন্যে বিশর ইবনে সোলায়মানকে বললঃ) হযরত ইসা (আঃ) ও তার ভারপ্রাপ্ত শামউন আনন্দের সাথে এ প্রস্তাব মেনে নিলেন। এরপর

মোহাম্মদ (সাঃ) বিবাহের খোতবা পাঠ করলেন এবং হযরত ইসা (আঃ) আমাকে ইমাম হাসান আসকারীর বিবাহে দিয়ে দিলেন। স্বপ্নের এ কিসসা বর্ণনা করার পর মুলায়কা বিশর ইবনে সোলায়মানকে বললঃ আমি এ স্বপ্ন কারও কাছে বর্ণনা করিনি। কিন্তু তখন থেকেই ইমামত গগণের ভাস্কর হযরত ইমাম হাসান আসকারীর প্রেমাগ্নি আমার বক্ষে ও অন্তরে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। আমার আরাম নিদ্রা বিদায় এবং পানাহার খতম হয়ে গেল। এই প্রেমাগ্নির লক্ষণ বাইরেও প্রকাশ পেতে লাগল। এরপর আমি একদিন স্বপ্নে দেখলাম—হযরত মরিয়ম আগমন করেছেন। তার সাথে হযরত ফাতেমা যুহরা এবং হাজারো বেহশতী হুর ছিল। হযরত মরিয়ম আমাকে বললেনঃ এই মহিলা মহিলাকুল শিরোমনি ফাতেমা যুহরা—তোমার স্বামীর আম্মা। একথা শুনেই আমি তার আচল চেপে ধরলাম এবং খুব ক্রন্দন করলাম। আমি আরয করলামঃ আপনার সন্তান হাসান আসকারী কখনও আমাকে দেখতে এবং নিজেকে দেখাতেও আসেন না। তিনি বললেনঃ সে কিরূপে আসতে পারে? তুমি খৃষ্টান। তোমার আকীদা মুশরিকসুলভ। হযরত ফাতেমা যুহরার একথা শুনে আমি তখনই স্বপ্নে কলেমায়ে শাহাদত পাঠ করলাম এবং ইসলাম কবুল করলাম। যখন নিদ্রা থেকে জাগ্রত হলাম, তখন আমার মুখে কলেমায়ে শাহাদত উচ্চারিত হচ্ছিল। (এরপর মুলায়কা বর্ণনা করল-) এরপর থেকে কোন রাত্রি এমন অতিবাহিত হয়নি যে, আমার সেই স্বামী হাসান আসকারী আমার কাছে আসেন নি এবং আমাকে মিলনের শরবতর পান করিয়ে প্রফুল্ল ও আনন্দিত করেননি। এখন তারই আদেশ অনুযায়ী আমি এ কাজ করেছি যে, আমাদের দেশের একটি সৈন্যদল মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে যাচ্ছিল। আমি কোনরূপে সেই সৈন্যদলের মধ্যে ভিড়ে পড়লাম। মুসলমান সৈন্যরা যখন রোমীয় সেনাদলকে পরাস্ত করল, তখন অনেক মহিলার সাথে আমিও গ্রেফতার হলাম এবং এভাবে আপনার কাছে পৌছে গেলাম।

আল্লামা মজলিসী উভয় গ্রন্থে যেভাবে এ কাহিনী বর্ণনা করেছেন, তাই এখানে সংক্ষেপিত আকারে পাঠকবর্গকে উৎসর্গ করা হল। এতে কিছুও বাস্তবতা আছে, অথবা এটা আদ্যোপান্ত কেবল বানোয়াট গল্প—এ সম্পর্কে আমরা কোন আলোচনা করতে চাই না।

মোটকথা, আল্লামা মজলিসীর এ রেওয়ায়েত অনুযায়ী রোম সম্রাটের এই পৌত্রী মুলায়কা (নার্গিস) এভাবে একর্জন কেনা বাঁদীরূপে শিয়াদের একাদশতম ইমাম হাসান আসকারীর হেরেমে প্রবেশ করল। শিয়া রেওয়ায়েত অনুযায়ী ২৫৫ হিঃ অথবা ২৫৬ হিজরীতে তারই গর্ভ থেকে এই দ্বাদশতম ইমাম জন্মগ্রহণ করেন। তার জন্মও অজ্ঞাত এবং নবাজাতক সন্তানকেও মানুষের দৃষ্টি থেকে গোপন রাখা হয়। এরপর ইমাম হাসান আসকারীর ওফাতের দশদিন পূর্বে চার অথবা পাঁচ বছর বয়সে এই সাহেবজাদা অলৌকিকভাবে অন্তর্হিত হয়ে যান। শিয়াদের বিশেষ মযহাবী ভাষায় তাকে "আল হুজ্জাহ", "আল কায়েম", আল মুন্তাযার" ও "ছাহেবুয্ যমান' বলা হয়। যখন তার আত্মপ্রকাশের সময় হবে, তখন সারা বিশ্বে তারই রাজত্ব হবে এবং এমন সব কাজকর্ম হবে, যা দুনিয়াতে কখনও হয়নি। এটাই শিয়াদের বিশ্বাস।

এসব বিষয়ে বিশ্বাসী কট্টরপন্থী শিয়ারা তার আত্মপ্রকাশের অপেক্ষা করে আসছে। তারা কথায় ও লেখায় তার নামের সাথে عجل الله فرجه (আল্লাহ্ তার আত্মপ্রকাশকে দ্রুততর করুন।) কথাটি অপরিহার্যরূপে বলে এবং লিখে। কিন্তু ইতিপূর্বে খোমেনীর الحكومة الاسلامية

গ্রন্থ থেকেও উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, তার অন্তর্ধানের পর এক হাজার বছরেরও বেশী (এখন সাড়ে এগারশ' বছর) অতিক্রান্ত হয়ে গেছে এবং সম্ভবতঃ আরও হাজারো বছর এমনিভাবে অতিবাহিত হয়ে যাবে। (২৬ পৃঃ)

শেষ ইমামের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অন্তর্ধানঃ

পূর্বেও সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দ্বাদশতম ইমাম ছাহেবুযযমানের এই অন্তর্ধানের পর "কৃতী" শিয়ারা তাদের জনগণকে বলেছে এবং বিশ্বাস করিয়েছে যে, ছাহেবুযযমানের কাছে গোপন পথে তাদের যাতায়াত আছে এবং তারা যেন তার দূত ও বিশেষ এজেন্ট। একের পর এক চার ব্যক্তি এরূপ দাবী করেছে। তাদের মধ্যে সর্বশেষ ব্যক্তি ছিল আলী ইবনে মোহাম্মদ সমিরী। (মৃত্যুঃ ৩২৯ হিঃ) সরল প্রাণ শিয়ারা ছাহেবুযযমান (অন্তর্হিত ইমাম) পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্যে তাদের কাছে চিঠি, আবেদনপত্র ও নানারকম মূল্যবান উপঢৌকন দিত। তারা ইমামের পক্ষ থেকে তাদের জওয়াব এনে দিত। এসব জওয়াবের উপর ইমামের মোহর থাকত। এ কারবার অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে করা হত।

কিন্তু আসল ব্যাপার কি ছিল? এ সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস এই যে, আল্লাহ তাআলা যাকে এতোটুকুও জ্ঞান-বুদ্ধি ও অন্তর্দৃষ্টি দান করেছেন, সে এটাই বুঝবে যে, এটা ছিল এই চালাক ও ধূর্ত লোকদের একটি ব্যবসা, যা তারা নিজেদেরকে অন্তর্হিত ইমামের দূত বলে চালু করেছিল। কিন্তু শিয়া সম্প্রদায় এবং তাদের আলেম ও মুজতাহিদগণের মতেও এসব চিঠিপত্র নিষ্পাপ ইমামেরই বাণী এবং ধর্মীয় প্রমাণ এবং এগুলো তাদের রেওয়ায়েতসমূহে এ মর্যাদার সাথেই সন্নিবেশিত হয়েছে। এগুলোর বেশ বড় ভাণ্ডার "ইহতিজাজ-এ-তবরিযীর" শেষ পৃষ্ঠাসমূহেও দেখা যেতে পারে। খোমেনিও তার الحكومة الاسلامية গ্রন্থে ধর্মীয় প্রমাণরূপেই এগুলো উল্লেখ করেছেন এবং তার বিশেষ মতবাদ ولاية فقيه এগুলো দ্বারাও সপ্রমাণ করেছেন। (দেখুন ৭৬, ৭৭ পৃঃ)

পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, শিয়া আকীদা অনুযায়ী অন্তর্হিত ইমামের সাথে দূতালী চালু থাকার সময়কালকে তাদের রেওয়ায়েত ও গ্রন্থাবলীতে গায়বতে ছুগরার (ক্ষুদ্র অন্তর্ধানের) সময়কাল বলা হয়।

বর্ণিত আছে যে, অত্যন্ত গোপনীয়তা সহকারে চালু এই দৌত্য ব্যবসা তখন খতম হয়, যখন সমসাময়িক সরকারী কর্মচারীরা এ গোপন ব্যবসা সম্পর্কে জেনে ফেলে। তাদের পক্ষ থেকে অনুসন্ধান ও তদন্ত শুরু হয় যে, এরা কারা, যারা সরলপ্রাণ জনগণকে এভাবে প্রতারিত করে তাদের অর্থসম্পদ লুট করছে? এ তদন্তের পর থেকে দৌত্যকর্ম বন্ধ হয়ে যায় এবং খ্যাত করে

দেওয়া হয় যে, এখন "গায়বতে ছুগরা" তথা ক্ষুদ্র অন্তর্ধানের যুগ শেষ হয়ে "গায়বতে কুবরা' তথা মহা অন্তর্ধানের যুগ সূচিত হয়েছে। এখন অন্তর্হিত ইমামের আত্মপ্রকাশ পর্যন্ত তার সাথে কারও যোগাযোগ হতে পারে না এবং কেউ তার কাছে পৌঁছতে পারবে না। এখন কেবল তার আত্মপ্রকাশেরই প্রতীক্ষা করতে হবে।

অন্তর্হিত ইমাম কবে আত্মপ্রকাশ করবেন?ঃ

শেষ যামানার ইমাম (অন্তর্হিত ইমাম) সম্পর্কে এ আলোচনা এখন আমরা এ প্রশ্নের জওয়াবের উপর খতম করছি যে, শিয়া রেওয়ায়েত ও তাদের নিষ্পাপ ইমামগণের উক্তি তার আত্মপ্রকাশ কবে হবে?

শিয়াদের নির্ভরযোগ্যতম গ্রন্থ "ইহতিজাজে তবরিযীতে" নবম ইমাম মোহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে মূসার একটি উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে। তিনি "আলকায়েম" (অন্তর্হিত ইমাম) সম্পর্কে বলেনঃ

هوالذى يخفى على الناس ولادته ويغيب عنهم شخصه..... يجتمع اليه من اصحابه عدة اهل بدر ثلاث ماةوثلاثة عشررجلامن اقاصى الارض..... فاذااجتمعت له هذه العدة من اهل الاخلاص اظهر الله امره ٥

তার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তার জন্ম হবে গোপনে। মানুষ টেরও পাবে না। তার ব্যক্তিত্ব মানুষের দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য থাকবে। বিশ্বের প্রতি প্রান্ত থেকে বদর যোদ্ধাদের সংখ্যার অনুরূপ তার ৩১৩ জন অনুচর তার কাছে সমবেত হবে। যখন তিনশ' তেরজন খাঁটি লোক তার জন্যে সমবেত হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ তাআলা তার ব্যাপার প্রকাশ করবেন। (অর্থাৎ তিনি গুহা থেকে বাইরে এসে আপন কাজ শুরু করবেন।)

একটি চিন্তার বিষয়ঃ

শেষ ইমামের এ পর্যন্ত আত্মপ্রকাশ না করা ইমাম মোহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে মূসার উক্তি অনুযায়ী এ বিষয়ের প্রমাণ যে ২৬০ হিঃ থেকে এ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে এগারশ' বছর সময়ের মধ্যে তার অকৃত্রিম সহচর ৩১৩ জন শিয়াও কখনও হয়নি এবং আজও নেই। নতুবা তার আত্মপ্রকাশ কবে হয়ে যেত। জানি না, খোমেনীর মত শিয়া আলেম ও মুজতাহিদগণ এ সম্পর্কে কি মত পোষণ করেন। তাদের মতেও কি ঘটনা তাই?

অন্তর্হিত ইমাম সম্পর্কে দু'টি অধ্যয়নযোগ্য রেওয়ায়েতঃ

অন্তর্হিত ইমাম সম্পর্কে শিয়া রেওয়ায়েতসমূহের আলোকে যা কিছু লেখা আমরা জরুরী মনে করেছি, তা পাঠকবর্গকে উৎসর্গ করে দিয়েছে। উপসংহারে দু'টি লক্ষণীয় ও শিক্ষণীয় রেওয়ায়েত তার সম্পর্কে উল্লেখ করে আমরা এ আলোচনা খতম করছি।

রসূলে খোদা (সাঃ) ইমাম মেহদীর (অন্তর্হিত ইমামের) বয়াত করবেনঃ

আল্লামা বাকের মজলিসী তার حق اليقين গ্রন্থে ইমাম বাকের থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেনঃ

چون قائم آل محمد صلى الله عليه واله وسلم بيرون ايد خدااورايارى كند بملائكه واول كسے كه بااو بيعت كند محمد باشدوبعدازاعلىٰ ٥

যখন কায়েম আলে মোহাম্মদ (সাঃ অর্থাৎ মেহদী) আত্মপ্রকাশ করবেন, তখন খোদা ফেরেশতাদের মাধ্যমে তাকে সাহায্য করবেন। সর্বপ্রথম তার বয়াতকারী হবেন মোহাম্মদ এবং তার পরে দ্বিতীয় নম্বরে আলী তার বয়াত করবেন। (ইরানী মুদ্রণ ১৩৯ পৃঃ)

হযরত আয়েশাকে জীবিত করে শাস্তি দিবেনঃ

হক্কুল ইয়াকীন গ্রন্থেই বাকের মজলিসী ইবনে বাবওয়াইহির علل الشرائع গ্রন্থের বরাত দিয়ে বাকের থেকেই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেন যে,

چون قائم ماظاهر شود عائشه را زنده كند تابراو حد بزند وانتقام فاطمه مازو بكشد

যখন আমাদের কায়েম (অর্থাৎ মেহদী) আত্মপ্রকাশ করবেন, তখন আয়েশাকে জীবিত করে শাস্তি দিবেন এবং আমাদের ফাতেমার প্রতিশোধ নিবেন। (১৩৯ পৃঃ)

প্রকাশ থাকে যে, খোমেনী তার كشف الاسرار গ্রন্থে আল্লামা বাকের মজলিসীর ফারসীর রচনাবলীর প্রশংসাসহকারে উল্লেখ করেছেন এবং এগুলো পাঠ করার পরামর্শ দিয়েছেন। বিশেষ করে হক্কুল ইয়াকীমেনর কতক রেওয়ায়েত তিনি তার এ গ্রন্থে উদ্ধৃতও করেছেন।

শিয়াবাদ ও শিয়া মানসিকতা পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করার জন্যে আরও একটি রেওয়ায়েত নিম্নে উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

অন্তর্হিত ইমাম যখন আত্মপ্রকাশ করবেন, তখন কাফেরদের আগে সুন্নীদেরকে কতল করবেনঃ

হক্কুল ইয়াকীনের একটি রেওয়ায়েত এই যে,

وقتيكه قائم عليه السلام ظاهرمى شود پيش ازكفار ابتداءبه سنيان خواهدكرد باعلماء ايشان وايشان راخواهدكشت

যে সময় কায়েম (আঃ) আত্মপ্রকাশ করবেন, তখন তিনি কাফেরদের পূর্বে সুন্নী বিশেষতঃ তাদের আলেমদের থেকে কাজ শুরু করবেন এবং তাদের সকলকে হত্যা করে নাস্তনাবুদ করে দিবেন।

শিয়া মযহাবের মূল ভিত্তি "ইমামত" সম্পর্কে এ পর্যন্ত তাদের নিষ্পাপ ইমামগণের যে সকল উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং যা কিছু লিখা হয়েছে, আশা করি তা থেকে বিজ্ঞ পাঠকবর্গ এ বুনিয়াদী বিষয়ের স্বরূপ এবং শিয়া মযহাবে ইমামগণের মরতবা ও মর্যদা পুরাপুরি বুঝে নিয়ে থাকবেন।এখন আমরা এমন কয়েকটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করে এ আলোচনা খতম করব, যাতে আল্লাহ্ ও রসূলের পক্ষ থেকে ইমামপদে হযরত আলীর মনোনয়ন, বিদায় হজ্ব থেকে ফেরার পথে "গাদীরে খুস" নামক স্থানে অসাধারণ গুরুত্বসহকারে তা ঘোষণা, সকল মুহাজির, আনছার ও অন্যান্য সফর-সঙ্গীর কাছ থেকে এর অঙ্গীকার ও বয়াত নেওয়া এবং এ প্রসঙ্গে হযরত আবূবকর, ওমর ও প্রধান প্রধান ছাহাবীগণের মুনাফিকসুলভ আচরণ ও কাফেরসুলভ চরিত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। استغفرالله ولاحول ولاقوة الابالله

আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে ইমামপদে হযরত আলীর মনোনয়ন, রসূলুল্লাহ্র (সাঃ)কে একথা ঘোষণা করার নির্দেশ, ছাহাবীগণের বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার আশংকায় তাঁর ঘোষণা থেকে বিরত থাকা, এরপর আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে তীব্র তাকীদ ও শাস্তির হুমকি, এরপর গাদীরে খুমে তাঁর ঘোষণা এবং হুযুর (সাঃ)-এর শানে আবূবকর, ওমর আবূ ওবায়দা প্রমুখ প্রধান ছাহাবীগণের চরম ধৃষ্টতাপূর্ণ ও কাফেরসুলভ আচরণঃ

উছূলে কাফীতে একটি অধ্যায় আছে—

باب مانص الله ورسوله على الائمة عليهم السلام واحدافواحدا

এ অধ্যায়ে ইমামগণের সেইসব রেওয়ায়েত উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে আল্লা ও রসূলের পক্ষ থেকে হযরত আলী ও তার পরবর্তী এগার জন ইমামের ইমামত পদে মনোনয়ন ও নিযুক্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম হযরত আলীর মনোনয়ন এবং গাদীরে খুমে তা ঘোষণা সম্পর্কিত রেওয়ায়েত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এক্ষুণে আমরা কেবল এসব রেওয়ায়েতই উল্লেখ করব। কিন্তু এগুলো অত্যন্ত দীর্ঘ বিধায় আমরা কেবল প্রয়োজনীয় সারসংক্ষেপই এখানে পাঠকগর্বকে উৎসর্গ করব।

ইমাম বাকের (আঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি হযরত আলীর ইমামত সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল হলো إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا তখন সাধারণ মুসলমানরা এ থেকে পূর্ণ ব্যাপার বুঝতে সক্ষম হলো না। ফলে আল্লাহর তরফ থেকে রসূলের প্রতি নির্দেশ এলো এ পদের বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবং এ পদে হযরত আলীকে অধিষ্ঠিত করার কথা ঘোষণা করার জন্যে, যাতে সকলেই বুঝে নেয় এবং জ্ঞাত হয়ে যায়। এ আদেশ পেয়ে রসূলুল্লাহর (সাঃ) খুব উদ্বিগ্ন হলেন এবং আশংকা করলেন যে, আলী (আঃ)-এর ইমামত ও স্থলাভিষিক্ততার কথা শুনে লোকজন মুরতাদ (ধর্ম ত্যাগী) হয়ে যাবে এবং রসূলের বিরুদ্ধাচরণে মেতে উঠবে।

এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহর কাছে এ আদেশ পুনর্বিবেচনা করার অনুরোধ জানালেন (অর্থাৎ এ ঘোষণা না করাতে বললেন।)
তখন এই আয়াত নাযিল হলোঃ

يَاأَيُّهَاالرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَاأُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِكَ وَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَابَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

হে রসূল, আপনার প্রতি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যে আদেশ নাযিল করা হয়েছে, তা পরিষ্কারভাবে মানুষের কাছে পৌছিয়ে দিন। এটা না করলে আপনি আল্লাহর পয়গাম পৌছানোর দায়িত্ব পালন করলেন না। মানুষের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করবেন। এ ঘটনারই অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে যে, স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ যখন আমার মনে লোকজনের ধর্মত্যাগের আশংকা এবং বিরুদ্ধাচরণের ধারণা সৃষ্টি হলো, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে অসাধারণ তাকীদ ও অকাট্য নির্দেশ এলো যে, এ আদেশ পালন করতেই হবে। অন্যথায় আমাকে শাস্তির হুমকি দেওয়া হলো। (রেওয়ায়েতের ভাষা এরূপঃ واوعدنى ان لم ابلغ ان يعذبنى আল্লার পক্ষ থেকে এই কঠোর শাস্তি বাণী ও আযাবের হুমকি আসার পর রসূলুল্লাহর (সাঃ) গাদীরে খুমে একথা ঘোষণা করলেন। এ জন্যে তিনি সকলকে একত্রিত করলেন এবং তাদের সামনে আলী (আঃ)-এর ইমামত ও স্থলাভিষিক্ততা ঘোষণা করলেন। (১৭৮, ১৭৯ পৃঃ)
এক রেওয়ায়েতে আরও আছে যে, এ স্থলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বিশেষভাবে হযরত আবুবকর ও ওমরকে সম্বধন করে বললেনঃ قوما فسلماعليه بامرة المؤمنين, তোমরা উঠ এবং আলীকে আমিরুল মুমিনীন বলে অভিবাদন কর। তারা এভাবেই অভিবাদন করল। (১৮০ পৃঃ)
শিয়াদের অন্য এক নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ ইহতিজাজে তিবরিযীতে লেখক তার পূর্ণ সনদ সহকারে ইমাম বাকের থেকে গাদীরে খুমের এ ঘটনা অনেক সংযোজনসহ বর্ণনা করেছেন। এই রেওয়ায়েত পুস্তকের ২৮ পৃষ্ঠা থেকে ৩৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। এতে অনেক আশ্চর্যজনক বিষয় আছে। আলোচ্য গ্রন্থে সংক্ষেপকরণ লক্ষ্য না হলে কমপক্ষে সেই রেওয়ায়েতের সারসংক্ষেপও পাঠকবর্গকে উৎসর্গ করা হত। কিন্তু তার সারসংক্ষেপও আট দশ পৃষ্ঠার কমে সংকুলান হবে না। এক্ষণে তার বরাত দিয়া এ কথাই আরয করতে চাই যে, এতে আরও বলা হয়েছেঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আলীর ইমামত সম্পর্কে তার দীর্ঘ ভাষণ সমাপ্ত করার পর উপস্থিত সকলের কাছ থেকে হযরত আলীর ইমামত সম্পর্কে নিজের হাতে বয়াত নিলেন এবং সর্বপ্রথম আবুবকর, ওমর ও ওছমান বয়াত করলেন। এরপর সকল মুহাজির, আনছার ও উপস্থিত সকলেই বয়াত করল। রাত্রি পর্যন্ত এই বয়াত অব্যাহত রইল এবং মাগরিব ও এশার নামাজ একসাথে পড়া হলো। (৩৫ পৃঃ)
উছুলে কাফীর এক রেওয়ায়েতে আছেঃ
যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বিদায় হজ্ব থেকে ফিরে এলেন এবং গীদরে খুম নামক স্থানে পৌছলেন, তখন জিবরাঈল এই আয়াত নিয়ে নাযিল হলেন—

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَاأُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِكَ রসূলুল্লাহ (সাঃ) সকলকে একত্রিত করার জন্যে ঘোষণা প্রচার করালেন এবং যেখানে কয়েকটি বাবুল বৃক্ষ ছিল, সেখানে ময়দান কাটা ইত্যাদি থেকে পরিষ্কার করালেন। যখন সকলেই সমবেত হলো, তখন তিনি (কিছু ভূমিকার পর) ঘোষণা করলেনঃ

من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه

তিনি তিনবার একথা বললে লোকজনের মনে নিফাকের বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে গেল। তারা পরস্পরে বলতে লাগলঃ এ আদেশ কিছুতেই আল্লাহর তরফ থেকে নাযিল হয়নি; বরং মোহাম্মদ তার চাচাত ভাই আলীর মর্যাদা বৃদ্ধি করে, তাকে আমাদের উপর চাপিয়ে দিতে চান। (নাউযুবিল্লাহ) (১৮২ পৃঃ)

এক রেওয়ায়েত "ফুরুগে কাফী" গ্রন্থে আছে। তারও সারমর্মই পাঠকবর্গকে উৎসর্গ করা হচ্ছে। (এতে হযরত আবুবকর, ওমর, সালেম মওলা, আবু হুযায়ফা, আবু ওবায়দা প্রমুখ প্রধান ছাহাবীগণের বিরুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শানে জঘন্যতম কাফেরসুলভ ধৃষ্টতার অপবাদ আরোপ করা হয়েছে।)

উট পরিচালক হাসসান থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার ইমাম জাফর ছাদেক (আঃ) আমার উটে চড়ে মদীনা থেকে মক্কায় সফর করেন। গাদীরে খুমে পৌঁছে ইমাম (সেখানে নির্মিত) মসজিদের বাম দিকে দেখলেন এবং বললেনঃ এ স্থানে দাঁড়িয়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আলী (আঃ)কে তাঁর উভয় হাতে উপরে তুলে তার ইমামত ঘোষণা করেন এবং বলেনঃ من كنت مولاه فعلى مولاه এরপর ইমাম মসজিদের অন্য দিকে দেখলেন এবং বললেনঃ এখানে থামুক ও অমুকের (অর্থাৎ আবুবকর ও ওমরের) তাঁবু ছিল এবং সালেম মওলা আবু হুযায়ফা, আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহরও তাঁবু ছিল। যখন তারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)কে দেখল যে, তিনি আলীকে উভয় হাতে উপরে তুলে তার ইমামত ঘোষণা করলেন।, তখন তারা পরস্পরে বললঃ انظروا الى عينيه تدوركانها عينامجنون

তার (রসূলুল্লাহ সাঃ-এর) চক্ষুদ্বয়ের দিকে দেখ, কেমন ঘুরছে—যেন কোন উন্মাদের চক্ষু (নাউযুবিল্লাহ) এ সময় জিবরাঈল এই আয়াত নিয়ে নাযিল হনঃ

وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِ يْنَ كَفَرُوا لَيُذْ لِقُوْنَكَ بِاَ صَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّه لَمَجْنُوْنٌ

আয়াতের অর্থ এই যে, কাফেররা যখন কোরআন শ্রবণ করে, তখন হে রসূল, তারা আপনাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে এবং আপনাকে পিছলিয়ে ফেলে দিতে চায়। তারা বলেঃ সে তো বদ্ধ পাগল। বলাবাহুল্য, এ আয়াতের সম্পর্ক মক্কার কাফেরদের সাথে। এ হতভাগারাই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শানে এমন ধৃষ্টতা করত। কিন্তু ফুরুগে কাফীর এই রেওয়ায়েতে ইমাম জাফর ছাদেক সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি হযরত আবুবকর, ওমর, সালেম মওলা আবু হুযায়কা ও আবু ওবায়দাকে এ আয়াতের প্রতিভু বলেছেন। (নাউযুবিল্লাহ)

উছূলে কাফী ও ফুরুগে কাফীর গ্রন্থকার আবু জাফর মোহাম্মদ ইবনে ইয়াকুব কলিনীর এক গ্রন্থ হচ্ছে كتاب الروضه এটা যেন আলজামেউল কাফীর শেষ খণ্ড। এটা ফুরুগে

কাফী তৃতীয় খণ্ডের শেষে শামিল। এতে আমিরুল মুমিনীন হযরত আলীর একটি দীর্ঘ খুতবা বর্ণনা করা হয়েছে। এর শেষাংশে তিনি গাদীরে খুমের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেনঃ রসূলে করীম (সাঃ) বিদায় হজ্ব থেকে ফেরার পথে গাদীরে খুমে পৌঁছলে সেখানে তাঁর আদেশে তাঁর জন্যে একটি মিম্বরের মত তৈরী করা হলো—

ثم علاهواخذ بعضدی حتی رأی بیاض ابطیه رافعا صوته قائلا فی محفله
من کنت مولاه فصلی مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه

অতঃপর তিনি সেই মিম্বরে আরোহণ করলেন এবং আমার উভয় বাহু ধরে আমাকে এমনভাবে উপরে তুলে ধরলেন যে, তাঁর উভয় বগলের শুভ্রতা দৃষ্টিগোচর হয়ে গেল। এ সমাবেশে তিনি উচ্চঃস্বরে বললেনঃ আমি যার বন্ধু, আলীও তার বন্ধু। হে আল্লাহ, যে আলীর সাথে মহব্বতের সম্পর্ক রাখে আপনিও তার সাথে মহব্বতের সম্পর্ক রাখুন। আর যে আলীর সাথে শত্রুতা রাখে, আপনিও তার সাথে শত্রুতা রাখুন। (১৩, ১৪ পৃঃ)
এ রেওয়ায়েতে এরপর বলা হয়েছে যে, গাদীরে খুমের এ ঘটনা বর্ণনা করার পর আমিরুল মুমিনীন আলী (আঃ) الاشقیان (দু'হতভাগা) শব্দ বলে হযরত আবুবকর ও হযরত ওমরের প্রসঙ্গে উল্লেখ করলেন। মৃত্যুর পর আখেরাত ও দোযখে তাদের যে দুর্দশা হবে, আমিরুল মুমিনীন তা বিস্তারিত বর্ণনা করলেন। এর পরে (এ খুতবার মধ্য হযরত আলীর মুখে) সকল মুহাজির ও আনছারের প্রতি (কারও নাম না নিয়ে) জঘন্য ধরনের গালিগালাজ রয়েছে, যারা এ দু'জনকে খলিফা স্বীকার করে। এ গালিগালাজ যেন তখনকার সমগ্র মুসলিম উম্মাহর প্রতি এবং সকল ছাহাবায়ে কেরামের প্রতি।

জরুরী হুঁশিয়ারি

এখানে আমরা আমাদের পাঠকবর্গকে দু'টি বিষয়ে হুঁশিয়ার করে দেয়া জরুরী মনে করি। (১) গাদীরে খুমের ঘটনা সম্পর্কে উপরোক্ত রেওয়ায়েতসমূহে এবং বিভিন্ন শিরোনামে ইতিপূর্বে উদ্ধৃত অনেক রেওয়ায়েতেও শায়খায়ন ও অন্যান্য ছাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে অনেক অশোভনীয় ও অমর্যাদাকর কথাবার্তা বর্ণিত হয়েছে। এসব কথাবার্তা হযরত আলী মুর্তযা (রাঃ) ও তার পরবর্তী বংশধর বিশেষতঃ ইমাম বাকের ও ইমাম জাফর ছাদেকের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে। এসব শিয়া রেওয়ায়েতের কারণে আমাদের পাঠকবর্গ এই সর্বজনমান্য বুযুর্গগণ সম্পর্কে যেন কোনরূপ কুধারণাকে অন্তরে স্থান না দেন। এই মনীষীগণের প্রতি এ সকল প্রলাপোক্তি সেই সকল রাবী তথা রেওয়ায়েত বর্ণনাকারীর অপচেষ্টা ও কারসাজি, যাদের মিশন তথা লক্ষ্যই ছিল ইসলামের সর্বনাশ সাধন এবং মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা। নতুবা এটা স্বীকৃত ঐতিহাসিক সত্য যে, হযরত আলী মুর্তযাও সাধারণ মুহাজির ও আনছার ছাহাবীগণের ন্যায় হযরত আবুবকর ও ওমরকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খলিফা, স্থলাভিষিক্ত ও আমিরুল মুমিনীন মেনে তাদের বয়াত করেছিলেন এবং তিনি তাদের নির্ভরযোগ্যতম

উপদেষ্টাদের অন্যতম ছিলেন। তিনি জীবনে কখনও কোন সমাবেশে এ সম্পর্কে নিজের বিরোধ প্রকাশ করেননি এবং গাদীরে খুমের এ কিস্‌সা বর্ণনা করে তাদের মোকাবিলায় নিজের ইমামত ও খেলাফত দাবী করেননি। উম্মতে মোহাম্মদীয়ার মতে, (এবং অমুসলিম ইতিহাসবিদদের মতেও) তার এ আচরণ আন্তরিক সততা সহকারেই ছিল—(তাকিয়্যার ভিত্তিতে) মুনাফিকসুলভ ছিল না (যেমন শিয়ারা দাবী করে)। এর সর্ববৃহৎ কার্যগত প্রমাণ এই যে, হযরত আলী মুর্তযা (রাঃ) তার কন্যা উম্মে কুলছুমের বিবাহ হযরত ওমর (রাঃ)-এর সাথে দেন এবং তাকে এমনিভাবে আপন জামাতা করেন, যেমন রসূলুল্লাহ্ (রাঃ) হযরত আলী মুর্তযাকে জামাতা করেছিলেন। এ সম্পর্কে পরে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। (২) আহলে সুন্নত তথা সুন্নী সম্প্রদায়ের কতক হাদীস গ্রন্থেও বিদায় হজ্ব সফরের সেই খোতবা উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছিলেন من كنت مولاه فعلى مولاه (আমি যার বন্ধু, আলীও তার বন্ধু।) কিন্তু ইমামত ও খেলাফতের সাথে এর দূরবর্তী সম্পর্কও নেই। প্রকৃত ঘটনা ছিল এইঃ বিদায় হজ্বের সাত আট মাস পূর্বে রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আলীকে প্রায় তিনশ' যোদ্ধার সাথে এয়ামন প্রেরণ করেন। তিনি বিদায় হজ্বে এয়ামন থেকে এসেই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে মিলিত হয়েছিলেন। এয়ামনে অবস্থানকালে তার কতক পদক্ষেপের দরুণ তার সাথে কতক সফর-সঙ্গীর বিরোধ দেখা দেয়। বিরোধীরাও বিদায় হজ্বে যোগদানের জন্যে তার সাথে মক্কায় আসে। তারা মক্কায় এসে অন্য মুসলমানদের কাছেও হযরত আলীর পদক্ষেপের বিরুদ্ধে নিজেদের মতামত প্রকাশ করে। নিঃসন্দেহে এটা তাদের ভুল ছিল। শয়তান এহেন সুযোগ কাজে লাগিয়ে অন্তরে মলিনতা ও বিভেদ সৃষ্টি করে দেয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এ পরিস্থিতি অবগত হলেন। তিনি এ ক্ষেত্রে আল্লাহতায়ালার কাছে হযরত আলীর অর্জিত সম্মান ও মর্তবা সম্পর্কে মুসলমানদেরকে অবহিত করা ও তা ঘোষণা করার প্রয়োজন অনুভব করলেন। এ উদ্দেশ্যেই তিনি সেই খোতবা দিলেন, যাতে বললেনঃ من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه আরবী ভাষায় "মওলা" শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে, যেমন প্রভু, গোলাম, মুক্ত ক্রীতদাস, মিত্র, সাহায্যকারী, বন্ধু ও প্রিয়জন। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এরশাদে এ শব্দটি শেষোক্ত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে এবং হাদীসের সর্বশেষ দোয়ামূলক বাক্যটি এর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর এই উক্তির মানে এই যে, আমি যার প্রিয়জন, আলীও তার প্রিয়জন। কাজেই যে আমাকে মহব্বত করে, তার উচিত আলীকেও মহব্বত করা এবং তার বিরুদ্ধে কানাঘুষা করা থেকে বিরত থাকা। তিনি দোয়া করলেনঃ হে আল্লাহ্! যে বান্দা আলীর সাথে মহব্বতের সম্পর্ক রাখে, আপনি তার সাথে মহব্বতের সম্পর্ক রাখুন। আর যে তার সাথে শত্রুতা রাখে, আপনি তার সাথে শত্রুতা রাখুন। এ বাক্য সুস্পষ্ট ইঙ্গিত যে, হাদীসে "মওলা" শব্দটি বন্ধু ও প্রিয়জন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

মোটকথা, ইমামত ও খেলাফতের সাথে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর এই এরশাদের কোন সম্পর্ক নেই। এখানে আমরা এ সম্পর্কে এতটুকুই আরয করলাম। আল্লাহতায়ালা তওফীক দিলে এ হাদীস সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখার ইচ্ছা আছে।

ইছনা-আশারী শিয়াদের আরও কয়েকটি আকীদা

এই "জরুরী হুশিয়ারি ছিল একটি অন্তর্বর্তী বাক্য, যা সংক্ষিপ্ত করার ইচ্ছা ও চেষ্টা সত্ত্বেও কিছু দীর্ঘ হয়ে গেছে। এখন মূল বিষয়বস্তুর দিকে আসুন।

ইছনা আশারী শিয়াদের স্বীকৃত ও প্রামাণ্য গ্রন্থাবলী থেকে ইমামত সম্পর্কে যে সকল রেওয়ায়েত ও তাদের ইমামগণের উক্তি আমাদের পেশ করার ছিল, তা প্রায় চল্লিশটি শিরোনামের অধীনে আমরা পেশ করেছি। আশাকরি এতে পাঠকবর্গ ইমামতের স্বরূপ পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করে থাকবেন। এখন আমরা ইছনা আশারীদের অন্য কয়েকটি আকীদা ও মসআলা উল্লেখ করব, যা আসলে এই ইমামত বিশ্বাসেরই অবশ্যম্ভাবী ফলাফল। ইছনা-আশারী শিয়াদেরকে বুঝা এবং তাদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্যে এসব আকীদা ও মসআলা অধ্যয়ন করা এবং এগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করাও জরুরী এবং ইনশাআল্লাহ এতটুকুই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি। এসব আকীদা ও মসআলা সম্পর্কেও যা কিছু আরয করা হবে, তা তাদের নিস্পাপ ইমামগণের উক্তি ও তাদের প্রামান্য গ্রন্থাবলীর বরাত দিয়েই আরয করা হবে।

(নাউযুবিল্লাহ) ছাহাবায়ে কেরামের প্রা সকলই বিশেষতঃ খলিফাত্রয় কাফের, ধর্মত্যাগী, আল্লাহ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাসঘাতক, জাহান্নামী ও অভিশপ্তঃ

পূর্বেও আরয করা হয়েছে যদি স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বিদায় হজ্ব থেকে ফেরার পথে 'গাদীরে খুম' নামক স্থানে সকল সফরসঙ্গী বিশিষ্ট ও সাধারণ ছাহববায়ে-কেরামকে বিশেষ ব্যবস্থার অধীনে একত্রিত করেন। অতঃপর নিজে মিম্বারে আরোহন করে হযরত আলী মুর্তজাকে উভয় হাতে উপরে তুলেন যাতে উপস্থিত সকলেই তাঁকে দেখতে পায়। অতঃপর আল্লাহতায়ালার আদেশের বরাত দিয়ে পরবর্তী সময়ের জন্যে তাঁর ইমামত অর্থাৎ স্থলাভিষিক্তরূপে উম্মতের ধর্মীয় ও জাগতিক শাসন কর্তৃত্ব ঘোষণা করেন। সকলের কাছ থেকে এর অঙ্গীকার ও স্বীকৃতি আদায় করেন। বিশেষতঃ হযরত আবু বকর ও হযরত ওমরকে আদেশ দেন যে, তোমরা আলীকে "আস্সালামু আলাইকা ইয়া আমিরাল মুমিনীন" বলে সালামী দাও। তাঁরা এ আদেশ পালন করে এমনিভাবে সালামী দেন। ইহতেজাজে তবরিযীর উল্লেখিত রেওয়ায়েত অনুযায়ী রসূলুল্লাহ (সঃ) স্বয়ং নিজের হাতে হযরত আলীর পক্ষে সকলের কাছ থেকে বয়াত নেন। এবং সর্বপ্রথম খলিফাত্রয় তাঁর হাত ধরে এই বয়াত করেন। মোট কথা, শিয়া গ্রন্থাবলীর রেওয়ায়েত অনুযায়ী এই পূর্ণ বিবরণকে বাস্তব ঘটনা বলে স্বীকার করে নেওয়া হলে এর অবশ্যম্ভাবী ফলাফলস্বরূপ একথাও স্বীকার করতে হবে যে, যখন এ ঘটনার মাত্র আশি দিন পরে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাত হয়ে যাওয়ায় সকলেই হযরত আলীকে পরিত্যাগ করে হযরত আবু বকরকে খফিলা ও স্থলাভিষিক্তরূপে মুসলিম উম্মাহ্র ধর্মীয় ও জাগতিক রাষ্ট্রপ্রধান করে নিল, এবং সকলেই তাঁর হাতে বয়াত করল,

তখন (নাউযুবিল্লাহ) তাঁরা সকলেই আল্লাহ্ ও রসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল এবং সকলেই কাফের ও ধর্মত্যাগী হয়ে গেল। বিশেষতঃ খলিফাত্রয় হযরত আবু বকর, হযরত ওমর ও হযরত ওছমান বিশ্বাসঘাতক হয়ে গেলেন, যাদের কাছ থেকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বিশেষভাবে অঙ্গীকার ও স্বীকৃতি নিয়েছিলেন এবং নিজের হাতে সর্বপ্রথম বয়াত গ্রহণ করেছিলেন।

যদি ধরে নেওয়ার পর্যায়ে শিয়া রেওয়ায়েত ও তাঁদের ইমামগণের উক্তিতে তাঁদেরকে কাফের, মুরতাদ ও জাহান্নামী বলা না হতো এবং তাঁদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করা না হত, তবুও ইমামত ও গাদীরে খুমে অসাধারণ ব্যবস্থাপনা সহকারে ঘোষণা এবং তার জন্যে স্বীকৃতি নেওয়ার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিস্বরুপ একথাই মানতে হত। কিন্তু পাঠকবর্গ ইতিপূর্বে উছূলে-কাফীর বরাত দিয়ে সেই সব রেওয়ায়েত ও ইমামগণের উক্তি পাঠ করেছেন, যেগুলোত এর ভিত্তিতেই ছাহাবে-কেরাম বিশেষতঃ খলিফাত্রয়কে কাফের, মুরতাদ ও জাহান্নামী বলা হয়েছে এবং সেই সব কোরআনী আয়াতের প্রতীক সাব্যস্ত করা হয়েছে, যেগুলো ঘৃন্যতম কাফেরদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

এ বিষয়বস্তু সম্পর্কিত আরও কয়েকটি রেওয়ায়েত এখানে পাঠকবর্গকে অবহিত করা আমরা সমীচীন মনে করি।

হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ) সম্পর্কে....ঃ

কুলাইনীর কিতাবুর-রওযায় রেওয়ায়েত আছে যে, ইমাম বাকেরের জনৈক অকৃত্রিম মুরিদ হযরত আবু বকর ও ওমর সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করলে তিনি বললেনঃ

এ দু'জনের সম্পর্কে কি জিজ্ঞেস কর? আমাদের আহলে-বায়তের মধ্য থেকে যেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে, তাদের প্রতি ক্ষুব্ধ অবস্থায় বিদায় নিয়েছে। আমাদের প্রত্যেক বড়জন ছোটজনকে এদের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করার ওছিয়্যত করেছে। তারা উভয়েই অন্যায়ভাবে আমাদের অধিকার ক্ষুণ্ণ করেছে। তারা সর্বপ্রথম আমাদের আহলে-বায়তের ঘাড়ে সওয়ার হয়েছ। আমাদের উপর যে কেন বালা-মুছিবত এসেছে, তার ভিত্তি তারা রচনা করেছে। অতএব তাদের উভয়ের প্রতি আল্লাহর আনত, ফেরেশতাগণের লানত এবং সকল মানুষের লানত। (১১৫-পৃঃ)

এ গ্রন্থে এ পৃষ্ঠাতেই একটি রেওয়ায়েত আছে যে, ইমাম বাকেরের এই অকৃত্রিম মুরিদই তাঁকে হযরত এয়াকুব (আঃ)-এর সেই পুত্রদের সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল, যারা তাদের ছোট ভাই হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে জঙ্গলের এক কূপে নিক্ষেপ করেছিল। (কোরআনে পয়গাম্বরগণের সাথে তাদের উল্লেখ اسباط শব্দ দ্বারা স্থানে স্থানে করা হয়েছে।) মুরিদ তাদের সম্পর্কে ইমাম বাকেরকে প্রশ্ন করে যে, তারা নবী ছিল কি না? (প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ এই ছল যে, যখন তারা এতবড় অন্যায় ও গোনাহ্ করেছিল, তখন তাদের উল্লেখ কোরআন মজীদে পয়গাম্বরগণের সাথে কেন করা হল?) জওয়াবে ইমাম বাকের বললেনঃ

—"এয়াকুব (আঃ)-এর পুত্ররা নবী ছিলেন না; কিন্তু নবীর আওলাদ ছিলেন। তাদের প্রত্যেকেই দুনিয়া থেকে সৎ ও পবিত্র হয়ে বিদায় নিয়েছেন। তারা ইউসুফ(আঃ)-এর সাথে যে অন্যায়

ব্যবহার করেছিল, পরবর্তীকালে তারা তা স্মরণ করে এবং তওবা করে। কিন্তু শায়খায়ন (আবু বকর ও ওমর) দুনিয়া থেকে এ অবস্থায় বিদায় নিয়েছে যে, তারা আমিরুল-মুমিনীন (আঃ)-এর প্রতি যে অন্যায় করেছিল, তা থেকে তারা তওবা করেনি এবং এ কথা স্মরণও করেনি। এতএব তাদের প্রতি আল্লাহ, সকল ফেরেশতা এবং সকল মানুষের লানত। (১১৫-পৃঃ)

"রেজাল-কুশী'তে বর্ণিত আছে যে, ইমাম বাকেরের একজন খাঁটি মুরিদ কুমায়ত ইবনে যায়দ ইমামকে বলল যেঃ আমি এই দুই ব্যক্তি (আবু বকর ও ওমর) সম্পর্কে আপনার কাছে জানতে চাই। ইমাম বললেনঃ

—হে কুমায়ত ইবনে যায়দ! ইসলামে যাকেই অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে, যে ধন-সম্পদই অবৈধভাবে উপার্জন করা হয়েছে এবং যত যিনা হয়ে থাকবে, আমাদের ঈমাম মেহেদীর আত্মপ্রকাশের দিন পর্যন্ত সবগুলোর গোনাহ্ এই দুই ব্যক্তির ঘাড়ে চাপবে। (১৩৫ পৃঃ)

উপসংহারে কুলাইনীর কিতাবুর-রওযার আরও একটি রেওয়ায়েত পড়ে নিনঃ

আবু বকরের (রাঃ) বয়াত সর্বপ্রথম ইবলিস করেছিলঃ

কুলাইনী তার সনদ সহকারে হযরত সালমান ফারেসী থেকে একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। রেওয়ায়েতটি অনেক দীর্ঘ। তই এর যে অংশ আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত, তারই সংক্ষিপ্ত সার পাঠকবর্গকে অবহিত করা হচ্ছেঃ

—"রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ওফাতের পর ছকিফা বনী-ছায়েদায় যখন আবু বকরের বয়াতের ফয়ছালা হয় এবং সেখান থেকে মসজিদে নববীতে এসে আবু বকর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মিম্বরে বসে বয়াত নিতে শুরু করলেন, তখন সালমান ফারেসী এ দৃশ্য দেখে হযরত আলীকে সংবাদ দিলেন। হযরত আলী সালমানকে বললেনঃ তুমি জান এখন আবু বকরের হাতে সর্বপ্রথম কে বয়াত করেছে। সালমান বললেনঃ আমি সেই লোকটিকে চিনি না; কিন্তু আমি একজন বৃদ্ধকে দেখেছিলাম। সে তার লাঠির উপর ভর দিয়ে সামনে এগিয়ে আসে। তার চক্ষুদ্বয়ের মাঝখানে কপালে সেজদার চিহ্ন ছিল। সে-ই সর্বপ্রথম আবু বকরের দিকে অগ্রসর হয়। সে ক্রন্দন করছিল আর বলছিলঃ

—"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যে, যিনি আমাকে এ স্থানে আপনাকে দেখার পূর্বে মৃত্যু দেননি। হাত বাড়ান। আবু বকর হাত বাড়ালে বৃদ্ধ তাঁর হাত ধরে বয়াত করল। হযরত আলী একথা শুনে সালমানকে বললেনঃ তুমি জান সে কে? সালমান বললেনঃ আমি জানি না। হযরত আলী বললেনঃ

সে ইবলীস। তার প্রতি আল্লাহ্ লানত করুন। হযরত আলী বললেনঃ খেলাফতের ব্যাপারে যা কিছু হয়েছে, সবই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাকে পূর্বে বলে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেনঃ গাদীরে-খুম আমার পরবর্তী সময়ের জন্যে খেলাফতের ব্যাপারে আমার মনোনয়ন ঘোষণা থেকে শয়তান ও তার বাহিনীর মধ্যে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তারা এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে এবং এর ফলশ্রুতিতে আমার ওফাতের পর লোকজন প্রথমে ছফীফা বনী ছায়েদায় এবং পরে মসজিদে-নববীতে এসে আবু বকরের বয়াত করবে। রেওয়ায়েতের শেষাংশ এইঃ

ثم ياتون المسجد فيكون اول من يبايعه على منبرى ابليس لعنه الله فى صورة شيخ يقول كذا وكذا .....

এর পর (ছকফা বনী ছায়েদা থেকে) তারা মসজিদে আসবে। এখানে আমার মিম্বরের উপর আবু বকরের হাতে বয়াত সর্বপ্রথম অভিশপ্ত ইবলীস করবে। সে বৃদ্ধের ছদ্মবেশে আসবে এবং এই এই কথা বলবে। ১৫৯, ১৬০)

ফারুকে আযমের শানেঃ

প্রথম দুই খলিফা হযরত আবু বকর ও উমর সম্পর্কে শিয়া গ্রন্থাবলীর যে সকল রেওয়ায়েত ও ইমামগণের উক্তি ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোই ফারুকে-আযম সম্পর্কে শিয়াদের আকীদা জানার জন্যে যথেষ্ট। তবুও এখানে আমরা বিশেষভাবে তারই সাথে সম্পর্কযুক্ত অন্য একটি রেওয়ায়েত পাঠকবর্গকে অবহিত করছি। এটি য়িাদের একাদশতম ইমাম হাসান আসকারী থেকে বর্ণিত। এ একটি রেওয়ায়েতই শিয়াবাদের শরূপ ও শিয়া মানসিকতা জানা ও বুঝার জন্যে যথেষ্ট।

মোল্লা বাকের মজলিসী হিজরী দশম একাদশ শতাব্দীর একজন বড় শিয়া মুহাদ্দিসীন" মুজতাহিদ ও গ্রন্থকার। শিয়া আলেমগণ তাকে *"খাতামুন-মুহাদ্দিসীন" বলে ও লিখে। তার রচনাবলী শিয়াদের মধ্যে (যতদূর আমাদের অনুমান) সম্ভবতঃ অন্য সকল গ্রন্থকারের তুলনায় অধিক জনপ্রিয়। আয়াতুল্লাহ্ রুহুল্লাহ্ খোমেনীও তার রচনাবলীর অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন এবং সেগুলো অধ্যয়ন করার পরামর্শ দিয়েছেন। (কাশফুল-আস্‌রার, ১২১ পৃঃ) কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, তার পরিচিতির মধ্যে এটাও উল্লেখ করা জরুরী যে, এই মোল্লা সাহেব শিয়াদের বড় মুজতহিদ ও মুহাদ্দিস হওয়া সত্বেও চরম পর্যায়ের কটুভাষী। তার গ্রন্থসমূহে যখন হযরত ওমর (রাঃ) সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করেন, তখন লিখেনঃ

عمربن الخطاب عليه اللعنة والعذاب

অর্থাৎ ওপর ইবনুল খাত্তাব, তার প্রতি লানত ও আযাব। (নাউযুবিল্লাহ্) এই বাকের মজলিসীরই একটি গ্রন্থ হচ্ছে 'যাদুল মায়াদ'। এতে তিনি ৯ই রবিউল আউয়ালের ফযিলত ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলল্লাহ্ (সাঃ)-কে আল্লাহ্তায়ালা ওহীর মাধ্যমে বলেছিলেন যে, এই তারিখে আপনার ও আপনার পরিবারের দুশমন ওমর ধ্বংস হবে। সে মতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ৯ই রবিউল আউয়ালে ঈদের ন্যায় উৎসব পালন করেন এবং আল্লাহ্তাআলার তরফ থেকে এ তারিখের বিস্ময়কর ফজিলত বর্ণনা করেন। পাঠকবর্গ রেওয়ায়েতের মধ্যে এসব ফযিলত পাঠ করবেন। রেওয়ায়েতটি অত্যন্ত দীর্ঘ। সম্পূর্ণ রেওয়ায়েত তরজমা সহকারে উল্লেখ করলে ১৫/২০ পৃষ্ঠা লেগে যাবে। তাই আমরা সংক্ষেপে উল্লেখ করব।

ফারুকে আযমের শাহাদত দিবস সর্ববৃহৎ ঈদ—রসূলল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি মিথ্যাচার আরোপের জঘন্যতম দৃষ্টান্তঃ

মোল্লা বাকের তার সনদ সহকারে শিয়াদের একাদশতম ইমাম হাসান আসকারী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেনঃ "আমার পিতা (দশম ইমাম আলী নকী) বর্ণনা করেন যে, (খ্যাতনামা ছাহাবী) হুযায়ফা ইবনে এয়ামান থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি (হুযায়ফা) ৯ই রবিউল আউয়াল তারিখে রসূলে খোদা (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হন। তিনি দেখলেন যে, আমিরুল-মুমিনীন আলী মুর্তজা, ইমাম হাসান ও ইমাম হুসায়নও সেখানে আছেন। তাঁরা সকলেই আহার করছিলেন। রসূলল্লাহ্ (সাঃ) অত্যন্ত প্রফুল্ল ছিলেন এবং মুচকি হাসছিলেন। তিনি হাসান ও হুসায়নকে বলছিলেনঃ বৎস, আজ সেই দিন, যেদিন আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের দুশমন ও তোমাদের নানার দুশমনকে ধ্বংস করবেন এবং তোমাদের আম্মা ফাতেমা যুহ্রার বদদোয়া কবুল করবেন। খাও বৎস, খাও। আজ সেইদিন, যেদিন আল্লাহ্ তোমাদের শিয়া ও বন্ধুদের আমল কবুল করবেন। খাও বৎস, খাও। আজিকার তারিখে তোমাদের নানার দুশমন ও তোমাদের দুশমনের জাঁকজমক চুরমার হয়ে ধূলা ধূসরিত হবে। খাও বৎস, খাও। আজকের দিনে আমার আহলে বায়ত তথা পরিবার-পরিজনের ফেরাউন, তাদের প্রতি জুলুমকারী ও তাদের অধিকার খর্বকারী ধ্বংস হবে।

হুযায়ফা বলেনঃ আমি আরয করলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ্। আপনার উম্মতের মধ্যে এমন কোন হতভাগা হবে নাকি, যে এমন কাণ্ড করবে? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেনঃ হে হুযায়ফা, মুনাফিকদের মধ্য থেকে এক প্রতিমা হবে, সে তাদের প্রধান হবে। সে জুলুম ও নিপীড়নের বেত্র নিজ হাতে রাখবে; মানুষকে সত্যপথ থেকে বাধা দিবে, কোরআনে পরিবর্তন করবে, আমার সুন্নত বদলে দিবে, আমার ভারপ্রাপ্ত আলী ইবনে আবু তালেবের উপর জুলুম করবে এবং আমার কন্যা ফাতেমাকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে। আমার কন্যা তার প্রতি অভিসম্পাত ও বদদোয়া করবে। আল্লাহতাআলা তার অভিসম্পাত ও বদদোয়া কবুল করবেন।

হুযায়ফা বলেনঃ আমি আরয করলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ্, আপনি এই দোয়া করেন না কেন যে, আল্লাহ্তাআলা এই জালেম ও ফেরাউনকে আপনার জীবদ্দশাতেই ধ্বংস করে দিন? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেনঃ হে হুযায়ফা, আমি সমীচীন মনে করি না যে, আল্লাহ তাআলার তকদীরের ফয়সালায় হস্তক্ষেপ করি এবং যা কিছু আল্লাহর এলমে স্থিরিকৃত হয়ে গেছে, তাতে পরিবর্তনের আবেদন করি। কিন্তু আমি আল্লাহ্তাআলার কাছে আবেদন করেছি যে, যেদিন সেই জালেম ও ফেরাউন জাহান্নামে পৌঁছবে (অর্থাৎ নিহত হবে), সেদিনকে যেন অন্য সকল দিনের উপর ফযিলত ও শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়, যাত সেদিনের সম্মান আমার আহলে-বায়ত শিয়াদের মধ্যে একটি সুন্নত (প্রথা) হয়ে যায়। এ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্তাআলা ওহী পাঠালেন যে, আমার এলমে এটা মীমাংসিত যে, আপনার আহলে-য়ায়তের অধিকার খর্বকারী মুনাফিকদের তরফ থেকে তারা নানারকম কষ্ট ও নির্যাতন ভোগ করবে। হে

মোহাম্মদ, আলীকে আপনার মর্তবা সেই সব কষ্টের বদৌলতেই দেওয়া হবে, যা তার অধিকার খর্বকারী এ উম্মতের ফেরাউনের পক্ষ থেকে সে ভোগ করবে। আমি সপ্ত আকাশের ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি যে, যেদিন সেই ফেরাউন নিহত হয়, সেদিন আহলে-বায়তের শিয়া ও শুভানুধ্যায়ীদের জন্য ঈদ উদযাপন করতে হবে। আমি বান্দাদের আমল লেখক ফেরেশতা কেরামান কাতেবীনকে আদেশ দিয়েছি যে, সেদিনের সম্মানে সেদিন থেকে তিন দিন পর পর্যন্ত গোনাহ্ লিপিবদ্ধ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। (কোন যিনাকার, মদ্যপায়ী, চোর ডাকাত ইত্যাদির গোনাহ্ লিখা যাবে না।) হে মোহাম্মদ, তিন দিন পর্যন্ত গোনাহের এই ব্যাপক ছুটি ও অনুমতি আপনার ও আপনার ভারপ্রাপ্তের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে দেওয়া হয়েছে। হে মোহাম্মদ, সেদিনকে আমি আপনার জন্যে, আপনার আহলে-বায়তের জন্যে এবং তাদের অনুসারী ও হিতাকাঙ্ক্ষীদের জন্যে ঈদের দিন সাব্যস্ত করেছি। আমার ইযযত ও প্রতাপের কসম, যে ব্যক্তি সেদিন ঈদ উদযাপন করবে,আমি তাকে আরশ প্রদক্ষিণকারী ফেরেশতাদের সমান ছোয়াব দান করব এবং তার আত্মীয়স্বজনের ব্যাপারে সুপারিশ কবুল করব। যদি সেদিন সে নিজের উপর ও পরিবার-পরিজনের উপর মুক্তহস্তে ব্যয় করে, তবে আমি তার ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করব। প্রতিবছর সেদিনের আগমনে আপনার শিয়াদের মধ্য থেকে হাজার হাজারকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে মুক্তি দিব, তাদের আমল কবুল করব এবং তাদের গোনাহ্ মার্জনা করব।

হুযায়ফা বলেনঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এসব কথা বলে উঠে গেলেন এবং উম্মে-সালমার গৃহে চলে গেলেন। তাঁর কাছে এসব কথা শুনে আমি ওমরের কুফর সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাসী হলাম। কোন সন্দেহই আর রইল না। অবশেষে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাতের পর আমি দেখে নিলাম যে, ওমর কি কি অনর্থ সৃষ্টি করেছে! সে তার ভিতরের কুফর প্রকাশ করে দিয়েছে, ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, ইমামত ও খেলাফত ছিনে নেওয়ার জন্যে নির্লজ্জ কাজকর্ম করেছে, কোরআনে পরিবর্তন করেছে, ওহী ও রেসালাতের গৃহে (অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্র বাসগৃহে) অগ্নি সংযোগ করেছে। ইহুদী, খৃশষ্টান ও অগ্নিপূজারীদেরকে খুশী করেছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চোখের মনি ফাতেমা যুহরা ও সকল আহলে-বায়তকে অসন্তুষ্ট করেছে, আমিরুল-মুমিনীনকে হত্যা করার চক্রান্ত করেছে, আল্লাহর হালাল করা বস্তু হারাম করেছে ও হারাম করা বস্তু হালাল করেছে এবং ফাতেমা যুহরার মুখমণ্ডল ও পেটের উপর দরজা নিক্ষেপ করেছে। অতঃপর হুযায়ফা আরও বলেনঃ এরপর আল্‌হ্‌তাআলা তাঁর মননীত পয়গাম্বর ও তাঁর কন্যার বদদোয়া এই মুনাফিকের ব্যাপারে কবুল করলেন এবং আবু লু'লু ইরানীর হাতে তাকে হত্যা করিয়ে দিলেন। তার হন্তার প্রতি আল্লাহর রহমত হোক।' (যাদুল-মায়াদ ৪৩৩-৪৩৬ পৃঃ)।

এ রেওয়ায়েত সম্পর্কে কিছু প্রয়োজনীয় ইঙ্গিতঃ

আগেই আরয করা হয়েছে যে, শিয়াদের নিজস্ব বর্ণনাগুলো খুঁজে বের করার উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ শিয়াবাদ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ সুন্নী আলেম ও সুধীবৃন্দকে শিয়া আকায়েদ, মতবাদ ও ইমামগণের রেওয়ায়েত সম্পর্কে অবহিত করা। এগুলো নিয়ে আলোচনা ও সমালোচনা এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় নয়। এতদসত্ত্বেও হযরত ফারুকে-আযম সম্পর্কিত এ রওয়ায়েতটি সম্পর্কে কয়েকটি

বিষয়ের প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমরা জরুরী মনে করি।

(১) রওয়ায়েত অনুযায়ী রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ৯ই রবিউল আউয়ালে ঈদ ও উৎসব পালন এবং এর ফযিলত সম্পর্কে এ বৈঠকে এত দীর্ঘ কথা বলেছেন, যার কেবল সারসংক্ষেপ পাঠকবর্গ পাঠ করেছেন। কিন্তু এই দীর্ঘ কথাবার্তার মধ্যে সেই জালেম, অপরাধী ও আহলে-বায়তের ফেরাউনের নাম কোথাও উচ্চারণ করেননি, যার ধ্বংসপ্রাপ্তির খুশীতে এই ঈদ উদযাপন করা হচ্ছিল। তিনি কেবল ইশারা ও ইঙ্গিত করেছেন। রেওয়ায়েতের ভূমিকায় আল্লামা মজলিসীর বর্ণনা দ্বারা এবং শেষাংশে রেওয়ায়েতের রাবী হুযায়ফা ইবনে এয়ামানের বর্ণনা দ্বারা জানা গেল যে, এসব কথাবার্তা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ওমর ইবনুল খাত্তাব সম্পর্কে বলেছিলেন। শিয়া দর্শন অনুযায়ী-এর কারণ একমাত্র এটাই হতে পারে যে, (নাউযুবিল্লাহ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওমর ইবনে খাত্তাবকে এত ভয় করতেন যে, নিজের গৃহেও তার বিরুদ্ধে কোন কথা বলার সময় তার নাম উচ্চারণ করতেন না,যাতে দেওয়ালও শুনতে না পারে। তাঁর এ কঠোর সাবধানতা যেন "দেওয়ালেরও কান আছে" কথার ভিত্তিতে ছিল। অথবা তিনি হুযায়ফা ইবনে এয়ামানের ব্যাপারেই আশংকা করতেন যে, সেই না আবার একথা ওমরের কানে পৌছে দেয়! এ ভয়ের কারণেই প্রায় বিশ বছর কাল সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও কখনও তিনি ইঙ্গিতেও ওমরকে বলেননি যে, তুমি এমন, তুমি ওমন। বরং তিনি তাকে একজন বিশ্বস্ত সহচর রূপে সঙ্গে রাখেন। শিয়াদের মতে তিনি যেন নবুওয়তের শুরু থেকে ওফাত পর্যন্ত এ সম্পর্কে তাকিয়্যা করতে থাকেন এবং নিজের এই কর্মপন্থা সম্পর্কে নিজের উম্মতকেও ধোকায় ফেলে রাখেন। (আস্তাগফেরুল্লাহ...)।

(২) রেওয়ায়েত অনুযায়ী বান্দাদের আমল লিপিবদ্ধকারক ফেরেস্তাগণকে স্বয়ং আল্লাহ্ আদেশ দিয়েছিলেন যে, ৯ই রবিউল আউয়াল থেকে পরবর্তী তিন দিন পর্যন্ত গোনাহ্কারীদের গোনাহ্ লিখা যাবে না। (বলাবাহুল্য, এই সুবিধা ও স্বাধীনতা কেবল শিয়া মুমিনদের জন্যেই হবে।) চিন্তা করুন এবং খুঁজে দেখুন, জগতের কোন ধর্মে চুরি, ডাকাতি, অন্যায় হত্যা, যেনা ও ধর্ষণের মত গোনাহের জন্যে এ ধরনের ছুটি ও স্বাধীনতার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে কি? আমাদের মতে এ রেওয়ায়েত অনুযায়ী এটা কেবল শিয়া মযহাবে আছে— তাও ওমর ইবনুল খাত্তাবের হতযাযজ্ঞের খুশীতে।

(৩) রেওয়ায়েত অনুযায়ী ৯ই রবিউল আউয়ালে ঈদ উদযাপনকারী শিয়াদেরকে আরশ প্রদক্ষিণকারী ফেরেশতাদের সমান ছোয়ার দেওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে। বলাবাহুল্য পুরাপুরিভাবে ঈদ ও উৎসব পালন এভাবেই হবে যে, এই ঈদের দিনের জন্যে আল্লাহ্র তরফ থেকে প্রাপ্ত গোনাহের স্বাধীনতা দ্বারা ভরপুর কায়দা লুটতে হবে। (নাউযুবিল্লা) আল্লাহ ও রসূলের পক্ষ থেকে যেন শিয়াদেরকে ব্যাপক আমন্ত্রণ যে, ওমর হত্যা স্মৃতির খুশীতে প্রতিবছর ৯, ১০ ও ১১ই রবিউল-আউয়ালে মনের খাহেশ অনুযায়ী সর্বপ্রকার গোনাহ্ কর, মনে যেন কোন আফসোস বাকী না থাকে, প্রত্যেক মনস্কামনা পূর্ণ করে নাও এবং আরশ প্রদক্ষিণকারী ফেরেশতাগণের সমান ছোয়াব অর্জন কর।

(৪) রেওয়ায়েতে হুযায়ফা ইবনে ইয়ামানের মুখ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, তিনি ওমর-হন্তা আবু লু'লু' ইরানী অগ্নি পূজারীর জন্যে দোয়া করে বলেছেন— আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন।

আমরা শিয়া মযহাব, তার ভিত্তি ও তার ইমামগণের রেওয়ায়েত সম্পর্কে অনবহিত ব্যক্তিবর্গকে ওয়াকিফহাল করার লক্ষ্যে "কুফর উদ্ধৃত করা কুফর নয়"— কথাটিকে সামনে রেখে এই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছি। কিন্তু এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই যে, এই প্রলাপোক্তি সম রেওয়ায়েতটি আদ্যোপান্ত আল্লাহ্‌তাআলা, তাঁর রসূলে পাক (সাঃ) এবং তাঁর নৈকট্যশীল ও আস্থাভাজন ছাহাবী হযরত হুযায়ফা ইবন এয়ামানের বিরুদ্ধেই নয় ; বরং হাসান আসকারী ও তার শ্রদ্ধেয় পিতা আলী নকীর বিরুদ্ধেও জঘন্য মিথ্যাচার ও অপবাদ বৈ নয়। আহলে-বায়তের এই বুযুর্গগণের আঁচল এসব প্রলাপোক্তির আবর্জনা থেকে নিশ্চিতই পাক ও পবিত্র।

এসব প্রলাপোক্তি যে নিছক মিথ্যাচার, তার উজ্জ্বল প্রমাণ উম্মে-কুলছুমের বিবাহ ঃ

মজলিসীর যাদুল-মায়াদের এই রেওয়ায়েত এবং হযরত ফারুকে আযমের সত্যিকার মুমিন হওয়ার বিপক্ষে এধরনের সকল রেওয়ায়েত যে নিছক মিথ্যাচার ও কল্পিত অপবাদ, তার শত শত যুক্তিগত ও ইতিহাসগত প্রমাণ রয়েছে। এসব প্রমাণের মধ্যে আমার মতে সর্বাধিক উজ্জ্বল হচ্ছে এই প্রমাণ যে, হযরত আলী মুর্তযা তাঁর কন্যা উম্মে-কুলছুমকে হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালেই তাঁর সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন এবং উম্মে কুলছুম খফিলার পত্নীরূপে তাঁর গৃহে বসবাস করেছিলেন। তাঁর গর্ভ থেকে হযরত ওমরের একজন পুত্র সন্তানও জন্মগ্রহণ করেছিল। যার নাম ছিল যায়েদ। এই উম্মে কুলছুম শিয়া ইতিহাসবিদদের বর্ণনা অনুযীও ছাইয়েদা ফাতেমা যুহরা (রাঃ)-এর গর্ভ থেকে তাঁর প্রথমা কন্যা ছিলেন[১]।

এই বিবাহের ঘটনা দ্বারা দু'টি বিষয় জাজ্বল্যমানরূপে প্রমাণিত হয়।

(১) হযরত আলী মুর্তযার মতে হযরত ওমর সত্যিকার মুমিন ছিলেন এবং তার ও সাইয়েদা ফাতেমা যুহরার কলিজার টুকরা এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দৌহিত্রীর বিবাহ তাঁর সাথে দেওয়ার যোগ্য ছিলেন। হযরত আলী মুর্তযা সম্পর্কে এটা কল্পনাও করাযায় না যে, তিনি তাঁর কন্যার বিবাহ এমন এক ব্যক্তির সাথে করবেন,যাকে তিনি সত্যিকার মুমিন, আল্লাহ্ ও রসূলের অনুগত এবং আল্লাহ্র দরবারে প্রিয় মনে করেন না ; বরং (নাউযুবিল্লাহ্) মুনাফিক এবং আল্লাহ্ ও রসূলের দুশমন মনে করেন।

(২) এ বিবাহ দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেল যে, হযরত আলী মুর্তযা ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর মধ্যে এমন সম্পর্ক, ভালবাসা ও সম্প্রীতি ছিল, যার ভিত্তিতে এই মোবারক আত্মীয়তা স্থাপিত হয়েছিল।

মোটকথা শিয়া গ্রন্থাবলীর শত শত রেওয়ায়েতে হযরত ওমর (রাঃ)-কে (নাউযুবিল্লাহ)

---

(১) জনৈক ইরানী শিয়া তার تاریخ طرازمذهب شیعه গ্রন্থে হযরত ওমরের সাথে উম্মে কুলছুমের বিবাহ বর্ণনা করার জন্যে স্বতন্ত্র অধ্যায় কায়েম করেছেন। যা ৪৭ পৃষ্ঠা থেকে শুরু হয়ে ৬৭ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হয়েছে। এ অধ্যায়ের একটি বাক্য এই ঃ

ام کلثوم کبری دخترفاطمه زهراءدرسرائی عمربن خطاب بودوازوی فرزندبیادرد

ফাতেমা যুহরার কন্যা উম্মে কুলছুম কুবরা ওমর ইবনে খাত্তাবের গৃহে ছিলেন। তার ঔরস থেকে তার সন্তান ছিল।

মুনাফিক এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর আহলে-বায়তের দুশমনরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে অনেক রেওয়ায়েতে হযরত আলী মুর্তযা ও হযরত ওমরের মধ্যে চরম শক্রতা দেখানো হয়েছে এবং হযরত ফাতেমা যুহরার কাছে পর্যন্ত হযরত ওমরের অত্যাচার কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু উপরোক্ত বিবাহের ঘটনা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, এগুলো সব সেই লোকদের কল্পিত বানোয়াট কাহিনী, যারা ইবনে সাবার আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে জন্মলাভ করতে থাকে। সেই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল ইসলামের ধ্বংস সাধন এবং মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে তাদের শক্তি খতম করা। এটা আল্লামুল গুয়ুব (অদৃশ্য জ্ঞানী) আল্লাহতাআলার মহান প্রজ্ঞার লীলা যে, তিনি এই আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করিয়ে সেইসব বাজে কাহিনীর স্বরূপ প্রকাশ করে দিয়েছেন যেগুলো দ্বারা শিয়াদের গ্রন্থাবলী পরিপূর্ণ এবং যার উপর ভিত্তি করে শিয়া মযহাবের প্রাচীর নির্মিত হয়েছে।

উম্মে কুলছুমের বিবাহ এবং শিয়া আলেম ও গ্রন্থকারঃ

আমি জানি শিয়া আলেম, মুজতাহিদ ও গ্রন্থাকারগণ এ বিবাহ সম্পর্কে কি কি বলেছে, লিখেছে এবং এর কেমন কেমন অদ্ভুত, অত্যাশ্চর্য ও হাস্যকর ব্যাখ্যা করেছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, যখন দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর আমিরুল মুমিনীনের উপর তাঁর কন্যা উম্মে কুলছুমকে তার বিবাহ দেওয়ার জন্যে তীব্র চাপ সৃষ্টি করলেন এবং কঠোর হুমকিও দিলেন, তখন আমিরুল মুমিনীন তার অলৌকিক শক্তি বলে এক শিশুকে তার কন্যা উম্মে কুলছুমের আকৃতিতে পরিবর্তন করে দিলেন এবং তাকেই তার কন্যা উম্মে কুলছুম বলে ওমর ইবনুল খাত্তাবের বিবাহে দিয়ে দিলেন। সেই খলিফকার পত্নী হয়ে তার গৃহে থাকে। আসল উম্মে কুলছুমল যিনি আমিরুল মুমিনীন ও সাইয়েদা ফাতেমা যুহরার কন্যা ছিলেন—তার সাথে ওমর ইবনুল খাত্তাবের বিবাহ হয়নি।[১] কোন কোন গ্রন্থকার এমনও প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছে যে, এ বিবাহের সকল রেওয়ায়েত অবিশ্বাসযোগ্য। বিবাহের ঘটনা ঘটেইনি।[১]

সত্য বলতে কি, উম্মে কুলছুমের বিবাহের এ ঘটনা শিয়াদের জন্যে এক মহাবিপদ। কেননা, একা এই বিবাহের ঘটনা দ্বারা শিয়া মযহাবের সমগ্র প্রসাদ ভূমিসাৎ হয়ে যায়। কিন্তু এ ধরনের আলোচনা এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের বাইরে বিধায় আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করব না। পাঠকবর্গের মধ্যে যারা এ বিষয়ে বিস্তারিত অধ্যয়ন করতে চান, তারা নওয়াব মুহসিনুল মুলক মরহুমের আয়াতে বাইয়েনাতের' প্রথম খণ্ডে এ বিবাহের আলোচনা দেখে নিন। বিজ্ঞ লেখক পুস্তিকাটিতে চূড়ান্ত অনুসন্ধান ও গবেষণার প্রমাণ পেশ করেছেন[১] এবং শিয়া সম্প্রদায়কে পুরাপুরি জব্দ করে দিয়েছেন।

---

(১) এই অদ্ভুত হাস্যকর দাবী শিয়াদের কুতুবুল আক্তাব কুতুবুদ্দীন রাওন্দী সাহেব করেছেন এবং তাদের মুজতাহিদে আযম দীদার আলী মাওয়ায়েনে হুসাইনিয়া গ্রন্থে এটি সবিস্তারে লিখেছেন। (আয়াতে বাইয়্যেনাত, ১ম খণড ১৭৬ পৃঃ)

(২) এইরূপ মতামত শিয়াদের অন্য একজনমুজতাহিদে আযম সাইয়েদ মোহাম্মদ ব্যক্ত করেছেন। (আয়াতে বাইয়্যোনাত, ১ম খণ্ড, ১৩৮ পৃঃ)

আমরা এখানে কেবল শিয়াদের মতে বিশুদ্ধতম গ্রন্থ কুলাইনীর الجامع الكافي থেকে এ. বিবাহ সম্পর্কে একটি রেয়ায়েত উদ্ধৃত করব। এতে এ বিবাহ সম্পর্কে ইমাম জাফর ছাদেকের বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে। যদ্বারা প্রমাণিত হয়যে, এ বিবাহ নিশ্চিতই হয়েছে এবং হযরত আলী মুর্তযা ও সাইয়েদা ফাতেমা যুহরার কন্যা উম্মে কুলছুমের সাথেই হয়েছে। কিন্তু শিয়া আকীদা অনুযায়ী হযরত ওমরকে মুনাফিক কাফের ও আল্লাহ ও রসূলের দুশমন মেনে নেওয়ার ভিত্তিতে এ বিবাহের ব্যাপারে যে ওযর ও কারণ ইমাম জাফর ছাদেক থেকে বর্ণনা কর হয়েছে, তা চরম লজ্জাজনক। এতে স্বয়ং হযরত আলী মুর্তযা এবং ইমাম হাসান ও হুসায়নের ব্যক্তিত্বও শোচনীয়রূপে ক্ষত-বিক্ষত হয় এবং তাদের উপর এমন অপবাদ উঠে যে, এরচেয়ে অধিক লজ্জাজনক অপবাদ চিন্তাও করা যায় না।

শিয়াদের মুহাদ্দিসকুল শিরোমনি আবু জাফর এয়াকুব কুলাইনীর ফুরুয়ে কাফী দ্বিতীয় খণ্ডে এ বিবাহ সম্পর্কিত একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় আছে, যার শিরোনাম— باب فى تزويج ام كلثوم (উম্মে কুলছুমের বিবাহ প্রদান অধ্যায়)। অধ্যায়ে ইমাম জাফর ছাদেকের বিশেষ শিয়া রাবী যুররাহ্ থেকে অধ্যায়ের প্রথম রেওয়ায়েত এইঃ—

عن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام فى تزويج ام كلثوم فقال ان ذلك فرج غصبناه

পাঠকবর্গের মধ্যেযারা আরবী জানেন, তাদের বুঝে নিতে বাকী নেই যে, ইমাম জাফর ছাদেকের উক্তি বলে কথিত যুরারা বর্ণিত ان ذلك فرج غصبناه বাক্যটি কতটুকু নির্লজ্জা হও অশ্লীল, যা কোন সম্ভ্রান্ত ব্যকিত্র মুখ দিয়ে উচ্চারিত হতে পারে না। পক্ষান্তরে যারা আরবী জানেন না, তাদের জন্যে সাদামাটা ভাষায় এর অনুবাদ করার পথে লজ্জা ও ভদ্রতা অন্তরায় হয়। তবুও যতদূর সম্ভব মার্জিত ও উপযুক্ত ভাষায় আরয করা হচ্ছে যে, এ বাক্যের অর্থ এই ও ওমর ইবনুল খাত্তাবের সাথে উম্মে কুলছুমের বিবাহ শরীয়তের আইন অনুযায়ী পিতা ও অভিভাবক হযরত আলীর এবং স্বয়ং উম্মে কুলছুমের সম্মতিক্রমে হয়নি ; বরং (নাউযুবিল্লাহ) ওমর ইবনুল খাত্তাব তার খেলাফত আমলে তাকে জবরদস্তি হযরত আলীর কাছ থেকে ছিনতাই করে অপন গৃহে পত্নী করে রাখেন ; অর্থাৎ যা হয়েছে বলপূর্বক হয়েছে।

সত্য এই যে, ফারুকে আযমের সাথে সাইয়েদা উম্মে কুলছুমের বিবাহ এমন একটি ঘটনা, যদ্বারা হযরত আলী মুর্তুযা ও ফারুকে আযমের মধ্যে মহব্বত ও সম্প্রীতি থাকা এবং ফারুকে আযমের খাঁটি মুমিন হওয়া দিবালোকের মত প্রমাণিত হয়ে যায় এবং একা একটি ঘটনা দ্বারাই শিয়া মযহাবের সম্পূর্ণ দালান ধ্বসে পড়ে। তাই শিয়া মযহাবের অন্যতম বিশেষ স্থপতি এবং শিয়া রেওয়ায়েতসমূহের সিংহভাগের রাবী যুরারা এ দালানকে ধ্বসে পড়ার কবল থেকে রক্ষা করার জন্যে ইমাম জাফর সাদেকের তরফ থেকে গড়ে শিয়াদেরকে এ হাদীস শুনিয়ে দিয়েছে।

(১) নওয়াব মুহসিনুলমুলক শিয়া পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, লালিত-পালিত হন এবং শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর "আয়াতে বাইয়েনাত" গ্রন্থটি জ্ঞান গরিমায় তাঁর উচ্চ মর্যাদার প্রতীক। তিনি প্রথমে শিয়াই ছিলেন, অতঃপর ব্যক্তিগত অধ্যয়ন দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, আহলে সুন্নতের মযহাবই সত্য। সেমত তিনি এ মযহাবই অবলম্বন করে নেন। ফলে তিনি শিয়া পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন এবং অনেক সমস্যা ও দুঃখকষ্টের সম্মুখীন হন। এরপর তিনি শিয়াদের হেদায়াত করার জন্য "আয়াতে বাইয়েনাত" এ গ্রন্থটি রচনা করেন, যা বাস্তবে শিয়াদেরকে পূর্ণরূপে জব্দ করে দিয়েছে। হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে এ গ্রন্থটি রচিত হয় এবং প্রথমবার ১৩০১ হিজরীতে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়।

যুরারা জানত যে, এ বিবাহ হয়েছে এবং উম্মে কুলছুম ফারুকে আযমের সম্মানিতা পত্নীরূপে তাঁর শাহাদত বরণ পর্যন্ত তাঁর গৃহে অবস্থান করেছেন। তাঁর গর্ভ থেকে ফারুকে আযমের একজন পুত্র সন্তানও জন্মগ্রহণ করেছিল। তাই যুরারা এ বিবাহ অস্বীকার করতে পারতনা। সে মনগড়া হাসীদটি শুনিয়ে এর ব্যাখ্যা ও কারণ ইমাম জাফর ছদেকের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে বর্ণনা করেছে যে, এ বিবাহ শরীয়তের আইন অনুযায়ী পারস্পরিক সম্মতিক্রমে হয়নি; বরং (নাউযুবিল্লাহ্) উম্মে কুলছুমকে জোরে-জবরে ছিনতাই করে গৃহে রেখে দিয়েছিল। জালেম যুরারা একথা চিন্তা করেনি যে, এর ফলশ্রুতিতে হযরত আলী মুর্তযার উপর কতবড় কলঙ্ক আরোপিত হয়। কেননা তাঁর ও সাইয়েদা ফাতেমা যুহরার কন্যা, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দৌহিত্রী উম্মে কুলছুমকে যুরারা ও শিয়াদের বিশ্বাস অনুযায়ী জনৈক কাফের, মুনাফিক ও এ উম্মতের ফেরাউন ব্যক্তি অবৈধভাবে জবরদস্তি ছিনতাই করে পত্নী বানিয়ে নিজগৃহে রেখেছিল, আর তিনি কোন বাধা দিলেন না। অথচ তিনি স্বভাবগতভাবে আদর্শ শক্তিমান ও বীর ছিলেন, যে কারণে তাঁকে আসাদুল্লাহ বা ----   আল্লাহর সিংহ বলা হত। তাঁর কাছে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর তরবারি "সুলফাকার" ছিল, মুসার লাঠি ছিল, যা অজগর হয়ে যে, যুবক পুত্রদ্বয় হাসান ও হুসায়ন ছিলেন, এছাড়া সহযোগিতার জন্যে তাঁর গোত্র বনী-হাশেম ছিল এবং এধরনের ব্যাপারে প্রত্যক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁর সাথে থাকত। এসব বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এতে সন্দেহ থাকে না যে, এ বিবাহ সম্পর্কে উল্লেখিত অশ্লীল ----   বাক্যটি কিছুতেই ইমাম জাফর ছাদেকের উক্তি নয়। এটা তাঁর বিরুদ্ধে যুরারা জঘন্য মিথ্যাচার। পক্ষান্তরে সত্য এটাই যে, হযরত আলী মুর্তযা (রাঃ) তাঁর কন্যা উম্মে কুলছুমকে ফারুকে আযমের বিবাহে দিয়েছিলেন। এটা এ বিষয়ের উজ্জ্বল প্রমাণ যে, তিনি ফারুকে আযমকে সত্যিকার মুমিন, ন্যায়বান খলিফা, আল্লাহর প্রিয় এবং বিবাহের যোগ্য পাত্র মনে করতেন; যেমন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত আলী ও হযরত ওছমানকে যোগ্য পাত্র মনে করে আপন কন্যাদ্বয়কে সম্প্রদান করেছিলেন।

সংক্ষেপ করণের ইচ্ছা সত্ত্বেও ফারুকে আযম সম্পর্কিত যাদুল-মায়াদের রেওয়ায়েতের পর আলোচনা দীর্ঘ হয়ে গেছে। এখন মনের উপর জোর দিয়ে শায়খায়ন সম্পর্কিত আরও একটি রেওয়ায়েত পড়ে নিন।

অন্তর্হিত ইমাম যখন আত্মপ্রকাশ করবেন, তখন শায়খায়নকে কবর থেকে বের করবেন এবং হাজারো বার শূলীতে চড়াবেনঃ

আল্লামা বাকের মজলিসীরই অপর একটি গ্রন্থ হচ্ছে "হক্কুল ইয়াকীন।" এটিও ফারসী ভাষায় একটি বিরাটাকার গ্রন্থ। খোমেনী তার কাশফুল-আসরার গ্রন্থে মজলিসীর সকল ফারসী রচনাবলীর প্রশংসা করে এগুলো অধ্যয়নের পরামর্শ দিয়েছেন; বিশেষভাবে হক্কুল ইয়াকীনের উদ্ধৃতি নিজের এক দাবীর স্বপক্ষে পেশ করেছেন। এ হক্কুল ইয়াকীন গ্রন্থেই মজলিসী শিয়াদের বিশেষ আকীদা "রাজআতে"'র বর্ণনায় ইমাম জাফর ছাদেকের বিশেষ মুরিদ মুফাস্সাল ইবনে

ওমর থেকে একটি দীর্ঘ রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। এতে ইমাম জাফর ছাদেকের বাচনিক অন্তর্হিত ইমাম মেহদীর আত্মপ্রকাশ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। রেওয়ায়েতে মুফাসসাল প্রশ্ন করে এবং ইমাম জাফর ছাদেক তার জওয়াব দেন। উদ্ধৃত এসব বক্তব্যে (নাউযুবিল্লাহ) শায়খায়নকে কবর থেকে বের করে সারাবিশ্বের পাপীদের পাপের শাস্তিতে প্রত্যহ হাজারো বার শূলীতে চড়ানোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সত্য বলতে কি, এসব বাজে বিষয়ের অধ্যয়নও কঠিন কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু শিয়াবাদের স্বরূপ এবং শিয়া মানসিকতা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করানোর জন্যে মনের উপর জোর চালিয়ে এগুলো লিপিবদ্ধ করা হচ্ছেঃ

রেওয়ায়েতে আছে যে, ইমাম জাফর ছাদেক বলেন— যখন ছাহেবুল-আমর (অন্তর্হিত ইমাম) আত্মপ্রকাশ করবেন, তখন প্রথমে মক্কা মুয়াযযমা যাবেন এবং সেখানে এটা করবেন, ওটা করবেন। এর পর পাঠকবর্গ রেওয়াতের তরজমা দেখুনঃ

মুফাসসাল ইমাম জাফর ছাদেকের খেদমতে আরয করলঃ হে আমার প্রভু, ছাহেবুল-আমর (ইমাম মেহেদী) মক্কা মোয়াযযমার পরে কোথায় যাবেন? ইমাম বললেনঃ আমাদের নানা রসূলে খোদার শহর মদীনা যাবেন। সেখানে একটি আশ্চর্য বিষয় প্রকাশ পাবে যা মুমিনদের জন্যে আনন্দ ও প্রফুল্ল তার এবং কাফের ও মুনাফিকদের জন্য অবমাননা ও লাঞ্ছনার কারণ হবে। মুফাসসাল, জিজ্ঞেস করলঃ সেই আশ্চর্য বিষয়টি কি? ইমাম বললেনঃ যখন তিনি তাঁর নানা রসূলে খোদার কবরের কাছে পৌঁছবেন, তখন সেখানকার লোকদেরকে জিজ্ঞেস করবেনঃ বল, এটা কি আমাদের নানা রসূলে খোদার কবর? লোকেরা বলবেঃ হ্যাঁ, এটা তাঁরই কবর। অতঃপর ইমাম জিজ্ঞাস করবেনঃ এরা কারা, যাদেরকে আমাদের নানার পার্শ্বে করব দেওয়া হয়েছে? লোকেরা বলবেঃ এরা তাঁর বিশিষ্ট অনুসারী আবুবকর ও ওমর। হযরত ছাহেবুল আমর তাঁর পরিকল্পিত নীতি অনুযায়ী (সবকিছু জানা সত্ত্বেও) লোকদেরকে জিজ্ঞেস করবেনঃ আবুবকর কে ছিল? ওমর কে ছিল? কোন্ বৈশিষ্ট্যের কারণে তাদের উভয়কে আমাদের নানার সাথে দাফন করা হয়েছে? লোকেরা বলবেঃ তারা উভয়েই তাঁর খলিফা এবং শ্বশুর ছিলেন। এরপর ছাহেবুল-আমর বলবেনঃ তারা উভয়ই এখানে সমাহিত আছে— এ ব্যাপারে সন্দেহকারী কোন ব্যক্তি আছে কি? লোকেরা বলবেঃ এমন কোন ব্যক্তি নেই, যার এ ব্যাপারে সন্দেহ আছে। সকলেই নিশ্চিতরূপে জানে যে, রসূলে খোদার (সাঃ) পাশে এ দু'জনই সমাহিত আছেন।

এর তিন দিন পর ছাহেবুল আমর কবরের প্রাচীর ভেঙ্গে উভয়কে কবর থেকে বের করার আদেশ দিবেন। সে মতে উভয়কে কবর থেকে বের করা হবে। তদের দেহ টাটকা হবে এবং পশমের সেই কাফন হবে, যাতে তাদেরকে দাফন করা হয়েছিল। এরপর আদেশ হবে— তাদের কাফন আলাদা করে ফেল (এবং তাদের লাশ উলঙ্গ করে দাও)। এরপর একটি সম্পূর্ণ শুষ্ক বৃক্ষে ঝুলিয়ে দাও। তখন মানুনষের পরীক্ষার জন্যে একটি আশ্চর্য ঘটনা প্রকাশ পাবে— যে বৃক্ষে তাদের লাশ ঝুলানো হবে, সেটা অকস্মাৎ সবুজ সজীব হয়ে যাবে। তাজা সবুজ পল্লব বের হয়ে আসবে এবং ডাল বৃদ্ধি পাবে ও উঁচু হবে। তখন যারা তাঁদেরকে মহব্বত করত এবং মানত তারা (অর্থাৎ সুন্নীরা) বলবেঃ আল্লাহ্র কসম, এটা তাঁদের আল্লাহর কাছে প্রিয় হওয়ার

ও মহৎ হওয়ার প্রমাণে। তাদেরকে মহব্বত করার কারণ আমরা নাজাতের যোগ্য হব। যখন শুষ্ক বৃক্ষে ভাবে সজীব হয়ে যাওয়ার সংবাদ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে, তখন যাদের অন্তরে তাদের প্রতি বিন্দুমাত্রও মহব্বত থাকবে, তারা এ বৃক্ষ দেখার জন্যে দূর-দুরান্ত থেকে মদীনায় জড়ো হবে। তখন ছাহেবুল-আমরের পক্ষ থেকে জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবে যে, যারা আবু বকর ও ওমরের প্রতি মহব্বত রাখে, তারা যেন একদিকে আলাদা দণ্ডায়মান হয়। এ ঘোষণার পর লোকজন দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে। এক ভাগ হবে তাদের প্রতি মহব্বত পোষণকারীদের এবং অপর ভাগ হবে তাদের প্রতি অভিসম্পাতকারীদের। এরপর ছাহেবুল আমর তাদের প্রতি মহব্বত পোষণকারী অর্থাৎ সুন্নীদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন ঃ তোমরা আবু বকর ও ওমরের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ কর। যদি না কর, তবে এক্ষণি তোমাদের উপর আযাব আসবে। তারা জাওয়াব দিবে ঃ যখন আমরা পূর্ণরূপে জানতাম না যে, তারা আল্লাহতায়ালার প্রিয় বান্দা, তখনও আমরা তাদের প্রতি অসন্তুষ্টিমূলক আচরণ করিনি। এখন আমরা তাঁরা যে আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা, এ বিষয়ের আলামত স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি। এমতাবস্থায় তাঁদের প্রতি অসন্তুষ্টি কিরূপে প্রকাশ করতে পারি ? বরং আমরা তোমার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছি তাদের প্রতিও যারা তোমার প্রতি ঈমান এনেছে এবং তোমার কথায় এই বুযুর্গদ্বয়কে কবর থেকে বের করে তঁদের সাথে অবমাননা কর আচরণ করেছে। তাদের এই জওয়াব শুনে ইমাম মেহদী তাদেরকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্যে কালবৈশাখী ঝড়কে আদেশ দিবেন। অতঃপর ইমাম মেহদী তাদের উভয়ের লাশকে বৃক্ষ থেকে নামিয়ে আনার আদেশ দিবেন এবং আল্লাহ্র কুদরতে উভয়কে জীবিত করবেন। এবং সকল মানুষকে একত্রিত হওয়ার আদেশ দিবেন। অতঃপর পৃথিবীর সূচনা থেকে লয় পর্যন্ত যত জুলুম হয়েছে এবং যত কুফর হয়েছে, সবগুলোর গোনাহ্ তাদের দু'জনের উপর অপরিহার্য করে দেওয়া হবে এবং তাদেরকেই এজন্যে দায়ী সাব্যস্ত করা হবে। (বিশেষতঃ) সালমান কারেসীকে প্রহার করা, আমিরুল মুমিনীন, ফাতেমা যুহরা এবং হাসান ও হুসায়নকে পুড়িয়ে মারার জন্যে তাদের গৃহের দরজায় অগ্নি সংযোগ করা, ইমাম হাসানকে বিষ দেওয়া, হুসায়ন, তার শিশু সন্তান, চাচাত ভাই তাঁর সঙ্গী ও সাহায্যকারীদেরকে কারালায় হত্যা করা, রসূলে খোদার আওলাদকে বন্দী করা, প্রতি যুগে মোহাম্মদের (সাঃ) বংশধরকে খুন করা, এছাড়া যত অন্যায় হত্যা করা হয়েছে, কোন মহিলার সাথে যেখানেই যিনা করা হয়েছে, যে সুদ অথবা হারাম মাল ভক্ষণ করা হয়েছে, যত গোনাহ, জুলুম ও অন্যায় অন্তর্হিত ইমাম মেহদীর আত্মপ্রকাশ পর্যন্ত করা হয়েছে—সবগুলো এই দু'জনের সামনে উল্লেখ করা হবে এবং জিজ্ঞাসা করা হবে যে, এই সবগুলো তোমাদের দ্বারা এবং তোমাদের কারণে হয়েছে? তারা স্বীকার করবে (যে, হাঁ, আমাদের কারণেই হয়েছে)। কেননা, যদি (রসূলে খোদার ওফাতের পরে) প্রথম দিনই সত্য খলিফার (আলীর) অধিকার এই দু'জনে মিলে ছিনিয়ে না নিত তবে এসব গোনাহের মধ্যে একটিও হতনা। এরপর ছাহেবুল আমর আদেশ করবেন—যারা উপস্থিত আছ, তরা এ দু'জনের কাছ থেকে কেছাছ (হত্যার বিনিময়ে হত্যা) গ্রহণ কর এবং তাদেরকে শাস্তি দাও। এরপর ছাহেবুল আমর তাদেরকে বৃক্ষে লটকিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিবেন। তিনি অগ্নিকে বলবেন যে, মাটি থেকে বের হয়ে এ দু'জনকে বৃক্ষসহ পুড়িয়ে ভস্ম করে দাও। বায়ুকে বলবেন যে, তাদের ছাই ভস্মকে সমুদ্রে ছিটিয়ে দাও।

মুফাসসাল আরয করল ঃ হে, আমার প্রভু, এটা কি তাদের সর্বশেষ আযাব হবে ? ইমাম জাফর ছাদেক বললেন ঃ মুফাসসাল, কখনই নয়। আল্লাহর কসম, সাইয়েদে আকবর মোহাম্মদ (সাঃ), ছিদ্দীকে আকবর আমিরুল মুমিনীন (আলী), সাইয়েদা ফাতেমা যুহরা, হাসান মুজতবা, হুসায়ন, শহীদে কারবালা এবং নিষ্পাপ ইমামগণ সকলেই জীবিত হবেন। আর যারা খাঁটি মুমিন হবে এবং খাঁটি কাফের হবে, সকলকে জীবিত করা হবে। সকল ইমাম ও সকল মুমিনের হিসাবে তাদের দু'জনকে আযাব দেওয়া হবে। এমনকি, দিবারাত্রির মধ্যে তাদেরকে হাজার বার হত্যা করা হবে এবং জীবিত করা হবে। এরপর আল্লাহ যেখানে ইচ্ছা করবেন, তাদেরকে নিয়ে যাবেন এবং আযাব দিতে থাকবেন।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পত্নীগণের শানে—

প্রথম দুই খলিফা তাঁদের সহচরবৃন্দ ওঅন্য প্রধান প্রধান ছাহাবীগণ সম্পর্কিত যে সকল শিয়া রেওয়ায়েত এ পর্যন্ত পাঠকবর্গ পাঠ করেছেন, তা একথা জানার জন্যে যথেষ্ট যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দাওয়াতের শুরু থেকে সাড়াদানকারী, ধর্মপথের হাজারো বিপদাপদে তাঁকে সঙ্গদানকারী এবং এ পথে নিজেদের যথাসর্বস্ব উৎসর্গকারী পূর্ববর্তীগণ সম্পর্কে শিয়াদের আকীদা ও আচরণ কি ? এখন আমরা রসূলে পাক (সাঃ)-এর পবিত্র পত্নীগণ এবং সাধারণ ছাহাবায়ে-কেরাম সম্পর্কে আরও দু'একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে এ বিষয়বস্তু খতম করতে চাই।

কোরআন মজীদে সূরা আহযাবের শুরুতেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে মুমিনদের সম্পর্ক বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُه اُمَّهَاتُهُمْ

এ আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পবিত্র পত্নীগণকে মুমিনদের জননী বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এর অর্থ এই যে, ঈমানদারদের অন্তরে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সম্পর্কের কারণে তাঁর পত্নীগণের এমন মাহাত্ম্য থাকা উচিত, যা জননীদের হয়ে থাকে এবং তদনুযায়ীই শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের আচরণ হওয়া উচিত। ঈমানের সম্পর্কের কারণে তাঁরা ঈমানদারদের জননী, যা রক্তের সম্পর্কের চেয়ে অনেক বেশী শ্রদ্ধার যোগ্য। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পত্নীগণের মধ্যে হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ) ও হযরত হাফছা (রাঃ) হযরত আবু বকর ছিদ্দীক ও ওমর ফারুক (রাঃ)-এর কন্যা ছিলেন বিধায় তাঁদের সাথেও শিয়াদের সেই শত্রুতা, যা তাঁদের পিতাদের সাথে রয়েছে। শিয়াদের রেওয়ায়েতসমূহে এ দু'জন পবিত্র জননীর জন্যে অকাতরে মুনাফিকা, কাফেরা ইত্যাদি অশোভন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং তাঁদের প্রতি সংগীন অপবাদ আরোপ করা হয়েছে। এটা এ বিষয়ের প্রমাণ যে, যারা এসব রেওয়ায়েত তৈরী করেছে এবং বর্ণনা করেছে, তারা ঈমান থেকেই নয়, বরং মানবতা এবং মানবতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য জ্ঞানবুদ্ধি থেকেও বঞ্চিত।

(নাউযুবিল্লাহ), হযরত আয়েশা ও হযরত হাফছা মুনাফিকা ছিলেন, তাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে বিষ দিয়ে খতম করেছেনঃ

সেই আল্লামা মজলিসীরই তৃতীয় একটি গ্রন্থ হচ্ছে "হায়াতুল-কুলুব"। এটা তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রচনা। এর দ্বিতীয় খণ্ডের ৭৪২ পৃষ্ঠায় একটি অধ্যায়ের শিরোনামঃ دربیان احوال شقاوت مأل عائشه وحفصه অর্থাৎ আয়েশা ও হাফছার নৃশংসতার বর্ণানা।

এ অধ্যায়ে এবং অন্যা্য অধ্যায়েও মজলি এ দু'ই উম্মুল মুমিনীনকে বারবার মুনাফকা লিখিছেন। এরপর এ খণ্ডেই পরে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ওফাতের বর্ণনায় লিখিছেনঃ

وعیاشی بسند معتبرازحضرت صادق روایت کرده‌است که عائشه وحفصه آنحضرترابزهر شهیدکردند

আইয়াশী নির্ভরযোগ্য সনদ সহকারে ইমাম জাফর ছাদেক থেকে বর্ণনা করেন যে, আয়েশা হাফছা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বিষ দিয়ে শহীদ করেছিল। (৮৭০ পৃঃ)

এ খণ্ডেই মজলিসী আলী ইবনে ইবরাহীম ও আইয়াশীর রেওয়ায়েত দ্বারা এই বাজে কাহিনীও বর্ণনা করেছেন যে,

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) গোপনে হাফছাকে বলেছিলেনঃ আমি ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে, আমার পরে আবু বকর অন্যায়ভাবে খলিফা হয়ে যাবে। তার পরে তোমার পিতা ওমর খলিফা হবে। তিনি এ গোপন কথা কারও কাছে না বলার জন্যে হাফছাকে তাকিদ করেছিলেন। কিন্তু হাফছা কথাটি আয়েশার কাছে ফাঁস করে দেয় এবং আয়েশা তার পিতা আবু বকরকে বলে দেয়। আবু বকর ওমরকে বলল যে, হাফছা একথা বলেছে। ওমর তার কন্যা হাফছাকে জিজ্ঞেস করলে প্রথমে সে বলতে চায়নি; কিন্তু পরে বলে দেয় যে, হাঁ, রসূললল্লাহ (সাঃ) একথা বলেছেন। এরপর মজলিসী লিখেনঃ

پس آن دومنافق وآن دومنافقه بایکریگراتفاق کردندکه آنحصرت رابه زهرشهیدکنند

অতঃপর এ দু' মুনাফিক এবং এ দু' মুনাফিকা (অর্থাৎ আবু বকর, ওমর ও তাদের কন্যাদ্বয়) এ বিষয়ে একমত হয়ে যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বিষ দিয়ে শহীদ করতে হবে। (৭৪৫ পৃঃ)

বাস্তবে এসব প্রলাপোক্তি পাঠ করা এবং লিখা খুবই কষ্টদায়ক ও দুঃসহ কাজ। কিন্তু অনভিজ্ঞ সুন্নীদেরকে শিয়াবাদের স্বরূপ এবং শিয়া আকীদা ও মতবাদ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করা কর্তব্য মনে করে এ কষ্ট সহ্য করা হচ্ছে।

(নাউযুবিল্লাহ্) তিনজন ব্যতীত সকল ছাহাবী মুরতাদ হয়ে গেছেনঃ

এখন আমরা এ সম্পর্কে আরও একটি রেওয়ায়েত পাঠকবর্গকে জ্ঞাত করে এ বিষয়বস্তু খতম করছি। এতে বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ওফাতের পর সকল ছহাবী মুরতাদ তথা ধর্মত্যাগী হয়ে গেছে—`কেবল তিন জন মুরতাদ হয়নি। কিতাবুর রওযায় ইমাম বাকের থেকে রেওয়ায়েত আছে—

قال كان الناس اهل ردة بعد النبى صلى الله عليه واله الاثلثة فقلت ومن الثلاثة فقال المقداد بن الاسود وابوذرالغفارى وسلمان الفارسى رحمة الله عليهم وبركاته

তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ওফাতের পরে তিনজন বাদে সকলেই মুরতাদ হয়ে যায়। (রাবী বলেনঃ) আমি আরয করলামঃ সেই তিন জন কে? ইমাম বললেনঃ মেকদাদ বিনুল আসওয়াদ, আবু যর গেফারী, সালমান ফারেসী। তাঁদের প্রতি আল্লাহর রহমত ও বরকত নাযিল হোক। (১১৫ পৃঃ)

পূর্বেই বলা হয়েছে, খলিফাত্রয়, অন্যান্য ছাহাবায়ে-কেরাম ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পত্নীগণ সম্পর্কে এসব শিয়া আকীদা ও মতবাদ ইমামত আকীদারই অবশ্যম্ভাবী ও জাজ্জল্যমান ফালাফল। এরপর আমরা শিয়া মযহাবের আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা উল্লেখ করব, যা এই ইমামত আকীদারই অবশ্যম্ভাবী ফলাফল।

কিতমান ও তাকিয়্যা

শিয়া মযহাবের মৌলিক শিক্ষাসমূহের মধ্যে কিতমান ও তাকিয়্যাও রয়েছে। কিতমানের মানে হচ্ছে আসল আকীদা, মযহাব ও মত গোপন করা এবং অন্যের কাছে প্রকাশ না করা। তাকিয়্যা অর্থ কথায় ও কাজে বাস্তব ঘটনার বিপরীত অথবা আপন আকীদা, মযহাব ও মতের বিপরীত প্রকাশ করা এবং এভাবে অপরকে ধোকা ও প্রতারণায় লিপ্ত করা। পরবর্তীতে শিয়া মযহাবের স্বীকৃত ও প্রামাণ্য রেওয়ায়েত দ্বারা কিতমান ও তাকিয়্যা সম্পর্কিত তাদের ইমামগণের যে সকল উক্তি ও ঘটনা পেশ করা হবে, সেগুলো দ্বারা এর পূর্ণ স্বরূপ পাঠকবর্গের সামনে এসে যাবে। এই উভয় বিষয় ইমামত আকীদার অপরিহার্য অঙ্গ ও ফলশ্রুতি। এ জন্যেই এগুলো শিয়া মযহাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আমি যতদূর অধ্যয়ন করেছি এবং জানি, দুনিয়ার অন্য কোন মযহাবে ও ধর্মে এই কতিমান ও তাকিয়্যার শিক্ষা দেওয়া হয়নি। অথচ এটা শিয়া মযাবের অন্যতম মৌলিক শিক্ষা এবং শিয়াদের মতে তাদের ইমামগণ সারাজীবন এ শিক্ষা মেনে চলেছেন।

কিতমান ও তাকিয়্যা কোন্ প্রয়োজনে সৃষ্ট হয়েছে?

কারও জন্যে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই এবং এটা সর্বজন স্বীকৃত সত্য যে, হযরত আলী মুর্তযা (রাঃ) থেকে শুরু করে শিয়াদের একাদশতম ইমাম হাসান আসকারী পর্যন্ত কোন ইমাম মুসলমানদের কোন বড় সমাবেশে ইমামতের বিষয়টি উথ্থাপন করেননি। হজ্ব উপলক্ষ্যে মুসলমানদের বিশ্বজনীন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে মুসলিম-বিশ্বের প্রতিটি কোন্ থেকে মুসলমানগণ আগমন করেন। এতে কোন ইমাম কর্তৃক ইমামতের বিষয় বর্ণনা করার কথা কারও জানা নেই। এমনিভাবে দুই ঈদের সমাবেশ ও জুমুয়ার সমাবেশে অঞ্চল ও শহরের মুসলমানগণ সমবেত হয়। এছাড়া মুসলমানদের এমনি ধরনের কোন সম্মেলনে কোন ইমাম ইমামতের মসআলাটি বর্ণনা করেননি, যা শিয়া মযহাবে তওহীদ ও রেসালতের আকীদার মতই

ধর্মের ভিত্তি এবং নাজাতের শর্ত। শিয়াদের কোন ইমাম এ ধরনের কোন সমাবেশে ইমামত দাবীও করেননি। এবং সাধারণ মুসলমানকে তা কবুল করার এবং তার ভিত্তিতে বয়াত করার দাওয়াতও দেননি। বরং এর বিপরীতে স্বয়ং হযরত আলী মুর্তযার কর্মপন্থা খফিফাত্রয়ের চব্বিশ বছর কালীন খেলাফত আমলে এই দেখা গেছে যে, অন্য সকল মুসলমানের ন্যায় তিনিও তাঁদের পিছনে নামায পড়েছেন, তাঁদের বয়াত করেছেন এবং বাহ্যতঃ আন্তরিকতা ও সততা সহকারে তাঁদের সাথে সহযোগিতা করেছেন। অনুরূপভাবে তাঁর পরে হযরত হাসান মুজতাবা ও হযরত হুসায়ন (রাঃ) হযরত মোয়াবিয়ার খেলাফত আমলে কখনও কোন সমাবেশে নিজেদের ইমামত দাবী ও ঘোষণা করেননি এবং তাঁর পিছনে ও তাঁর নিযুক্ত ইমামের পিছনে সকলের সামনে নামায পড়েছে। ইছনা-আশারী শিয়াদের অবশিষ্ট সকল ইমামের (চতুর্থ ইমাম জয়নুল আবেদীন থেকে শুরু করে একাদশতম ইমাম হাসান আসকারী পর্যন্ত সকলের) এ হেন আচরণই সকলের জানা আছে।

একা এই ঘটনা এবং ইমামগণের এই উপর্যুপরি কর্মপন্থা শিয়া মযহাবের ভিত্তি ও বুনিয়াদ ইমামত বাতিল ও অমূলক হওয়ার এমন উজ্জ্বল প্রমাণ যে, এর চেয়ে উজ্জ্বল প্রমাণ ও সাক্ষ্য কল্পনাও করা যায় না।

আমি শিয়া গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করে কিতমান ও তাকিয়্যা আবিষ্কারের কারণ যা বুঝেছি, তা এই যে, আবদুল্লাহ্ ইবনে সাবার শিষ্য কুফার যে সকল লোক হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষ এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধে (অর্থাৎ ইমাম বাকের ও ইমাম জাফর ছাদেকের আমলে) শিয়া ইছনা আশারী মযহাব রচনা করে অথবা বলা যায় ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে, তারা উপরোক্ত অখণ্ডণীয় প্রমাণ ও সাক্ষ্যের কবল থেকে ইমামত আকীদা ও শিয়া মযহাবকে রক্ষা করার জন্যে এ দু'টি আকীদা রচনা করেছে। তন্মধ্যে কিতমান আকীদার অর্থ এই ছিল যে আমাদের ইমামগণের প্রতি স্বয়ং আল্লাহ ও রসূলের নির্দেশ ছিল যে ইমামত আকীদা প্রকাশ করবে না—একে গোপন রাখবে। তাই তাঁরা ইমামত আকীদা সাধারণ মুসলমানের সামনে এবং জনসমাবেশে বর্ণনা করেননি। দ্বিতীয় নির্দেশ তাকিয়্যা করার ব্যাপারে ছিল। এ কারণে তারা সারা জীবন নিজেদের বিবেক ও আকীদার বিপরীত আমল করতে থাকেন। মোট কথা, ইমামত আকীদাকে সকল ইমামের উপর্যুপরি কর্মপদ্ধতির কবল থেকে রক্ষা করার জন্যে এ দু'টি আকীদা গড়া হয়েছে। এজন্যেই আমি বলেছি যে এ দুটিও ঈমামত আকীদারই অন্যতম অপরিহার্য অঙ্গ ও ফলশ্রুতি। এখন কিতমান ও তাকিয়্যা সম্পর্কে বিজ্ঞ পাঠকবর্গ নিষ্পাপ ইমামগণের উক্তি ও ঘটনাবলী দেখুন।

কিতমান সম্পর্কে ইমামগণের উক্তি ও কর্মঃ

উছূলে কাফীতে كتمان একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়। এ অধ্যায়ে ইমাম জাফর ছাদেকের বিশেষ মুরিদ ও রাবী সোলায়মান ইবনে খালেদ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ
قال ابو عبد الله عليه السلام ياسليمان انكم على دين من كتمه اعزه الله ومن اذا عه اذله الله

ইমাম জাফর ছদেক বললেনঃ হে সোলায়মান, তোমরা এমন ধর্মের উপর রয়েছ যে, যে ব্যক্তি একে গোপন রাখবে, তাকে আল্লাহতাআলা ইযযত দান করবেন। আর যে এ ধর্মকে প্রকাশ ও প্রচার করবে, আল্লাহ্ তাকে হেয় ও লাঞ্ছিত করবেন। (৪৮৫ পৃঃ)
পরের পৃষ্ঠায় ইমাম জাফর ছাদেকের পিতা ইমাম বাকেরের এই উক্তি বর্ণিত আছে যে, তিনি বিশেষ শিয়াদেরকে বলেনঃ

ان احب اصحابی الیّ اورعھم وافقھھم واکتمھم لحدیثنا

আমার সহচরদের (শিষ্য ও মুরিদদের) মধ্যে আমার কাছে সেই ব্যক্তি অধিক প্রিয়, যে অধিক পরহেযগার, অধিক সমঝদার এবং আমার কথাবার্তা অধিক গোপনকারী। (৪৮৬ পৃঃ)
উছূলে কাফীতেই ইমাম জাফর ছাদেকের নিম্নোক্ত ঘটনা বর্ণিত আছে, যা কিতমান ও তাকিয়্যা উভয়ের দৃষ্টান্তঃ
সায়ীদ সাম্মান বর্ণনা করেন—একদিন আমি ইমাম ফাজর ছাদেকের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় জায়দিয়া সম্প্রদায়ের (১) দু'ব্যক্তি আগমন করল। তারা ইমামকে বললঃ আপনাদের মধ্যে কোন (আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত) ইমাম আছে কি, যার আনুগত্য ফরয? ইমাম জাফর ছাদেক বললেনঃ না। (আমাদের মধ্যে এমন কোন ইমাম নেই।) তারা উভয়ে বললঃ আমাদেরকে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিরা বলেছে যে, আপনি এ কথা বলেন, এ কথা স্বীকার করেন এবং এ বিষয়ে ফতোয়া দেন। আমরা আপনাকে সেই লোকদের নাম বলিঃ তারা অমুক ও অমুক। তারা পরহেযগারও গম্ভীর লোক—মিথ্যা বলার লোক নয়। তাদের এ কথা শুনে ইমাম জাফর ছাদেক ক্রুদ্ধ হলেন এবং বললেনঃ আমি তাদেরকে এ আদেশ দেইনি। (১৪২ পৃঃ)
এ ঘটনায় ইমাম জাফর ছাদেক কিতমানও করেছেন অর্থাৎ নিজের ইমামত গোপন করেছেন, যা তওহীদ ও রেসালাতের ন্যায় ঈমানের অঙ্গ এবং তাকায়্যুহ্‌কেও কাজে লাগিয়েছেন অর্থাৎ পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে, এখানে আমাদের মধ্যে এমন কোন ইমাম নেই, যার আনুগত্য ফরয। অথচ এস্থলে এই গোপনীয়তা ও মিথ্যা বর্ণনার কোন প্রয়োজন ছিল না। জায়দিয়া ফেরকার এ দু'ব্যক্তি ভিনদেশী ছিল এবং কূফা থেকে এসেছিল। ইমাম জাফর ছাদেক মদীনায় আপন গৃহে ছিলেন। অতএব তাদের সামনে সত্য কথা বলে দেওয়া হলে কোন বিপদাশংকা ছিল না। এখন পাঠকবর্গ তাকায়্যুহ্‌র দৃষ্টান্ত দেখুন।

তাকিয়্যা সম্পর্কে ইমামগণের উক্তি ও কর্মঃ

উছূলে কাফীতে তাকিয়্যা সম্পর্কেও একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় আছে। এ অধ্যায়ের একটি রেওয়ায়েত এইঃ

---

(১) "জায়দিয়া" শিয়াদেরই একটি সম্প্রদায়। হযরত আলী মুর্তযা থেকে নিয়ে চতুর্থ ইমাম আলী ইবনে হুসায়ন পর্যন্ত ব্যক্তিবর্গের ইমামত সম্পর্কে তারা এবং ইছনা আশারী সম্প্রদায় একমত। এরপর ইছনা আশারীরা তার পুত্র ইমাম বাকেরকে ইমাম মানে এবং তার পরে তারই বংশধরের মধ্য থেকে আরও সাতজনকে ইমাম মানে। কিন্তু জায়দিয়ারা ইমাম আলী ইবনে হুসায়ন অর্থাৎ ইমাম জয়নুল আবেদীনের দ্বিতীয় পুত্র যায়দ শহীদকে ইমাম মানে। অতঃপর তারই আওলাদ ও বংশের মধ্যে ইমামত অব্যাহত থাকায় বিশ্বাস করে। এ ছাড়া এ দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে ইমামের মান ও মর্তবা সম্পর্কেও কিছু মতভেদ আছে।

عن ابى عميرالاعجمى قال قال لى ابوعبدالله عليه السلام ياابا عمير تسعة اعشارالدين فى التقية ولادين لمن لاتقية له

আবু ওমায়র আ'জামী রেওয়ায়েত করেন, ইমাম জাফর ছাদেক আমাকে বলেছেন—ধর্মের দশ ভাগের নয় ভাগ তাকিয়্যার মধ্যে নিহিত। যে তাকিয়্যা করে না, সে বেদীন। (৩৮২ পৃঃ)
আরও একটি রেওয়ায়েত এইঃ
হাবীব বিনে বিশরের রেওয়ায়েতে ইমাম জাফর ছাদেক বলেনঃ আমি আমার পিতা ইমাম বাকেরের কাছে শুনেছি—তিনি বলতেনঃ ভূ-পৃষ্ঠে কোন বস্তুই আমার কাছে তাকিয়্যা অপেক্ষা অধিক প্রিয় নয়। হে হাবীব, যে ব্যক্তি তাকিয়্যা করবে, আল্লাহ তাকে উচ্চতা দান করবেন, আর যে করবে না, আল্লাহ্ তার অধঃপতন ঘটাবেন। (৪৮৩ পৃঃ)
পরবর্তী পৃষ্ঠার একটি রেওয়ায়েত এইঃ

قال ابوجعفر عليه السلام التقية من دينى ودين آبائى ولاايمان لمن لاتقية له

ইমাম বাকের বলেনঃ তাকিয়্যা আমার ধর্ম এবং আমার পিতৃপুরুষদের ধর্ম। যে তাকিয়্যা করে না, তার ধর্ম নেই। (৪৮৪ পৃঃ)

তাকিয়্যার একটি ব্যাখ্যা ও তার স্বরূপঃ

জানা গেছে যে, শিয়ারা অজ্ঞদের সামনে তাকিয়্যা সম্পর্কে বলে দেয় যে, তাদের মতে তাকিয়্যার অনুমতি কেবল তখন, যখন প্রাণের আশংকা অথবা এমনি ধরনের কোন গুরুতর বাধ্যবাধকতার সম্মুখীন হওয়া যায়। অথচ শিয়া রেওয়ায়েতে ইমামগণের এমন প্রচুর ঘটনা বিদ্যমান আছে, যাতে কোন বাধ্যবাধকতা এবং কোন সামান্য আশংকা ছাড়াই তারা তাকিয়্যা করেছেন, সুস্পষ্ট ভ্রান্ত বর্ণনা দিয়েছেন অথবা আপন কাজ দ্বারা মানুষকে ধোকা ও প্রতারণা দিয়েছেন। ইমাম জাফর ছাদেকের এ ধরনের একটি ঘটনা এইমাত্র উছুলে কাফীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। ইনশাআল্লাহ্ আরও কয়েকটি ঘটনা পাঠকবর্গকে উৎসর্গ করা হবে। এছাড়া উছুলে কাফীর তাকিয়্যা অধ্যায়েই নিম্নোক্ত রেওয়ায়েতটি বিদ্যমান আছে, যার পরে এ ধরনের ব্যাখ্যার কোন অবকাশ থাকে নাঃ

عن زارة عن ابى جعفرعليه السلام قال التقية فى كل ضرورة وصاحبهااعلم بهاحين تنزل به

যুরারার রেওয়ায়েতে ইমাম বাকের (আঃ) বলেনঃ তাকিয়্যা যে কোন প্রয়োজনে করা যায়। প্রয়োজন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিই অধিক জ্ঞানী; অর্থাৎ প্রয়োজন তাই; যাকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি প্রয়োজন মনে করে। (৪৮৪ পৃঃ)
এ রেওয়ায়েত থেকে জানা গেল যে, তাকিয়্যার অনুমতি সম্পর্কে উপরোক্ত বক্তব্য সঠিক নয়; বরং এটা প্রত্যেকের মতের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। যখনই কেউ স্বীয় স্বার্থে তাকিয়্যা করার প্রয়োজন অনুভব করবে, তাকিয়্যা করতে পারবে।

তাকিয়্যা কেবল জায়েয নয়—ওয়াজেব ও জরুরী ঃ

বরং বাস্তব ঘটনা এই যে, শিয়া মযহাবে তাকিয়্যা কেবল জায়েয নয়; বরং অত্যাবশ্যক ও ঈমানের অঙ্গ। শিয়াদের মূলনীতি চতুষ্টয়ের অন্যতম من لايحضره الفقية গ্রন্থে রেওয়ায়েত আছে যে,

قال الصادق عليه السلام لو قلت ان تارك التقية كتارك الصلوة لكنت صادقاوقال عليه السلام لادين لمن لاتقية له

ইমাম জাফর ছাদেক (আঃ) বলেছেন—যদি আমি বলি যে, তাকির্য়া বর্জনকারী নামায বর্জনকারীর অনুরূপ (গোনাহগার), তবে আমার এ কথা সত্য ও বিশুদ্ধ হবে। তিনি আরও বলেছেনঃ যার তাকিয়্যা নেই, তার ধর্ম নেই।

সম্পূর্ণ বিনা প্রয়োজনে ইমামগণের তাকিয়্যা করার দৃষ্টান্ত ঃ

কিতাবুর রওযায় একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। এর রাবী ইমাম জাফর ছাদেকের খাটি মুরিদ মোহাম্মদ ইবনে মুসলিম। তিনি বর্ণনা করেনঃ

دخلت على ابى عبدالله عليه السلام وعنده ابو حنيفة فقلت له جعلت فداك رأيت رؤية عجيبة فقال يابن مسلم هاتهافان العالم بهاجالس واومى بيده الى ابى حنيفة

আমি একদিন ইমাম জাফর ছাদেকের খেদমতে উপস্থিত হলাম। তখন তার কাছে আবু হানীফাও উপবিষ্ট ছিলেন। আমি (ইমাম জাফর ছাদেকের খেদমতে) আরয করলামঃ আমি আপনার জন্যে উৎসর্গ, আমি একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি। তিনি বললেনঃ ইবনে মুসলিম, তোমার স্বপ্ন বর্ণনা কর। স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জ্ঞানী একজন আলেম এক্ষণে এখানে উপস্থিত আছেন। তিনি হাত দ্বারা আবু হানীফার দিকে ইশারা করলেন (যে, ইনি)। এরপর ইবনে মুসলিম বলেনঃ আমি আমার স্বপ্ন বর্ণনা করলাম, যা শুনে আবু হানীফা তার ব্যাখ্যা বললেন। তার ব্যাখ্যা শুনে ইমাম জাফর ছাদেক বললেনঃ আল্লাহর কসম। হে আবু হানীফা, আপনি সম্পূর্ণ ঠিক বলেছেন। (ইবনে মুসলিম বলেনঃ এরপর আবু হানীফা তার কাছ থেকে চলে গেলেন। আমি আরয করলামঃ আমি আপনার প্রতি উৎসর্গ, এই নাছেবীর (১) ব্যাখ্যা আমার কাছে ভাল লাগেনি। ইমাম জাফর ছাদেক বললেনঃ হে ইবনে মুসলিম, এতে তোমার দুঃখিত হওয়া উচিত নয়। আমাদের ব্যাখ্যা তাদের

---

(১) 'নাছেবী' শিয়াদের বিশেষ পরিভাষায় একটি ধর্মীয় গালী তাদের মতে, সেই ব্যক্তি নাছেবী, যে শায়খায়নকে খলিফা বলে মানে এবং শিয়ারা আলী মুর্তযার জন্যে যে ধরণের ইমামত সপ্রমাণ করে, তাতে বিশ্বাস করে না; যদিও আলী মুর্তযাকে সত্য ও রাশেদ খলিফা মানে। এ জন্যেই ইবনে মুসলিম ইমাম জাফর ছাদেকের সামনে আবু হানীফাকে 'নাছেবী' বলেছে। আল্লামা মজলিসী 'হক্কুল এয়াকীন' গ্রন্থে 'ছিফতে আহলে জাহান্নাম' অধ্যায়ে যা কিছু লিখেছেন, তা থেকে জানা যায় যে, তাদের মতে আখেরাতে নাছেবীদের পরিণতি তাই হবে, যা কাফেরদের হবে। অর্থাৎ তারাও জাহান্নামে অনন্তকাল আযাব ভোগ করবে। (২১১ পৃষ্ঠা)
কলিনীর 'আর রওযা' গ্রন্থে ইমাম বাকেরের রেওয়ায়েত এই যে, নাছেবীদের জন্যে কারও শাফায়াতও কবুল হবে না। (৪৯ পৃঃ)

ব্যাখ্যা থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। আবু হানীফা যে ব্যাখ্যা করেছে, তা ঠিক নয়। ইবনে মুসলিম বলেনঃ আমি আরয করলাম, আমি আপনার প্রতি উৎসর্গ, তা হলে আপনি 'ঠিক বলেছেন' বলে এবং কসম খেয়ে তার ব্যাখ্যার সত্যায়ন করলেন কেন? ইমাম বললেনঃ আমি কসম খেয়ে তার প্রান্তির সত্যায়ন করেছিলাম। (১৩৭ পৃঃ)

অতঃপর রেওয়ায়েতটি অনেক দীর্ঘ। আমরা কেবল এর তাকিয়্যা সম্পর্কিত অংশ উদ্ধৃত করেছি। অনাবশ্যক দীর্ঘসূত্রিতা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে ইবনে মুসলিমের স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যাও উল্লেখ করিনি। কেননা, তাকিয়্যার সাথে এরও কোন সম্পর্ক নেই। রেওয়ায়েতে বর্ণিত ঘটনা এ বিষয়ের পরিষ্কার দৃষ্টান্ত যে, শিয়াদের নিষ্পাপ ইমামগণ সম্পূর্ণ বিনা প্রয়োজনেও তাকিয়্যা অর্থাৎ ভ্রান্ত বর্ণনা দিয়ে মানুষকে ধোকা দিতেন। বিশেষ মুরিদ ইবনে মুসলিমের সামনে তিনি ইমাম আবু হানীফার উপস্থিতিতে বলেছেন—তার সামনে স্বপ্ন বর্ণনা কর। ইনি স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বিশেষজ্ঞ। কিন্তু ইমাম আবু হানীফার প্রস্থানের পর তার সম্পর্কে যা বলেছেন, তা জেনেশুনে মিথ্যা ভাষণ ছিল এবং সম্পূর্ণ অনাবশ্যক ছিল, (২) অনুরূপভাবে তার বর্ণিত ব্যাখ্যার পরে اصبت والله ياابا حنيفة বলাও জেনেশুনে ও ইচ্ছাকৃতভাবে ভ্রান্ত বর্ণনা ছিল। পরে এর যে অর্থ করেছেন, তা এ বিষয়ের প্রমাণ যে, এই ইমামগণ এমন যে, তাদের কথাবার্তা মোটেই বিশ্বাস করার যোগ্য নয়। যদি তারা কোন আদালতে সাক্ষ্য দিতে যেতেন এবং তাদের সম্পর্কে প্রমাণিত হত যে, তারা এ ধরনের কথাবার্তা বলেন, তবে কিছুতেই তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হত না।

হায় আল্লাহ, ধর্মীয় মাসায়েল বর্ণনায়ও তাকিয়্যাঃ

শিয়া গ্রন্থাবলীর রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তাদের ইমামগণ কেবল জাগতিক ব্যাপারাদিতেই তাকিয়্যা করতেন ননা; বরং ধর্মীয় মাসায়েল ওওও বিধিবিধান বর্ণনায়ও তাকিয়্যা করতেন এবং ইচ্ছাাাকৃতভাবে মানুষকে এবং তাদের ভক্তদেরকে ভ্রান্ত মাসআলা বলতেন। এটা ঘটনাচক্রে নয়; বরং তাদের সাধারণ রীতি ছিল। উছুলে কাফী কিতাবুল এলমে এই রেওয়ায়েত আছে, "যুরারা বর্ণনা করেন, আমি ইমাম বাকেরকে একটি মসআলা জিজ্ঞেস করলে তিনি তার জওয়াব দিলেন। এরপর এ বৈঠকেই অন্য এক ব্যক্তি এল এবং সে-ও তাঁর কাছে একই মসআলা জিজ্ঞেস করল। তিনি তাকে আমার জওয়াব থেকে ভিন্ন জওয়াব দিলেন। এরপর আরও এক ব্যক্তি আগমন করল এবং সেই একই মসআলা জিজ্ঞেস করল। ইমাম বাকের তাকে এমন জওয়াব দিলেন, যা আমার জওয়াব এবং আমার পরে আগমনকারী ব্যক্তির জওয়াব থেকে ভিন্ন ছিল। অতঃপর যখন উভয় ব্যক্তি চলে গেল, তখন আমি আরয করলামঃ রসূল তনয়, এরাকের অধিবাসী দু'জন শিয়া লোক আপনার কাছে এসে একটি মসআলা জিজ্ঞেস করল। আপনি দু'জনকে ভিন্ন ভিন্ন জওয়াব দিলেন। (এরূপ কেন?) ইমাম বাকের বললেনঃ হে যুরারা, এর মধ্যেই আমাদের ও তোমাদের মঙ্গল ও স্থায়িত্ব নিহিত।

(২) কেননা, ইমাম জাফর ছাদেকের জন্যে ইমাম আবু হানীফার তরফ থেকে কোন বিপদাশংকার সম্ভাবনা ছিল না। তিনি কুফার অধিবাসী ভিনদেশী ছিলেন এবং সরকারের বিরাগভাজন ছিলেন। এ জন্যে জেলে নিক্ষিপ্ত হন এবং দীর্ঘদিন কারা ভোগ করেন।

তোমাদের সকলের মত ও পথ এক হয়ে গেলে মানুষ তোমাদেরকে আমাদের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে সত্যবাদী মনে করবে। এটা তোমাদের ও আমাদের স্থায়িত্বের জন্যে বিপদস্বরূপ। এরপর যুরারা বর্ণনা করেন, আমি ইমাম বাকেরের পুত্র ইমাম জাফর ছাদেকের কাছে একবার আরয করলামঃ আপনারা শিয়ারা অত্যন্ত অনুগত ও আত্মনিবেদিত। যদি আপনি তাদেরকে বর্শার সামনে অথবা অগ্নিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলেন, তবে তারা তাই করবে। কিন্তু তারা যখন আপনাদের কাছ থেকে বাইরে যায়, তখন তাদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ থাকে। যুরারা সেই বলেনঃ ইমাম জাফর ছাদেকও আমার এ প্রশ্নের সেই জওয়াব দিলেন, যা তার পিতা দিয়েছিলেন। (৩৭ পৃঃ)

ইমাম বাকের ও ইমাম জাফর ছাদেকের খাঁটি মুরিদ ও রাবী যুরারার এই রেওয়ায়েত থেকে পরিষ্কার জানা গেল যে, এই ইমামগণ ধর্মীয় মসআলা মাসায়েলের বর্ণনায়ও তাকিয়্যা করতেন এবং একই মসআলার বিভিন্ন জওয়াব দিতেন। এসব জওয়াবের মধ্যে কোন একটি সঠিক হলেও অবশিষ্টগুলো অবশ্যই ভ্রান্ত হয়ে থাকবে। এরূপও হত যে, একটি হালাল বস্তুকে তাকিয়্যার ভিত্তিতে হারাম এবং হারাম বস্তুকে হালাল বলে দিতেন। নিম্নোক্ত রেওয়ায়েতও এর একটি দৃষ্টান্তঃ

"আবান ইবনে তাগলিব রেওয়ায়েত করেন, আমি ইমাম জাফর ছাদেকের কাছে শুনেছি তিনি বলতেনঃ আমার পিতা (ইমাম বাকের) বনী উমাইয়ার শাসনামলে তাকিয়্যার ভিত্তিতে ফতোয়া দিতেন যে, বাজপক্ষী যে শিকারকে যবেহ করার পূর্বে মেরে ফেলে, তা খাওয়া হালাল। আর আমি শাসকদের ভয়ে এ মসআলায় তাকিয়্যা করি না। আমি ফতোয়া দেই যে, এরূপ জন্তু খাওয়া হারাম। (ফুরুয়ে কাফী ২য় খণ্ড, ৮০ পৃঃ)

এ রেওয়ায়েত থেকে জানা গেল যে, শিয়াদের এই ইমামগণ তাকিয়্যার ভিত্তিতে হারামকে হালালও বলে দিতেন। এটা নিশ্চিত যে, তাদের অনুসারী জনসাধারণ তাদের ফতোয়া অনুযায়ী এ হারামকে হালাল মনে করে খেত। আস্তাগফেরুল্লাহ।

সাইয়েদুনা হুসায়ন (রাঃ)-এর প্রতি ঘৃণ্যতম তাকিয়্যার অপবাদঃ

ফুরুয়ে কাফীর নিম্নোক্ত রেওয়ায়েত পাঠ করে সম্ভবতঃ পাঠকবর্গ বিস্মিত হবেন যে, আহলে বায়ত বিশেষতঃ সাইয়েদুনা হুসায়ন (রাঃ)-এর প্রতি মহব্বতের দাবীদাররা এ রেওয়ায়েতে তাকে কতটুকু হীন চরিত্র দেখিয়েছে।

"আমের ইবনে সামত ইমাম জাফর ছাদেক থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেনঃ মুনাফিকদের মধ্য থেকে একজনের মৃত্যু হয়ে গেলে আমাদের পরদাদা হুসায়ন ইবনে আলী (আঃ) বাইরে আসেন এবং তার জানাযার সাথে চলেন, যাতে জানাযার নামাযে শরীক হন। তখন তার এক গোলাম তার সামনে এল, (যে জানাযা থেকে গা বাঁচাচ্ছিল)। হযরত হুসায়ন (আঃ) তাকে বললেনঃ তুমি কোথায় যাচ্ছ? গোলাম বললঃ আমি এই গোলামের জানাযা থেকে পালাতে চাই। হযরত হুসায়ন (আঃ) তাকে বললেনঃ তুমি আমা ডানদিকে দাঁড়িয়ে যেও এবং আমাকে যা বলতে শুন, তুমিও তাই বলো। এরপর ইমাম জাফর ছাদেক বর্ণনা করেন, যখন মৃতের ওলী জানাযার নামায পড়াতে শুরু করল এবং আল্লাহু আকবর বলল,

তখন হযরত হুসায়ন ও আল্লাহ আকবর বললেন। এরপর মৃতের জন্যে তিনি এই বলে দোয়া করলেনঃ হে আল্লাহ, আপনার এই বান্দার প্রতি এক হাজার বার উপর্যুপরি লানত করুন। হে আল্লাহ, আপনি এই বান্দাকে আপনার বান্দাদের মধ্যে এবং আপনার শহরসমূহে হেয় ও লাঞ্ছিত করুন এবং তাকে দোযখের অগ্নি পৌছান এবং ঘোরতর আযাবের স্বাদ আস্বাদন করান। সে আপনার শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব এবং আপনার বন্ধুদের সাথে শত্রুতা রাখতে এবং আপনার নবীর আহলে বায়তের শত্রু ছিল। (১ম খণ্ড ৯৯-১০০ পৃঃ)

সুন্নী সম্প্রদায় ছাড়া আমরা সুস্থমনা শিয়াদেরকেও চিন্তাভবনা করার আবেদন জানাচ্ছি যে, এ রেওয়ায়েতে সাইয়েদুনা হুসায়ন (রাঃ)-এর প্রতি কতটুকু নিকৃষ্ট পর্যায়ের তাকিয়্যার অপবাদ আরোপ করা হয়েছে! তাকে কি পরিমাণ হীন চরিত্র দেখানো হয়েছে। তিনি যাকে মুনাফিক মনে করতেন, তার জানাযায় যাওয়ার এবং মানুষকে দেখানোর কোন প্রয়োজন তাঁর ছিল না। তিনি বাহ্যতঃ দেখালেন যে, তিনি মৃতকে মুমিন ও দোয়ায়ে মাগফেরাতের যোগ্য মনে করছেন; কিন্তু আসলে তার জন্য কঠোরতম বদ দোয়া করেছেন এবং মানুষকে ধোকা দিয়েছেন। তার গোলাম তাকিয়্যা করতে রাজী ছিল না। তিনি তাকেও তাকিয়্যার মধ্যে শরীক করে নিলেন এবং চিরতরে তাকেও এই প্রবঞ্চনা শিক্ষা দান করলেন।

এরপর এ পৃষ্ঠাতেই হযরত আলী ইবনে হুসায়ন (ইমাম জয়নুল আবেদীন) ও স্বয়ং ইমাম জাফর ছাদেকেরও এভাবে জানাযার নামায পড়ার ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

আমাদের বিশ্বাস, এগুলো সব এই সম্মানিত ও পবিত্র মুনীষীগণের প্রতি শিয়া মযহাব রচয়িতাদের মনগড়া মিথ্যাচার। তাঁদের আঁচল এ ধরনের মুনাফিকসুলভ চরিত্র থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

কিতমান ও তাকিয়্যা সম্পর্কে আরও অনেক বেশী লিখা যায়। কিন্তু আমরা এতটুকুকেই যথেষ্ট মনে করে এ আলোচনা খতম করছি।

নবুওয়ত খতম হয়নি—উন্নত আকারে অব্যাহত রয়েছেঃ

শিয়াদের ইমামত আকীদার অবশ্যম্ভাবী ও জাজ্বল্যমান ফল এটাও যে, একে স্বীকার করে নেওয়ার পর খতমে নবুওয়তের আকীদা খতম ও অর্থহীন হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, নবুয়ত, রেসালাত, খতমে নবুয়ত ও খতমে রেসালাত, এগুলো কেবল বুলিই নয়; বরং এগুলোর এক নির্দিষ্ট ও জানাশুনা স্বরূপ রয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর "খাতেমুন্নাবিয়্যীন" হওয়ার অর্থ এই যে, যাকে নবুওয়ত ও রেসালত বলা হয়, তা তাঁর উপর খতম করে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক নবী ও রসূল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মনোনীত এবং বান্দার জন্যে আল্লাহ্‌র প্রমাণ হয়ে থাকেন। তাঁকে চিনা ও মানা নাজাতের জন্যে শর্ত। তিনি ওহীর মাধ্যমে আল্লাহর বিধানাবলী প্রাপ্ত হন। তিনি নিষ্পাপ। তাঁর আনুগত্য ফরয। তিনিই এবং তাঁর শিক্ষা উম্মতের জন্যে হেদায়াতের উৎস হয়ে থাকে। এটাই নবুওয়তের স্বরূপ ও মর্যাদা। এখন খতমে নবুওয়তের অর্থ এটাই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পরে এই মর্যাদা অন্য কারও অর্জিত হবে না। এখন কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্যে তিনিই বান্দার জন্যে আল্লাহর প্রমাণ এবং তাঁর তরফ থেকে এ উদ্দেশ্যের জন্যে মনোনীত।

তাঁকে মানা নাজাতের শর্ত এবং তাঁর আনুগত্য আল্লাহর আনুগত্য। ওহীর মাধ্যমে হেদায়াত ও বিধানাবলী আসা তাঁর উপর খতম হয়ে গেছে। এখন কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্যে তাঁর মাধ্যমে আগত আল্লাহর কিতাব কোরআন মজীদই এবং 'সুন্নাহ্' শীর্ষক তাঁর বাণী ও কর্মই কেবল হেদায়াতের উৎস ও উৎপত্তিস্থল। তাঁর পরে এমন কোন ব্যক্তিত্ব হবে না, যে নবী ও রসূলগণের মত বান্দার জন্যে আল্লাহর প্রমাণ ও নিষ্পাপ হতে পারে এবং যার আনুগত্য বান্দার জন্যে ফরয হতে পারে। এটাই ছিল এবং আছে নবুওয়তের অর্থ ও স্বরূপ।
কিন্তু ইছনা আশারিয়া শিয়াদের ইমামত আকীদা অনুযায়ী যখন স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পরে হযরত আলী মুর্তযা থেকে শুরু করে দ্বাদশ ইমাম পর্যন্ত (যিনি এখন থেকে প্রায় সাড়ে এগারশ' বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করে কোন গুহায় আত্মগোপন করে আছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থেকে কোন উপযুক্ত সময়ে আত্মপ্রকাশ করবেন) বারজন ব্যক্তিত্ব আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে মনোনীত আছেন, তখন খতমে নবুওয়তের আকীদার কোন অর্থ বাকী থাকে না। কেননা, এই বারজন ইমামও বান্দার জন্যে আল্লাহর প্রমাণ। তারাও নিষ্পাপ এবং তাদেরও আনুগত্য ফরয। তাদেরকে চিনা ও মানা নাজাতের শর্ত। তারা ওহীর মাধ্যমে আল্লাহতায়ালার তরফ থেকে হেদায়াত ও বিধানাবলী লাভ করেন। তাদের সেই গুণাবলী ও পূর্ণতা অর্জিত আছে, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে পয়গাম্বরগণকে দান করা হয়েছিল। তারা মর্তবায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-রে সমান; কিন্তু অন্যান্য পয়গাম্বরের এমন কি, প্রধান প্রধান পয়গাম্বরের উর্ধ্বে। তদুপরি তারা খোদায়ী গুণাবলী ও ক্ষমতারও বাহক। তারা ভূত ও ভবিষ্যৎ জানেন। কোন কিছু তাদের কাছে গোপন নগ। যে-কোন বস্তু অথবা কমরকে তারা হালাল অথবা হারাম করার ক্ষমতা রাখেন। ইহকাল ও পরকাল তাদের মালিকানাধীন। তারা যাকে যা ইচ্ছা দান করেন ও মার্জনা করেন। তাদের মৃত্যু তাদের ক্ষমতাধীন। মোট কথা ইমামদের ব্যাপারে এই বিবরণ মেনে নেওয়ার পর কেবল খতমে নবুওয়তের আকীদা খতম ও অর্থহীনই হয়ে যায় না বরং এই আকীদা তৈরী হয় যে, নিম্নস্তরের নবুয়ত খতম হয়ে ইমামত শিরোনামে উন্নত ও উৎকৃষ্ট স্তরের নবুওয়ত কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্যে চালু হয়ে গেছে। এ নবুওয়তের 'খাতেম' অর্থাৎ সর্বশেষ নবী হলেন অন্তর্হিত ইমাম মেহদী, যার কাছ থেকে এমন গুণাবলী প্রকাশ পাবে, যা খাতেমুন্নবীয়ীন মোহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছ থেকেও প্রকাশ পায়নি। তিনি হযরত আবু বকর, ওমর, আয়েশা প্রমুখকে কবর থেকে বের করে জীবিত করবেন, শাস্তি দিবেন, হাজারো বার মেরে মেরে জীবিত করবেন এবং শূলীতে চড়াবেন। শিয়া মাযহাবের প্রধান ভাষ্যকার আল্লামা বাকের মজলিসীর এ বাণী পাঠকবর্গ দেখেছেন— امامت بالاترازمرتبه پیغمبری است (অর্থাৎ ইমামতের মর্তবা পয়গাম্বরীর উর্ধ্বে)। তাই ইমামত আকীদা মেনে নেওয়ার অপরিহার্য ফলশ্রুতি দুয়ে দুয়ে চারের মত এই বের হয় যে, নবুওয়ত খতম হয়নি; বরং উন্নত আকারে "ইমামত" শিরোনামে অব্যাহত রয়েছে। হায়, বোধশক্তিসম্পন্ন ও সুস্থ স্বভাব শিয়ারাও যদি এ বিষয়ে গুরুত্ব সহকারে চিন্তা-ভাবনা করত!

রাজআত আকীদা

"রাজআত" আকীদাও শিয়াদের অন্যতম বিশেষ আকীদা এবং এটাও ইমামত আকীদারই ফলশ্রুতি। এর অর্থ এই যে, ইমাম মেহ্দী যখন গুহা থেকে আত্মপ্রকাশ করবেন, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ), আমিরুল মুমিনীন আলী, সাইয়েদা ফাতেমা যুহরা, হযরত হাসান ও হুসায়ন, অন্য সকল ইমাম এবং বিশিষ্ট মুমিনগণ জীবিত হয়ে কবর থেকে বাইরে আগমন করবেন। তারা সকলেই ইমাম মেহদীর বয়াত করবেন। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও আমিরুল মুমিনীন হযরত আলী বয়াত করবেন। আবু বকর, ওমর, আয়েশা এবং তাদের সাথে সম্পর্কশীল বিশিষ্ট কাফের ও মুনাফিকরাও জীবিত হবে। ইমাম মেহদী তাদেরকে সেই শাস্তি দিবেন, যা আল্লামা মজলিসীর "হক্কুল এয়াকীন" গ্রন্থের বরাত দিয়ে কয়েক পৃষ্ঠা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এ গ্রন্থেই রাজআত আকীদার একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় আছে। এতে এ আকীদা সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। (১৪০-১৪৫ পৃঃ) উপরের ছত্রগুলোতে আমরা যা আরয করেছি, তা সেখান থেকেই সংগৃহীত।

শিয়া আকীদা ও কর্মের বর্ণনায় "তুহ্ফাতুল আওয়াম" উর্দু ভাষায় একটি সর্বাধিক প্রাচীন গ্রন্থ। এতে রাজআত আকীদা সংক্ষেপে এরূপ বর্ণিত হয়েছেঃ

রাজআতের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজেব ; অর্থাৎ ইমাম মেহ্দী আত্মপ্রকাশ করবেন ও বের হবেন, তখন বিশেষ মুমিন এবং বিশেষ কাফের ও মুনাফিক জীবিত হবে। প্রত্যেকেই তার প্রতিশোধ ও ইনছাফ লাভ করবে এবং জালেম শাস্তি ও দণ্ড পাবে। (৫ পৃঃ)

কোরআন মজীদ ও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী মুসলিম উম্মাহর আকীদা এই যে, মৃত্যুর পরে মুমিন, কাফের, সৎকর্মপরায়ণ, পাপাচারী তথা সকল মানবকে কিয়ামতেই জীবিত করা হবে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার ও শাস্তি এবং ছোয়াব ও আযাবের ফয়সালা হবে। কিন্তু শিয়াদের মতে, কিয়ামতের পূর্বে ইমাম মেহদীর আত্মপ্রকাশের সময়ও এক কিয়ামত হবে। এতে প্রতিদান ও শাস্তিদাতা স্বয়ং ইমাম মেহ্দী হবেন। এভাবে তিনি খোদায়ী গুণ عزیزذوانتقام (পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী)—এরও বাহক হবেন।

কোরআন মজীদে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন

এ আকীদাও ইমামত আকীদারই অপরিহার্য ফলশ্রুতি, যা শিয়া মযহাবের ভিত্তি। আমি এ বিষয়ে অবহিত নই যে, আমাদের যুগের শিয়া আলেমগণ অস্বীকার করে যে, তারা কোরআনে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনে বিশ্বাসী। এ অস্বীকার বাস্তব দিক দিয়ে শুদ্ধ না অশুদ্ধ—এক্ষণে এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করতে চাই না। শিয়া মযহাবের সর্বাধিক প্রামাণ্য গ্রন্থাবলীতে তাদের নিষ্পাপ ইমামগণের অসংখ্য রেওয়ায়েত বিদ্যমান রয়েছে, যা অকাট্যরূপে প্রমাণ করে যে, কোরআন পাকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছে। এতদসত্ত্বেও কোন শিয়া আলেমের

জন্যে অস্বীকারের অবকাশ আছে কিনা, তাও আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। কিন্তু কোন শিয়া আলেম কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির সামনে এটা অস্বীকার করার দুঃসাহস করতে পারে না যে, অতীতে (বিশেষ করে তাদের খাতেমুল মুহাদ্দিসীন মহা ভাষ্যকার আল্লামা বাকের মজলিসীর সমান অর্থাৎ হিজরী দশম ও একাদশ শতাব্দী বরং-এর পরেও) শিয়া আলেম ও গ্রন্থাকারগণ পূর্ণ দাবী সহকারে এ কথাই বলত ও লিখত যে বর্তমান কোরআনে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছে। তারা তাদের রচনাবলীতে একথাও প্রকাশ করত যে, তাদের নিষ্পাপ ইমানগণের রেওয়ায়েতও তাই ব্যক্ত করে এবং তাদের পূর্ববর্তী আলেমগণের আকীদা তাই ছিল। যে সকল শিয়া আলেম এর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছে, তাদের সংখ্যা এত নগণ্য যে, অনায়াসেই আঙ্গুলে গণনা করা যায়। (সত্বরই আমরা এ প্রসঙ্গে শিয়া আলেমগণের সাক্ষ্য পাঠকবর্গকে উৎসর্গ করব।)

মোট কথা এক্ষনে এই শিরোনামের অধীনে আমরা যা আরয করতে চাই, তার সম্পর্ক সেই শিয়া আলেম ও গ্রন্থকারদের সাথে মনে করা উচিৎ, যারা তাদের রচনাবলীতে স্বীকার বরং সগর্বে দাবী করেছে এবং স্বীয় দৃষ্টিকোন অনুযায়ী এর প্রমাণাদিও পেশ করেছে যে, কোরআনে পরিবর্তন হয়েছে এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পর ক্ষমতাসীন খলিফাত্রয় তাদের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক স্বার্থে এবং মানসিক প্রবৃত্তি অনুযায়ী তাতে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছে। এ আকীদা সম্পর্কেই আমরা বলেছি যে, এটাও ইমামত আকীদারই অন্যতম অপরিহার্য ফলশ্রুতি। নিম্নে এ বিষয়েরই কিছু ব্যাখ্যা করতে চাই।

পরিবর্তনের আকীদা ইমামতের অবশ্যম্ভাবী পরিনতি কেন?

ইমামত প্রসঙ্গে প্রায় চল্লিশটি শিরোনামের অধীনে এ পর্যন্ত যা কিছু লিখা হয়েছে, তা থেকে পাঠকবর্গ শিয়া মযহাবে এ আকীদার অসাধারণ গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। তারা আরও জানতে পেরেছেন যে, তওহীদ, রেসালত, কিয়ামত ও আখেরাত আকীদার ন্যায় এটাও ধর্মের বুনিয়াদী আকীদা, ঈমানের অঙ্গ এবং নাজাতের শর্ত। এ প্রসঙ্গে যা কিছু পূর্বে লিখা হয়েছে, যদিও তা যথেষ্ট; কিন্তু এখানে আমরা যা আরয করতে চাই, তার জন্যে এ বিষয়বস্তু (শিয়া মযহাবে ইমামত আকীদার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য) সম্পর্কে নিষ্পাপ ইমামগণের আরও কতিপয় উক্তি পাঠকবর্গের সামনে পেশ করা সমীচীন মনে হয়।

শিয়া মযহাবে ইমামত আকীদার মর্তবা ও গুরুত্বঃ

উছূলে কাকীতে এ বিষয় প্রথম রেওয়ায়েতটি এইঃ

عن ابى جعفر عليه السلام قال بنى الاسلام على خمس الصلوة والزكوة والصوم والحج والولاية ولم يناد بشئى مانودى بالولاية ٥

ইমামবাকের (আঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত—নামাজ, যাকাত, রোজা, হজ্ব ও ইমামত (অর্থাৎ ইমামতের আকীদা মানা)।

এগুলোর মধ্যে ইমামত স্তম্ভটি যেরূপ গুরুত্ব সহকারে ঘোষিত হয়েছে, তেমন অন্য কোনটি হয়নি। (৩৬৮ পৃঃ)
এরপর এ অধ্যায়ে ইমাম বাকের থেকেই যুরারার রেওয়ায়েতের বিষয়বস্তু বরং ভাষা ও প্রায় একই। তবে এর শেষে এই সংযোজন রয়েছেঃ—

قال زرارة فقلت وای شیئ من ذالك افضل فقال الولاية افضل

যুরারা বলেন, আমি (ইমাম বাকেরের এই এরশাদ শুনে তাকে) বললামঃ এই পাঁচ স্তম্ভের মধ্যে কোনটি উত্তম? তিনি বললেনঃ ইমামত আকীদা মানা উত্তম। (৩৬৮ পৃঃ)
এ অধ্যায়েই ইমাম জাফর ছাদেকের রেওয়ায়েত এইঃ—

عن الصادق عليه السلام قال قال اثافی الاسلام ثلثة الصلوة والزكوة والولاية لاتصح واحدة منهن الا بصاحبتها

ইমাম জাফর ছাদেক বলেনঃ ইসলামের তিনটি খুঁটি রয়েছে—নামায, যাকাত ও ইমামত। এদের মধ্যে একটিও অপরটি ছাড়া শুদ্ধ হয় না। (৩৬৮ পৃঃ)
এ অধ্যায়ে এ দু'জন ইমাম থেকে এ বিষয়বস্তুরই আরও কয়েকটি রেওয়ায়েত রয়েছে। আমরা কেবল তিনটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করাকে যথেষ্ট মনে করেছি। এগুলোতে পরিষ্কার বর্ণিত হয়েছে যে, ইমামত স্বীকার করা নামাজ ও যাকাতের মতই ইসলামের স্তম্ভ এবং সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম স্তম্ভ। এটা না মানলে এবং এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে নামাজ ও যাকাতও শুদ্ধ হয় না; (যেমন তওহীদ ও রেসালতে ঈমান না আসলে নামায, যাকাত ইত্যাদি শুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য হয় না)।
এরপর এ বিষয়বস্তু সম্পর্কে উছুলে কাফীর শেষ অধ্যায় باب فيه نتف وجوامع من الرواية فى الولاية থেকে দু'টি রেওয়ায়েত পাঠকবর্গ দেখে নিন।

আল্লাহর প্রত্যেক পয়গাম্বর ইমামত আকীদা শিক্ষা দিয়েছেন এবং প্রত্যেক ঐশীগ্রন্থে এর আদেশ দেওয়া হয়েছেঃ

عن ابى عبدالله عليه السلام قال ولايتناولاية الله التى لم يبعث نبى قط الابها

ইমাম জাফর ছাদেক বলেছেন, আমাদের ইমামত ও কর্তৃত্ব হুবহু আল্লাহর ইমামত ও কর্তৃত্ব। প্রত্যেক নবী এর আদেশ নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন। (৩৭৬ পৃঃ)
এরপর এ পৃষ্ঠাতেই ইমাম জাফর ছাদেকের পুত্র শিয়াদের সপ্তম ইমাম মূসা কাযেমের উক্তি সনদ সহকারে বর্ণিত হয়েছেঃ—

عن ابى الحسن عليه السلام قال ولاية على مكتوبة فى جميع صحف الانبياءولن يبعث الله رسولا الابنبوة محمد صلى الله عليه واله ووصية على عليه السلام

আবুল হাসান (অর্থাৎ মূসা কাযেম) বলেনঃ আমিরুল মুমিনীন আলীর ইমামত সকল

পয়গাম্বরের ছহিফায় লিখিত আছে। আল্লাহ যে কোন রসূল দুনিয়াতে প্রেণ করেছেন, তিনি মোহাম্মদ (সাঃ)-এর নবুয়ত এবং আলী (আঃ)-এর ওছিয়াতের (অর্থাৎ ইমামতের) শিক্ষা সহকারে প্রেরিত হয়েছেন। (৩৭৬ পৃঃ)
পাঠকবর্গের পূর্বেই জানা হয়েছিল যে, ইমামত আকীদা শিয়া মযহাবে তওহীদ ও রেসালত আকীদার মতই ইসলামের ভিত্তি এবং এর প্রতি ঈমান নাজাতের শর্ত। এখানে উল্লেখিত রেওয়ায়েত থেকে আরও জানা গেল যে, ইমামত আকীদা নামায, যাকাত, হজ্ব ও রোযার ন্যায় ইসলামের একটি স্তম্ভ এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও উত্তম। আরও জানা গেল যে, দুনিয়াতে যত নবী-রসূল প্রেরিত হয়েছেন, সকলেই আপন আপন উম্মতকে হযরত আলী ও তাঁর বংশধরের মধ্যে এগারজন ইমামের ইমামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের দাওয়াত দিয়েছিলেন। আল্লাহতাআলার তরফ থেকে যত কিতাব ও ছহিফা নাযিল হয়েছে, সবগুলোর মধ্যে হযরত আলীর ইমামত বর্ণিত ও ঘোষিত হয়েছে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নঃ কোরআনে ইমামত আকীদার উল্লেখ নেই কেন?

ইমামত আকীদার এই অসামান্য গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য জানার পর স্বাভাবিকভাবে এ প্রশ্ন জাগে যে, তা হলে কোরআন মজীদে ইমামত আকীদা বর্ণিত হল না কেন? তওহীদ, রেসালত, কিয়ামত ও আখেরাত আকীদার বর্ণনা কোনআন পাকে শত শত স্থানে বিভিন্ন শিরোনামে করা হয়েছে। কিন্তু হযরত আলীর ইমামত এক জায়গায়ও বর্ণিত হয়নি। এরূপ কেন? অথচ সপ্তম ইমাম মূসা কাযেম এরশাদ করেন যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্বে যত কিতাব ও ছহিফা পয়গাম্বরগণের প্রতি নাযিল হয়েছে, সবগুলোতে হযরত আলীর ইমামত আকীদার বর্ণনা রয়েছে। এমতাবস্থায় আল্লাহর সর্বশেষ কিতাব কোরআন মজীদে তার ইমামত বর্ণিত হল না কেন, অথচ কোরআন সেই উম্মতের হেদায়াতের জন্যে নাযিল হয়েছে, যার তিনি ইমাম নিযুক্ত হয়েছেন? কোরআনের একটি আয়াতও এ সম্পর্কে নাযিল, হল না কেন?

পরিবর্তনের দাবী এ প্রশ্নেরই জওয়াবঃ

এ প্রশ্নের যে জওয়াব নিষ্পাপ ইমামগণের শত শত রেওয়ায়েত থেকে পাওয়া যায়, তা এই যে, কোরআনে আলী (আঃ)-এর ইমামত বহু জায়গায় পরিষ্কার ভাষায় বর্ণিত হয়েছিল। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পরে যারা জোরে জবরে খেলাফত ও হুকুমত দখল করে নেয়, তারা কোরআন থেকে সেইসব আয়াত ও বাক্য বহিষ্কার করে দেয়, যেগুলোতে হযরত আলী ও তার পরবর্তী ইমামগণের ইমামত বর্ণিত হয়েছিল এবং তার নাম পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছিল। আলোচ্য গ্রন্থে যেখানে ইমামত প্রশ্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, সেখানে বিভিন্ন শিরোনামের অধীনে বিশেষতঃ "কোনআন মজীদে ইমামত ও ইমামগণের বর্ণনা" শিরোনামে এ ধরনের একাধিক রেওয়ায়েত পাঠকবর্গ লক্ষ্য করেছেন, যেগুলোতে কোরআন পাকে এ ধরনের পরিবর্তন উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আরও কতিপয় রেওয়ায়েত এখানে দেখে নিন।

পরিবর্তন সম্পর্কে ইমামগণের উক্তিঃ

সূরা আহযাবের শেষ রুকূর আয়াত— وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَه فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا "যে কেউ আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করবে, সে বিরাট সাফল্য অর্জন করবে।" এ আয়াত সম্পর্কে উছূলে কাফীতে আবু বছীরের বর্ণনায় ইমাম জাফর ছাদেক বলেনঃ— আয়াতটি এভাবে নাযিল হয়েছিল—

ومن يطع الله ورسوله في ولاية علي والائمة من بعده فقد فاز فوزا عظيما

এর অর্থ ছিল যে কেউ আলী ও তার পরবর্তী ইমামগণের ব্যাপারে আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করবে, সে বিরাট সাফল্য অর্জন করবে। এ আয়াতে হযরত আলী ও তার পরবর্তী সকল ইমামের ইমামত বর্ণিত হয়েছিল। কিন্তু আয়াত থেকে "আলী ও তার পরবর্তী ইমামগণের ব্যাপারে" কথাগুলো বের করে দেওয়া হয়েছে, যা বর্তমানে কোরআনে নেই। (২৬২ পৃঃ)
পরবর্তী পৃষ্ঠাতেই ইমাম বাকের থেকে বর্ণিত আছে—

عن ابي جعفر عليه السلام قال نزل جبرئيل بهذه الاية على محمد صلى الله عليه واله بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَكْفُرُوْا بِمَا اَنْزَلَ الله فِيْ عَلِيٍّ بَغْيًا

উদ্দেশ্য এই যে, সূরা বাকারার এই ৯০ আয়াতে في علي (আলীর ব্যাপারে) শব্দ ছিল, যা বের করে দেওয়া হয়েছে এবং বর্তমান কোরআন নেই।
এরপর পরবর্তী পৃষ্ঠায় ইমাম জাফর ছাদেক থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেনঃ

نزل جبرئيل على محمد صلى الله عليه واله بهذه الاية هكذا باايها الذين اوتوا الكتاب امنوابما نزلنافي علي نورامبينا

জিবরাঈল হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি এই আয়াত এভাবে নিয়ে নাযিল হয়েছিলেনঃ হে কিতাবপ্রাপ্তরা (ইহুদী-খৃষ্টানরা,) তোমরা আলী সম্পর্কে যে প্রকাশ্য নূর আমি নাযিল করেছি, তার প্রতি ঈমান আন। (২৬৪ পৃঃ)
এতে আলী সম্পর্কিত নির্দেশ তথা নূরে মুবীনের প্রতি ইহুদী ও খৃষ্টানদের ঈমান দাবী করা হয়েছিল। কিন্তু এই আয়াত বর্তমান কোরআনে কোথাও নেই। উদ্দেশ্য এই যে, গোটা আয়াতটিই বের করে দেওয়া হয়েছে।
এরপর এ অধ্যায়েই ইমাম ছাদেক থেকে আবু বছীরের রেওয়ায়েত এইঃ——

عن ابي عبدالله عليه السلام في قوله تعالى وسئل سائل بعذاب واقع للكافرين بولاية علي ليس له دافع ثم قال هكذاوالله نزل بها جبريل على محمد صلى الله عليه واله

সূরা মায়ারেজের প্রথম আয়াত الخ . . . . سَئَلَ سَائِلٌ সম্পর্কে তিনি বলেন, আল্লাহর কসম, জিবরাঈল মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি এ আয়াত এভাবে নিয়ে নাযিল হয়েছিলেন

سئل سائل بعذاب واقع للكافرين بولاية على ليس له دافع

উদ্দেশ্য এই যে, আয়াত থেকে بولاية على শব্দটি বের করে দেওয়া হয়েছে।
অতঃপর পরবর্তী পৃষ্ঠায় ইমাম বাকেরের রেওয়াতে এইঃ—

قال نزل جبريل بهذه الايةهكذا. . . . . ياايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم في ولاية على فامنوا خيرالكم وان تكفروا بولاية على فان الله مافى السماوات ومافى الارض

তিনি বলেনঃ জিবরাঈল (সূরা নেসার ১৭০) আয়াত এভাবে নিয়ে নাযিল হন—হে লোক সকল, তোমাদের কাছে আল্লাহর রসূল তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আলীর ইমামত সম্পর্কে সত্য বিষয় নিয়ে আগমন করেছে। অতএব তোমরা এর প্রতি ঈমান আন। এতে তোমাদের জন্যে মঙ্গল রয়েছে। আর যদি তোমরা আলীর ইমামত অস্বীকার কর, তবে (তোমাদের মঙ্গল নেই) আকাশমণ্ডলী ও পৃথবীতে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর। (তিনি তোমাদের পরওয়া করেন না।) (২৭৬ পৃঃ)

উদ্দেশ্য এই যে, এ আয়াতে পরিষ্কার করে হযরত আলীর ইমামত উল্লেখিত ছিল। তার প্রতি ঈমান আনতে ও তাকে কবুল করতে বলা হয়েছিল। অমান্য করলে শাস্তিবাণী শুনানো হয়েছিল। কিন্তু এ বিষয়বস্তু আয়াত থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। বর্তমান কোরআনে "আলীর বেলায়েত" কথাটি নেই।

এরপর এ পৃষ্ঠায় ইমাম বাকের থেকেই রেওয়ায়েত আছেঃ—

عن ابى جعفر عليه السلام قال هكذا نزلت هذه الاية ولوانهم فعلوا مايوعظون به فى على لكان خيرالهم

ইমাম বাকের বলেনঃ সূরা নেসার ৬৬ আয়াত এভাবে নাযিল হয়েছিল— তাদেরকে আলী সম্পর্কে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, যদি তারা তদনুযায়ী কাজ করে, তবে তাদের জন্যে তা কল্যাণকর হবে। (২৬৭ পৃঃ)

উদ্দেশ্য এই যে, এ আয়াতের বিশেষ সম্পর্ক হযরত আলীর সাথে ছিল। কিন্তু আয়াত থেকে "আলী সম্পর্কে" কথাটি বাদ দেওয়া হয়েছে।

পাঠকবর্গ এ প্রসঙ্গে উছুলে কাফীর আরও একটি রেওয়ায়েত দেখে নিন। এতে কোরআন পাকের দু ভিন্ন ভিন্ন জায়গার আয়াতে এ ধরনের পরিবর্তন দাবী করা হয়েছেঃ—

عن ابى جعفرعليه السلام قال نزل جبريل بهذه الاية هكذا-فابى ا كثر الناس بولاية على الاكفورا- قال و نزل جبريل بهذه الاية هكذا- وقل الحق من ربكم بولاية على فمن شاءفليؤمن ومن شاءفليكفر٠انا اعتدنا للظالمين آل محمد نارا ٥

ইমাম বাকের বলেনঃ সূরা বনী ইসরাঈলের ৮৯ আয়াতটি জিবরাঈল যেভাবে নিয়ে নাযিল হয়েছিল, তাতে اِلَّاكُفُوْرًا এর আগে بولاية على ছিল, যা বাদ দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেনঃ সূরা কাহফের ২৯ আয়াতটি জিবরাঈল এভাবে নিয়ে নাযিল হয়েছিল—

وقل الحق من ربكم في و لاية على فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا
اعتدنا للظالمين ال محمد نارا ٥

মতলব এই যে, এ আয়াত থেকে ال محمد ও فى ولاية على কলেমাগুলো বাদ দেওয়া হয়েছে। এসব রেওয়ায়েত উছুলে কাফীর একটি মাত্র অধ্যায় থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। এখন শিয়াদের এই বিশুদ্ধতম গ্রন্থের باب فضل القرآن অধ্যায়ের আরও একটি রেওয়ায়েত দেখুন। এটি এ অধ্যায়ের শেষ রেওয়ায়েত।

কোরআনের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ গায়েব করে দেওয়া হয়েছেঃ

عن هشام بن سالم عن ابى عبد الله عليه السلام قال ان القرآن الذى جاءبه جبريل عليه
السلام الى محمد صلى الله عليه واله سبعة عشرالف اية

হেশাম ইবনে সালেমের রেওয়ায়েতে ইমাম জাফর ছাদেক বলেনঃ জিবরাঈল যে কোরআন নিয়ে মোহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে নাযিল হয়েছিল, তাতে সতর হাজার আয়াত ছিল। (৬৭১ পৃঃ)

বর্তমান কোরআনে স্বয়ং শিয়া গ্রন্থকারদের লেখা অনুযায়ীও সর্বমোট আয়াত ছয় হাজারের কিছু উপরে—সাড়ে ছয় হাজারও নয়। উছুলে কাফীর ব্যাখ্যাতা আল্লামা কযভিনী এ রেওয়ায়েতের ব্যাখ্যায় বর্তমান কোরআনের আযাত সংখ্যা সম্পর্কে দু'টি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। এক উক্তি অনুযায়ী আয়াত সংখ্যা ৬৩৫৬ এবং অপর উক্তি অনুযায়ী ৬২৩৬— উপরোক্ত রেওয়ায়েতে ইমাম জাফর ছাদেক এরশাদ করেন যে, জিবরাঈল যে কোরআন নিয়ে নাযিল হয়েছিল, তার আয়াত সংখ্যা ছিল সতর হাজার। অতএব এ রেওয়ায়েত অনুযায়ী প্রায় দুই তৃতীয়াংশ আয়াত উধাও হয়ে গেছে। এজন্যেই আল্লামা কযভিনী লিখেনঃ

مراد اینست که بسیاری ازان قران ساقط شده ودر مصاحف مشهوره نیست

ইমাম জাফর ছাদেকের উক্তির অর্থ এটাই যে, জিবরাঈলের আনীত কোরআন থেকে অনেক অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে এবং তা কোরআনের বর্তমান প্রসিদ্ধ কপিসমূহে নেই।

এ প্রসঙ্গে হযরত আলীর একটি অদ্ভুত উক্তিঃ

শিয়া মযহাবের অন্যতম নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য গ্রন্থ ইহতিজাজে তবরিযীর উল্লেখ ইতিপূর্বেও কর হয়েছে। এতে জনৈক যিন্দীক তথা ধর্মদ্রোহী ব্যক্তির সাথে হযরত আলীর দীর্ঘ কথোপকথন উদ্ধৃত হয়েছে। একে ভাষান্তর করা হলে আমার অনুমান প্রায় ৫০/৬০ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা হয়ে যাবে। এই দীর্ঘ কথোপকথনে যিন্দীক কোরআন মজীদের বিরুদ্ধে অনেক আপত্তি উত্থাপন করেছে। হযরত আলী এগুলোর জওয়াব দিয়েছেন। তন্মধ্যে তার একটি আপত্তি এই ছিল যে, সূরা নেযার প্রথম রুকূর—

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتَامٰى فَانْكِحُوْا .... الاية

আয়াতের মধ্যে شرط ও جزاء এর মধ্যে যে সম্পর্ক হওয়া উচিত, তা নেই। (১২৪ পৃঃ) হযরত আলীর বাচনিক ইহতিজাজে এর জওয়াব এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে—

هو مما قدمت ذكره من اسقاط المنافقين من القران وبين القول فى
اليتامى وبين نكاح النساء من الخطاب والقصص اكثر من ثلث القران ٥

পূর্বে আমি যে কথা উল্লেখ করেছি, এটা তারই একটি দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ, মুনাফিকরা কোরআন থেকে অনেক কিছু বাদ দিয়েছে। এ আয়াতে তারা এই করেছে যে, ان خفتم فى اليتامى এবং فانكحوا ما طاب لكم من النساء এর মধ্যে এক তৃতীয়াংশ কোরআনেরও বেশী ছিল, যা বাদ দেওয়া হয়েছে। এতে সাম্বোধন ও কিসসা-কাহিনী ছিল। (১২৮ পৃঃ)
এ রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত আলী বলেছেন যে, এই এক আয়াতের মাঝখান থেকে মুনাফিকরা এক তৃতীয়াংশ কোরআনের চেয়েও বেশী বাদ দিয়েছে। এতে অনুমান করা যায় যে, সমগ্র কোরআন থেকে কতটুকু বাদ দেওয়া হয়েছে।
এ কথোপকথনে যিন্দীকের অন্যান্য কয়েকটি আপত্তির জওয়াবেও হযরত আলী মুর্তযা কোরআনে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের উল্লেখ করেছেন। তার এক আপত্তির জওয়াবে তিনি একথাও বলেছেন যে, এ ব্যাপারে এ স্থলে তুমি যে জওয়াব আমার কাছ থেকে শুনেছ, তাই তোমার জন্যে যথেষ্ট হওয়া উচিত। কেননা, আমাদের শরীয়তে তাকিয়্যার যে নির্দেশ আছে, তা এর বেশী স্পষ্ট করে বলার পথে অন্তরায়। (১২৫ পৃঃ)
বাহ্যতঃ উদ্দেশ্য এই যে, যে মুনাফিকরা কোরআনে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেছে, তাদের নাম প্রকাশ করার পথে তাকিয়্যার আদেশ অন্তরায়। আশ্চর্যের কথা, কোরআনে পরিবর্তনের আকীদা প্রকাশ করার পথে তাকিয়্যা অন্তরায় হলনা ; কিন্তু পরিবর্তনকারীদের নাম প্রকাশ করার পক্ষে তাকিয়্যা অন্তরায় হয়ে গেল! আসল কথা এই যে, এই কথোপকথন এবং এ ধরনের সকল রেওয়ায়েত সম্পূর্ণ মনগড়া। হযরত আলী এবং আহলে বায়তের সকল বুযুর্গের আচল এসব প্রলাপোক্তি থেকে পাক ও পবিত্র।

আসল কোরআন তাই, যা হযরত আলী সংকলন করেছিলেন। সেটা অন্তর্হিত ইমামের কাছে আছে এবং বর্তমান কোরআন থেকে ভিন্নঃ

এটাও শিয়া মযহাব ও শিয়া দুনিয়ার অন্যতম প্রসিদ্ধ স্বীকৃত বিষয় যে, হযরত আলী কোরআন সংকলন করেছিলেন এবং সেটা সেই কোনআনের সম্পূর্ণ অনুরূপ ছিল, যা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি নাযিল, হয়েছিল এবং বর্তমান কোনআন থেকে ভিন্নতর ছিল। সেটা হযরত আলীর কাছেই ছিল এবং তার পরে তার সন্তানদের মধ্য থেকে ইমামগণের কাছে ছিল। এখন সেটা অন্তর্হিত ইমামের কাছে রয়েছে। তিনি যখন আত্মপ্রকাশ করবেন, তখন সেই কোরআনও প্রকাশ করবেন। এর আগে কেউ সেটা দেখতে পাবে না। এ প্রসঙ্গে উছুলে কাফীর নিম্নোক্ত দু'টি রেওয়ায়েত পাঠকবর্গকে উৎসর্গ করছি। এ গ্রন্থের একটি অধ্যায় এইঃ—

باب انه لم يجمع القران كله الاالا ئمة عليهم السلام

(এ বিষয়ের বর্ণনা যে, সমগ্র কোরআন ইমামগণ ব্যতীত কেউ সংকলন করেনি ; অর্থাৎ পূর্ণ কোরআন ইমামগণ ছাড়া কারও কাছে ছিল না এবং নেই।)

এ অধ্যায়ের প্রথম রেওয়ায়েতে ইমাম বাকের বলেনঃ

مادعى احدمن الناس انه جمع القران كله كما انزل الاكذاب وماجمعه وحفظه كما انزله الله الاعلى بن ابى طالب والائمة من بعد ٠

যে ব্যক্তি দাবী করে যে, তার কাছে পূর্ণ কোরআন রয়েছে যেভাবে তা নাযিল হয়েছিল, সে মিথ্যাবাদী। আল্লাহতাআলার নাযিল করা অনুযায়ী কোরআন কেবল আলী ইবনে আবী তালেবই এবং তার পরে ইমামগণ সংকলন করেছেন এবং সংরক্ষণ করেছেন। (১৩৯ পৃঃ)
এ গ্রন্থেরই باب فضل القران এ ইমাম জাফর ছাদেক থেকে রেওয়ায়েত এইঃ
যখন ইমাম মেহদী আত্মপ্রকাশ করবেন, তখন তিনি কোরআনকে আসল ও বিশুদ্ধরূপে পাঠ করবেন। তিনি কোরআনের সেই কপি বের করবেন, যা আলী (আঃ) সংকলন করেছিলেন। ইমাম জাফর ছাদেক আরও বলেনঃ যখন আলী (আঃ) সেই কোরআন লিখে সমাপ্ত করেন, তখন লোকদেরকে (অর্থাৎ আবু বকর, ওমর প্রমুখকে) বললেনঃ এটা আল্লাহর কিতাব, ঠিক তেমনটি, যেমনটি আল্লাহ্ মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি নাযিল করেছিলেন। আমি এটি লওহায়ন থেকে সংকলন করেছি। তখন তারা বললঃ আমাদের কাছে পূর্ণাঙ্গ মছহাফ বিদ্যমান আছে। এতে পূর্ণ কোরআন রয়েছে। তোমার সংকলিত এ কোরআনের প্রয়োজন আমাদের নেই। আলী (আঃ) বললেনঃ আল্লাহর কসম, আজিকার দিনের পর তোমরা কখনও একে দেখতেও পারবে না। (৬৭১ পৃঃ)
মোটকথা, শিয়া গ্রন্থাবলীর এসব রেওয়ায়েতে বর্তমান কোরআনে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের কথা বলা হয়েছে; বিশেষভাবে কতক রেওয়ায়েতে কোরআন থেকে হযরত আলী ও ইমামগণের নাম বাদ দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এসব রেওয়ায়েত শিয়াদের পক্ষ থেকে এ প্রশ্নের বোধগম্য জওয়াব পেশ করে যে, ইমামত আকীদা, তওহীদ ও রেসালতের ন্যায় বুনিয়াদী আকীদা হলে এর উল্লেখ কোরআনে করা হল না কেন? আমি এর ভিত্তিতেই বলেছিলাম যে, কোরআনে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের আকীদা শিয়া সমহাবের বুনিয়াদ ও ভিত্তি, ইমামত আকীদার অন্যতম অপরিহার্য ফলশ্রুতি। এ ছাড়া এ আকীদা রচনা করার এক বিশেষ কারণও লক্ষ্য হচ্ছে—শায়খায়ন ও সুন্নুরায়নকে খেলাফত ও ফদকের সম্পত্তি ছিনিয়ে নেওয়ার অপরাধ ছাড়াও আল্লাহর কিতাবে পরিবর্তনের অপরাধীও সাব্যস্ত করা, যা নিশ্চিতই গুরুতর অপরাধ ও ঘোরতর কুফর।

পরিবর্তন ও পূর্ববর্তী শিয়া আলেমগণঃ

শিয়াদের খাতেমুন মুহাদ্দিসীন, মহা ভাষ্যকার আল্লামা বাকের মজলিসীর যমানা অর্থাৎ, হিজরী দশম-একাদশ শতাব্দী বরং এর পর পর্যন্তও শিয়া আলেমগণ প্রকাশ্যে তাদের এই আকীদা প্রকাশ করতেন বরং তাদের রচনাবলীতে যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত করতে সচেষ্ট হতেন যে, বর্তমান কোরআন পরিবর্তিত। এতে সর্বপ্রকার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে। তাদের

মতে হযরত আলী কর্তৃক সংকলিত কোরআন ছিল আসল কোরআন, যা এখন শেষ যমানার ইমামের কাছে রয়েছে।

আল্লামা নূরী তবরিযীর "কছলুল খেতাব"ঃ

পূর্ববর্তী শিয়া আলেমগণের রচনাবলী সংগ্রহ করে অধ্যয়ন করা আমাদের জন্যে সহজ বরং সম্ভবপর ছিল না। আল্লাহ তাআলা এর এই ব্যবস্থা করেন যে, এখন থেকে প্রায় সোয়াশ' বছর পূর্বে যখন শিয়া আলেমগণ সাধারণভাবে পরিবর্তনের আকীদা অস্বীকার করার নীতি অবলম্বন করেন এবং এ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সুন্নীদের অনুরূপ আকীদা প্রকাশ করতে থাকেন, তখন একজন বড় শিয়া আলেম, মুহাদ্দিস ও মুজতাহিদ আল্লামা নূরী তবরিযী অনুভব করলেন যে, এটা মূল মযহাব থেকে বিচ্যুতি এবং নিষ্পাপ আলেমগণের একটি দু'টি নয়, শ'য়ে শ'য়েও নয়, হাজারো উক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। (তখন এ ব্যাপারে শিয়াদের তাকিয়্যা করারও কোন প্রয়োজন ছিল না।) এটা অনুভব করে তিনি এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র মোটা গ্রন্থ হযরত আলীর দিকে সম্বন্ধযুক্ত নজফে আশরাফ শহরে মাশহাদে আমিরুল মুমিনীনে বসে রচনা করলেন (১) এবং এর নাম فصل الخطاب فى اثبات تحريف كتاب رب الارباب এটা এত বিরাটকায় গ্রন্থ যে, এর ভাষান্তর করা হলে এর পৃষ্ঠা সংখ্যা আনুমানিক এক হাজারের কম হবে না— কিন্তু বেশীই হবে। গ্রন্থকার আল্লামা নূরী তবরিযী তার শিয়া দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী রাশি রাশি যুক্তি দ্বারা এ কথা প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছেন যে, বর্তমান কোরআনে পরিবর্তন হয়েছে এবং সর্বপ্রকার পরিবর্তন হয়েছে। এ থেকে অনেক অংশ বাদও দেওয়া হয়েছে। পরিবর্তনকারী চক্র (অর্থাৎ খলিফাত্রয় ও তাদের সঙ্গীরা) এতে নিজেদের পক্ষ থেকে সংযোজনও করেছে। নিষ্পাপ ইমামগণের হাজারো রেওয়ায়েত একথাই বলে এবং আমাদের পূর্ববর্তী আলেমগণের আকীদা ও অভিমত তাই ছিল। তারা তাদের রচনাবলীতে পরিষ্কার ভাষায় এ আকীদা প্রকাশ করেছেন, বরং প্রমাণাদী দ্বারা সপ্রমাণ করেছেন। গ্রন্থাকার লিখেছেন, আমাদের পূর্ববর্তী আলেমগণের মধ্যে কেবল চার জন আলেম এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন। তাদের স্তরে তাদের সাথে কোন পঞ্চম ব্যক্তিও নেই। এর পর এই চার জন আলেম তাদের এ ভূমিকা সপ্রমাণ করার জন্যে যা লিখেছিলেন, আল্লামা নূরী তার জওয়াবও দিয়েছেন, যা শিয়াদের জন্যে সন্তোষজনক হওয়া উচিৎ।

মোটকথা, এটি একটি দস্তাবেজ, যা দেখার পর কোন ন্যায়বিচারসম্পন্ন ব্যক্তির জন্যে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, শিয়া মযহাব ও নিষ্পাপ ইমামগণের উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান কোরআন অকাট্যরূপে পরিবর্তিত। এতে এমন পরিবর্তন হয়েছে, যেমন এর আগে তওরাত, ইনজীল ইত্যাদি আসমানী কিতাবসমূহে হয়েছিল। আরও সন্দেহাতীতরূপে বুঝা যায়

(১) গ্রন্থের উপসংহারে গ্রন্থকার লিখেছেন যে, তিনি এর রচনা ১২৯২ হিজরী জমাদিউস সানী মাসে সমাপ্ত করেছেন।

যে, পূর্ববর্তী সাধারণ শিয়া আলেমদের এটাই অভিমত ও আকীদা ছিল। যদি এ বিষয় সম্পর্কিত এ গ্রন্থের সকল কথা উদ্ধৃত করা হয়, তবে তার জন্যে পঞ্চাশ পৃষ্ঠাও অপর্যাপ্ত হবে বলে অনুমান করা যায়। তাই নমুনাস্বরূপ এখানে কয়েকটি কথাই উদ্ধৃত করছি।

কোরআনে তওরাত ও ইঞ্জিলের ন্যায় পরিবর্তন হয়েছেঃ

গ্রন্থকার নম্বর দিয়ে দিয়ে সেইসব প্রমাণ উল্লেখ করেছেন, যেগুলো দ্বারা কোরআনে পরিবর্তন প্রমাণিত হয়। এ প্রসঙ্গে চতুর্থ নম্বরে তিনি এমন কতগুলো রেওয়ায়েতের বরাত দিয়েছেন, যেগুলো ব্যক্ত করে যে, তওরাত ও ইঞ্জিলের মতই কোরআনে পরিবর্তন হয়েছে। তিনি লিখেনঃ

الامر الرابع ذكراخبارخاصة فيها دلالة او اشارة على كون القران كالتوراة والانجيل في وقوع التحريف والتغيير فيه وركوب المنافقيق الذين استولوا على الامة فيه طريقة بنى اسرائيل فيهماوهى حجة مستقلة لا ثبات المطلوب ٥

চতুর্থ বিষয় সেইসব বিশেষ রেওয়ায়েতের উল্লেখ, যেগুলো পরিষ্কারভাবে অথবা ইঙ্গিতে একথা বুঝায় যে, পরিবর্তিত হওয়ার ব্যাপারে কোরআন তওরাত ও ইঞ্জিলের মতই। আরও বুঝায় যে, যে সকল মুনাফিক উম্মতের উপর প্রবল হয়ে তাদের শাসক হয়ে যায় (আবু বকর, ওমর প্রমুখ), তারা কোরআনে পরিবর্তন সাধনের ব্যাপারে সেই পথেই অগ্রসর হয়, যে পথে অগ্রসর হয়ে বনী ইসরাইল তওরাত ও ইঞ্জিলে পরিবর্তন করেছিল। এটা আমাদের দাবীর পক্ষে একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ। (৭০ পৃঃ)

পূর্ববর্তী শিয়া আলেম সকলেই পরিবর্তনের প্রবক্তা ও দাবীদার, কেবল চার জন আলেম পরিবর্তন অস্বীকার করেনঃ

আল্লামা নূরী তবরিযী "ফছলুল খেতাব" গ্রন্থেই المقدمة الثالثة শিরোনামের অধীনে লিখেনঃ কোরআনে পবির্তন হয়েছে কি না, এ প্রশ্নে আমাদের আলেমগণের দু'টি উক্তি প্রসিদ্ধ। এরপর এর বিবরণ দিতে যেয়ে বলেনঃ

الاول وقوع التغيير والنقصان فيه وهو مذهب الشيخ الجليل على بن ابراهيم القمى شيخ الكلينى فى تفسيره صرح ذلك فى اوله وملأ كتابه من خباره مع التزامه فى اوله بان لايذكر فيه الامارواه مشائخه وثقته ومذهب تلميذه ثقة الاسلام الكلينى رحمه الله على مانسبه اليه

جماعة لنقله الاخبار الكثيرة الصريحة فى هذا المعنى فى كتاب الحجة خصوصافى باب النكت والنتف من التنزيل والروضة من غيرتعرض لردهااو تاويلها ٥

প্রথম উক্তি এই যে, কোরআনে পরিবর্তন ও ত্রুটি হয়েছে; (অর্থাৎ, তার কিছু অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে)। এটা আবু জাফর এয়াকুব কুলাইনীর ওস্তাদ শায়খ আলী ইবনে ইবরাহীম কুম্মীর মযহাব। তিনি তার তফসীরের শুরুতেই বিষয়টি পরিষ্কার ভাষায় লিখেছেন এবং পবির্তনের রেওয়ায়েত দ্বারা গ্রন্থটি ভরে দিয়েছেন। তিনি এ নীতি কঠোরভাবে পালন করেছেন যে, তার এ গ্রন্থে কেবল সেইসব রেওয়ায়েত উল্লেখ করা হবে, যা তিনি তার মাশায়েখ ও নির্ভযোগ্য ব্যক্তিগণ থেকে রেওয়ায়েত করেন। এটা তার শিষ্য ছেকাতুল ইসলাম কুলাইনীরও মযহাব। একদল আলেম তার দিকে এ মযহাব সম্বন্ধযুক্ত করেছেন। কেননা, তিনি তার গ্রন্থ আল জামেউল কাফীতে কিতাবুল হুজ্জায় বিশেষতঃ باب النكت والنتف فى التنزيل এবং কিতাবুর রওযায় বহু সংখ্যক রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন, যা পরিষ্কারভাবে পরিবর্তন বুঝায়। তিনি এসব রেওয়ায়েতের খণ্ডনও করেননি এবং কোন অন্য অর্থও বর্ণনা করেননি। (২৫ পৃঃ)
(আমি আরয করছি— যে ব্যক্তি আল জামেউল কাফীর চারটি খণ্ডই অধ্যয়ন করেছে অথবা কেবল পরিবর্তন সম্পর্কিত আমাদের পূর্বোল্লিখিত রেওয়ায়েতগুলোই দেখেছে, তার এ বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে না যে, গ্রন্থকার আবু জাফর কুলাইনী কোরআনে পরিবর্তনের একজন প্রবক্তা। তিনি এ গ্রন্থে ইমামগণের রেওয়ায়েত দ্বারা পরিবর্তনের এমন প্রমাণ সরবরাহ করেন, যার পরে শিয়াদের এটা অস্বীকার করার অবকাশ থাকে না।)
আল্লামা নূরী তবরিযী পরিবর্তনের প্রবক্তা পূর্ববর্তী আলেমগণের মধ্যে সর্বপ্রথম আবু জাফর এয়াকুব কুলাইনী ও তার ওস্তাদ শায়খ আলী ইবনে ইবরাহীম কুম্মীর নাম উল্লেখ করেছেন। প্রকাশ থাকে যে, এ দু'জনই (শিয়া মতবাদ অনুযায়ী) গায়বতে ছুগরার সম্পূর্ণ সময়কাল পেয়েছেন, বরং তাদের জীবনী লেখকদের বর্ণনা অনুযায়ী তারা উভয়েই একাদশতম ইমাম হাসান আসকারীরও কিছু যমানা পেয়েছেন।
এরপর তবরিযী পূর্ণ পাঁচ পৃষ্ঠায় আরও অনেক পূর্ববর্তী আলেমের নাম উল্লেখ করেছেন, যারা তাদের রচনাবলীতে পরিবর্তন দাবী করেছেন। তাদের সংখ্যা ত্রিশ-চল্লিশের কম হবে না। এর পর নূরী তবরিযী লিখেনঃ

ومن جميع ماذكرنا ونقلنا بتتبعى القاصريمكن دعوى الشهرة العظيمة بين المتقدمين . . . . نعم خالف فيها المرتضى والصدوق والشيخ الطبرسى ٥

আমরা আমাদের সীমিত অনুসন্ধান ও সীমিত অধ্যয়ন দ্বারা (পরিবর্তন সম্পর্কে পূর্ববর্তী শিয়া আলেমগণের) যে সকল উক্তি উদ্ধৃত করেছি, তার ভিত্তিতে দাবী করা যায় যে, আমাদের পূর্ববর্তী আলেমগণের এ মযহাবই সাধারণভাবে প্রসিদ্ধ ছিল (অর্থাৎ, কোরআনের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছে)। এর বিরোধিতাকারী মাত্র কয়েকজন নির্দিষ্ট ও জানা ব্যক্তি ছিল, যাদের নাম পরে উল্লেখ করা হচ্ছে। সাইয়েদ নেয়ামতুল্লাহ জাযায়েরী আল আনওয়ার গ্রন্থেয় বলেনঃ আমাদের আছহাবগণ এ বিষয়ে একমত যে, যে সকল মশহুর ও মুতাওয়াতির রেওয়ায়েত

পরিষ্কার ব্যক্ত করে যে, কোরআনে পবির্তন হয়েছে বাক্যে, ভাষায় এবং এরাবেও— সেগুলো ছহীহ্ রেওয়ায়েত। এসব রেওয়ায়েত অনুযায়ী আকীদা রাখার ব্যাপারেও আমাদের আছহাবগণের মধ্যে মতৈক্য রয়েছে। হ্যাঁ, এ ব্যাপারে কেবল শরীফ মুরতাযা, ছদূক ও শায়খ তবরিযী মতভেদ করেছেন।

এরপর মতভেদকারীদের মধ্যে গ্রন্থকার চতুর্থ ব্যক্তি ইমাম জাফর তূসীর নামও উল্লেখ করেছেন এবং তাদের বাক্যাবলী উদ্ধৃত করে জওয়াবও দিয়েছেন।

লক্ষ্যণীয় যে, এ চার জন আলেম আবু জাফর এয়াকুব কুলাইনী ও তার ওস্তাদ আলী ইবনে ইবরাহীম কুম্মীর অনেক পরবর্তী আলেম। তাদের মধ্যে সকলের পরবর্তী হচ্ছেন শায়খ তবরিযী। (মৃঃ ৫৪৮ হিঃ) পরিবর্তন অস্বীকার প্রসঙ্গে তিনি যা লিখেছেন, তার জওয়াব দেওয়ার পর গ্রন্থকার আল্লামা নূরী লিখেনঃ

আবু আলী তবরিযীর স্তর পর্যন্ত (অর্থাৎ, হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত) এই চারজন মাশায়েখ ছাড়া কারও সম্পর্কে জানা যায়নি যে, তিনি কোরআনে পরিবর্তন হওয়ার ব্যাপারটি পরিষ্কার অস্বীকার করেছেন। (৩৪ পৃঃ)

এছাড়া গ্রন্থকার এ প্রসঙ্গে অন্য এক জায়গায় এই চারজনের (ছাদুক, শরীফ মুরতজা, আবু জাফর তূসী ও আবু আলী তবরিযী) অন্য সকল পূর্ববর্তী শিয়া আলেমদের সাথে মতভেদ উল্লেখ করে লিখেন ঃ ولم يعرف من القدماء خامس لهم আমাদের পূর্ববর্তী আলেমগণের মধ্যে কোন পঞ্চম ব্যক্তি তাদের সমমনা বলে জানা যায়নি। (৩২ পৃঃ)

এসব উদ্ধৃতি দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য পাঠকবর্গকে কেবল এটা দেখানো ছিল যে, পূর্ববর্তী শিয়া আলেমগণ সাধারণভাবে এ আকীদা রাখতেন যে, বর্তমান কোরআন হুবহু সেই কোরআন নয়, যা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল; বরং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পরে যারা জোর জবরে খেলাফত দখল করে নেয়, তারা এতে পরিবর্তন ও হ্রাসবৃদ্ধি করেছে। এ দাবী প্রামাণ করার জন্যে ফছলুল খেতাব গ্রন্থের উপরোক্ত উদ্ধৃতিও যথেষ্ট। কিন্তু এ প্রসঙ্গে এ গ্রন্থ থেকেই আরও কয়েকটি উদ্ধৃতি পাঠকবর্গের সামনে পেশ করা সমীচীন মনে হয়। আমি আরয করেছিলাম যে, গ্রন্থকার তার আকীদা ও দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী কোরআনে পরিবর্তন হওয়ার পক্ষে রাশি রাশি প্রমাণ পেশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি ১২নং প্রমাণ পেশ করতে যেয়ে লিখেনঃ

পরিবর্তনের রেওয়ায়েত দু'হাজারেরও অধিক ঃ

الد ليل اثلى عشرالاخبار الواردة فى الموارد المخصوصة من القران الدالة على تغيير بعض الكلمات والايات والسور باحدى الصور المتقد مة وهى كثيرة جدا حتى قال السيد نعمت الله الجزائرى فى بعض مؤلفاته كماحكى عنه ان الاخبار الدالة على ذلك تزيد على الفى حديث وادعى استفا ضتها جماعة كالمفيد والمحقق الداماد والعلامة المجلسى وغيرهم

দ্বাদশতম প্রমাণ সেইসব রেওয়ায়েত, যা কোরআনের বিশেষ বিশেষ স্থান সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। এগুলো ব্যক্ত করে যে, কোরআনের কতক কলেমা, আয়াত ও সূরার মধ্যে উপরোল্লিখিত প্রকারসমূহের মধ্য থেকে কোন এক প্রকারে পরিবর্তন করা হয়েছে। এ ধরনের রেওয়ায়েত অনেক। এমনকি, আমাদের স্বনামখ্যাত মুহাদ্দিস সাইয়েদ নেয়ামতুল্লাহ্ জাযায়েরী তার কোন কোন গ্রন্থে বলেছেন, যেমন তার কাছ থেকে বর্ণিত আছে যে, কোরআনে পরিবর্তন ব্যক্তকারী রেওয়ায়েতসমূহের সংখ্যা দু'হাজারেরও অধিক। আমাদের একদল আলেম, যেমন শায়খ মুফিদ, মুহাক্কিক দামাদ ও আল্লামা মজলিসী এসব রেওয়ায়েত মশ্হূর বলে দাবী করেছেন। শায়খ তূসীও তিবইয়ান গ্রন্থে পরিষ্কার লিখেছেন যে, এসব রেওয়ায়েতের সংখ্যা অনেক বেশী। বরং আমাদের একদল আলেম, যাদের কথা পরে আসবে— দাবী করেছেন যে, এসব রেওয়ায়েত মুতাওয়াতির। (২২৭ পৃঃ)

মুতাওয়াতির বলে দাবীকারী শিয়া আলেমঃ

এর পর গ্রন্থের উপসংহারে সেই প্রধান শিয়া আলেমগণের কথা গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন, যারা দাবী করেন যে, কোরআনে পরিবর্তন ব্যক্তকারী রেওয়ায়েতসমূহ মুতাওয়াতির। শিয়া হাদীস গ্রন্থসমূহের দিক দিয়ে তাদের এ দাবী নিঃসন্দেহে নির্ভুল। গ্রন্থকার লিখেনঃ

وقد ادعى تواتره (اى تواتروقوع التحريف والتغيروالنقص) جماعة منهم المولى محمدصالح فى شرح الكافى حيث قال فى شرح ماورد ان القران الذى جاءبه جبريل الى النبى(ص) سبعة عشرالف اية وفى رواية سليم ثمانية عشرالف اية مالفظه و اسقاط بعض القران وتحريفه ثبت من طرقنا بالتواترمعنى كما يظهر لمن تامل فى كتب الاحاديث من اولهاالى اخرها ومنهم الفاضل قاضى القضاة على بن عبدالعا لى على ماحكى عنه السيد فى شرح الوافية بعد ما اورد على اكثر تلك الاخبار بضعف الاسناد ما لفظه ان ايراد اكابر الاصحاب لاخبارنا فى كتبهم المعتبرة التى ضمنواصحة مافيها قاض صحتها فان لهم طرقا تصحهامن غير جهة الرواة كالاجماع على مضمون المتن واحتفائه بالقرائن المفيدة للقطع. . . . .

ومنهم الشيخ المحدث البجليل ابوالحسن الشريف فى مقدمات تفسيره

ومنهم العلامة المجلسى قال فى مرآة العقول فى شرح باب انه لم يجمع القران كله الاالائمة عليهم السلام بعد نقل كلام المفيد مالفظه والاخبارمن طرق الخاصة والعامة فى النقص والتغيير متواترة وبخطه على نسخة من الكافى كان يقرؤها على والده وعليها خطهما فى اخركتاب فضل القران عند قول الصادق القران الذى جاء به جبريل على محمدسبعة

عشر الف اية مالفظه لايخفى ان هذا الخبر وكثيرمن الاخبار الصحيحة صريحة فى نقص القران وتغييره وعندى ان هذا الخبر فى هذا الباب متواترة معنى وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الاخبار رأسا- بل ظنى ان الاخبار فى هذا الباب لايقصر عن اخبار الامامة فكيف يثبتونها بالخبر ٥

আমাদের একদল শীর্ষস্থানীয় আলেম কোরআনে পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও তাকে ত্রুটিপূর্ণ করা সম্পর্কিত রেওয়ায়েতসমূহ মুতাওয়াতির বলে দাবী করেছেন। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন মাওলা মোহাম্মদ ছালেহ। তিনি কাফীর টীকায় একটি হাদীসের ব্যাখ্যা করেছেন। হাদীসটি এইঃ যে কোরআন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রতি জিবরাইল নিয়ে এসেছিল, তাতে সতর হাজার আয়াত ছিল। সুলায়মের রেওয়ায়েতে এ হাদীসেই আয়াত সংখ্যা সতর হাজারের স্থলে আঠার হাজার বলা হয়েছে। এ হাদীসের টীকায় মওলা ছালেহ বলেনঃ কোরআনে পরিবর্তন এবং তার কতক অংশ বাদ দেওয়ার বিষয়টি আমাদের তরিকায় অর্থগত দিক দিয়ে মুতাওয়াতির বলে প্রমাণিত। যে আমাদের হাদীসগ্রন্থসমূহ আদ্যোপান্ত গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছে, তার জন্য এটা সুস্পষ্ট। শীর্ষস্থানীয় আলেমগণের মধ্যে আরও একজন হচ্ছেন প্রধান বিচারপতি আলী ইবনে আবদুল আলী। ওয়াফিয়ার টীকায় সাইয়েদ তার কাছ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি এগুলোর মধ্য থেকে অধিকাংশ রেওয়ায়েতের সনদ অগ্রাহ্য হওয়ার কথা উল্লেখ করার পর লিখেছেনঃ আমাদের শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিসগণ নিজেদের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহে যেসব রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন তাদ্বারা প্রমাণ হয় যে, এসব রেওয়ায়েত ছহীহ্। কেননা, এগুলোর জন্যে আরও তরিকা আছে যা, সনদের অবস্থা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়েও এসব রেওয়ায়েতের বিশুদ্ধতা সপ্রমাণ করে। উদাহরণতঃ রেওয়ায়েতের মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে ইজমা ও মতৈক্য হওয়া এবং এমন ইঙ্গিত উপস্থিত থাকা, যদ্বারা বিষয়বস্তুর নিশ্চয়তা অর্জিত হয়। শীর্ষস্থানীয় আলেমগণের মধ্যে আরও একজন হচ্ছেন শায়খ মুহাদ্দিস জলীল আবুল হাসান শরীফ। তিনিও তার তফসীরের ভূমিকায় এসব রেওয়ায়েতকে অর্থগতভাবে মুতাওয়াতির বলে দাবী করেছেন। তাদের মধ্যে আল্লামা মজলিসীও একজন। তিনি তার مرأة العقول গ্রন্থে উছুলে কাফীর অধ্যায় باب انه لم يجمع القران كله الا الائمة عليهم السلا এর ব্যাখ্যায় শায়খ মুফীদের উক্তি উদ্ধৃত করার পর লিখেছেনঃ কোরআনে পরিবর্তন সম্পর্কে শিয়া অশিয়াদের সনদ দ্বারা বর্ণিত রেওয়ায়েতসমূহ মুতাওয়াতির। উছুলে কাফীর যে কপিটি তিনি তার পিতার সামনে পাঠ করেন, তার فضل القران এর উপসংহারে ইমাম জাফর ছাদেকের এই উক্তি রেওয়ায়েত করা হয়েছে— যে কোরআন জিবরাঈল মোহাম্মদ (সঃ)-এর কাছে এনেছিল, তাতে সতর হাজার আয়াত ছিল। এ স্থলে আল্লামা মজলিসী স্বয়ং লিখেছেনঃ বলা বাহুল্য, এই হাদীস এবং এছাড়া অনেক ছহীহ্ হাদীস পরিষ্কার ব্যক্ত করে যে, কোরআনে পরিবর্তন ও হ্রাস-বৃদ্ধি করা হয়েছে। এরপর তিনি লিখেনঃ আমার মতে এ অধ্যায়ের রেওয়ায়েতসমূহ অর্থগতভাবে মুতাওয়াতির। এগুলোকে উপেক্ষা করার ফলে এই হবে যে, রেওয়ায়েতের উপর থেকে আস্থা সম্পূর্ণ উঠে যাবে। বরং আমার ধারণা এই যে, কোরআনে পরিবর্তন সম্পর্কিত রেওয়ায়েত ইমামত

সম্পর্কিত রেওয়ায়েত থেকে কম নয়। সুতরাং এগুলোকে উপেক্ষা করা হলে রেওয়ায়েত দ্বারা ইমামত সপ্রমাণ করা যাবে কিরূপে? (৩২৮-৩২৯ পৃঃ)

পরিবর্তন সম্পর্কিত রেওয়ায়েতের ব্যাপারে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কথা ঃ

আল্লামা নূরী তবরিযী বর্ণিত যে সকল রেওয়ায়েত উপরে উদ্ধৃত করা হল, এগুলোতে তিনটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পরিষ্কারভাবে লিখা হয়েছে। এ সম্পর্কে চিন্তা করার সময় এগুলো সামনে রাখা জরুরী।

(১) কোরআনে পরিবর্তন ও হ্রাসবৃদ্ধি সম্পর্কিত রেওয়ায়েতসমূহ মুতাওয়াতির যা তাদের ইমামগণের উক্তি। সাইয়েদ নেয়ামতুল্লাহ জাযায়েরীর বর্ণনা অনুযায়ী এগুলোর সংখ্যা দু'হাজারেরও বেশী। আল্লামা মজলিসীর বর্ণনা মোতাবেক এগুলোর সংখ্যা শিয়া মযহাবের ভিত্তি ইমামত সম্পর্কিত রেওয়ায়েতের চেয়ে কম নয়— বেশীই।

(২) এ সকল রেওয়ায়েত এবং ইমামগণের এ সকল উক্তি কোরআনে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনকে এমন স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে যে, এরপর কারও জন্যে সন্দেহ-সংশয় ও অন্য অর্থ করার অবকাশ থাকে না।

(৩) পূর্ববর্তী শিয়া আলেমগণের আকীদা তাই ছিল। কেবল চারজন আলেম এ ব্যাপারে মতভেদ করেছেন।

কোন শিয়া আলেমের জন্যে পরিবর্তন অস্বীকার করার অবকাশ আছে কি?ঃ

পরিবর্তন সম্পর্কে ইমামগণের হাজারো রেওয়ায়েতের উপস্থিতি, এসব রেওয়ায়েত সম্পর্কে শীর্ষস্থানীয় আলেমগণের এই স্বীকারোক্তি যে, এগুলো মুতাওয়াতির, পরিস্কাররূপে পরিবর্তন জ্ঞাপন করে এবং পরিবর্তন হয়েছে বলেই পূর্ববর্তী আলেমগণের আকীদা ছিল, এসব বিষয় সত্ত্বেও কোন আলেম ও ওয়াকিফহাল শিয়ার জন্যে পরিবর্তন অস্বীকার করার অবকাশ থাকে কি না, এখানে তাই প্রণিধানযোগ্য বিষয়। বলা বাহুল্য, এরূপ কোন অবকাশ নেই। হাঁ, তাকিয়্যার ভিত্তিতে অস্বীকার করা যায়; যেমন শিয়া রেওয়ায়েত অনুযায়ী ইমামগণ তাকিয়্যার ভিত্তিতে নিজেদের ইমামতও অস্বীকার করেছেন। তাই অনুমান এই যে, উপরোক্ত চারজন আলেম তাকিয়্যার ভিত্তিতেই পরিবর্তন অস্বীকার করেছেন।

শিয়া জগতে আল্লামা নূরী তবরিযীর স্থান ও মর্তবা ঃ

আমরা এখানে পাঠকবর্গকে এ কথা বলে দেওয়াও সমীচীন মনে করি যে, ফছলুল খেতাবের গ্রন্থকার আল্লামা নূরী তবরিযী—যিনি কোরআন মজীদে সর্বপ্রকার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সপ্রমাণ করার জন্যে এ গ্রন্থ লিখেছেন—শিয়া জগতে তিনি অপরিসীম পবিত্রতা ও মাহাত্ম্যের মর্যাদায় আসীন ছিলেন। ১৩২০ হিজরীতে তার ইন্তেকাল হলে তাকে নজফে আশরাফে হযরত আলী (রাঃ)-এর সমাধি প্রাচীরে দাফন করা হয়, যা শিয়াদের মতে اقدس البقاع অর্থাৎ, ভূপৃষ্ঠের পবিত্রতম স্থান।

আল্লামা নূরী তার আমলে শিয়াদের একাধারে মুজাতাহিদে আযম ও মুহাদ্দিসে আযম ছিলেন। তার সংকলিত হাদীসের একটি গ্রন্থ হচ্ছে "মুস্তাদরাকুল ওছায়েল।" পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম রুহুল্লাহ খোমেনী তার الحكومة الاسلامية গ্রন্থে, আপন মতবাদ ولاية فقيه প্রসঙ্গে এ গ্রন্থের বরাতও দিয়েছেন এবং সেখানে আল্লামা নূরীর নাম পূর্ণ শ্রদ্ধা সহকারে উল্লেখ করেছেন। অথচ তিনি তার কিতাব "ফছলুল খেতাব" সম্পর্কে অবশ্যই ওয়াকিফহাল আছেন এবং প্রত্যেক শিয়া আলেমই এটা জানে।

ফছলুল খেতার সম্পর্কে এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে, হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন এ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তখন ইরান ও ইরাকের শিয়া আলেমদের পক্ষ থেকে এর বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিবাদের ঝড় উঠে। কারণ, তারা পরিবর্তন আকীদা অস্বীকার করার নীতিতে বিশ্বাসী ছিল। তারা এ গ্রন্থের জওয়াবও লিখে প্রকাশ করে। আল্লামা তবরিযী এর জওয়াবেও স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখেন যার নাম রাখেন—

ردالشبهات عن فصل الخطاب فى اثبات تحريف كتاب رب الارباب

বাস্তবে তবরিযীর এ দু'টি গ্রন্থ শিয়াদের জন্যে পরিবর্তন আকীদা অস্বীকার করার কোন অবকাশ বাকী রাখেনি।

(৩) পূর্ববর্তী শিয়া আলেমগণের আকীদা তাই ছিল। কেবল চারজন আলেম এ ব্যাপারে মতভেদ করেছেন।

কোন শিয়া আলেমের জন্যে পরিবর্তন অস্বীকার করার অবকাশ আছে কি ?ঃ

পরিবর্তন সম্পর্কে ইমামগণের হাজারো রেওয়ায়েতের উপস্থিতি, এসব রেওয়ায়েত সম্পর্কে শীর্ষস্থানীয় আলেমগণের এই স্বীকারোক্তি যে, এগুলো মুতাওয়াতির, পরিস্কাররূপে পরিবর্তন জ্ঞাপন করে এবং পরিবর্তন হয়েছে বলেই পূর্ববর্তী আলেমগণের আকীদা ছিল, এসব বিষয় সত্বেও কোন আলেম ও ওয়াকিফহাল শিয়ার জন্যে পরিবর্তন অস্বীকার করার অবকাশ থাকে কি না, এখানে তাই প্রণিধানযোগ্য বিষয়। বলা বাহুল্য, এরূপ কোন অবকাশ নেই। হাঁ, তাকিয়্যার ভিত্তিতে অস্বীকার করা যায়; যেমন শিয়া রেওয়ায়েত অনুযায়ী ইমামগণ তাকিয়্যার ভিত্তিতে নিজেদের ইমামতও অস্বীকার করেছেন। তাই অনুমান এই যে, উপরোক্ত চারজন আলেম তাকিয়্যার ভিত্তিতেই পরিবর্তন অস্বীকার করেছেন।

শিয়া জগতে আল্লামা নূরী তবরিযীর স্থান ও মর্তবাঃ

আমরা এখানে পাঠকবর্গকে এ কথা বলে দেওয়াও সমীচীন মনে করি যে, ফছলুল খেতাবের গ্রন্থকার আল্লামা নূরী তবরিযী—যিনি কোরআন মজীদে সর্বপ্রকার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সপ্রমাণ করার জন্যে এ গ্রন্থ লিখেছেন—শিয়া জগতে তিনি অপরিসীম পবিত্রতা ও মাহাত্মের মর্যাদায় আসীন ছিলেন। ১৩২০ হিজরীতে তার ইন্তেকাল হলে তাকে নজফে আশরাফে হযরত আলী (রাঃ)-এর সমাধি প্রাচীরে দাফন করা হয়, যা শিয়াদের মতে ভূপৃষ্ঠের পবিত্রতম স্থান।

আল্লামা নূরী তার আমলে শিয়াদের একাধারে মুজাতাহিদে আযম ও মুহাদ্দিসে আযম ছিলেন। তার সংকলিত হাদীসের একটি গ্রন্থ হচ্ছে "মুস্তাদরাকুল ওছায়েল।" পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম রুহুল্লাহ খোমেনী তার الحكومة الاسلامية গ্রন্থে আপন মতবাদ ولاية فقيه প্রসঙ্গে এ গ্রন্থের বরাতও দিয়েছেন এবং সেখানে আল্লামা নূরীর নাম পূর্ণ শ্রদ্ধা সহকারে উল্লেখ করেছেন। অথচ তিনি তার কিতাব "ফছলুল খেতাব" সম্পর্কে অবশ্যই ওয়াকিফহাল আছেন এবং প্রত্যেক শিয়া আলেমই এটা জানে।

ফছলুল খেতার সম্পর্কে এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে, হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন এ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তখন ইরান ও ইরাকের শিয়া আলেমদের পক্ষ থেকে এর বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিবাদের ঝড় উঠে। কারণ, তারা পরিবর্তন আকীদা অস্বীকার করার নীতিতে বিশ্বাসী ছিল। তারা এ গ্রন্থের জওয়াবও লিখে প্রকাশ করে। আল্লামা· তবরিযী এর জওয়াবেও স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখেন যার নাম রাখেন— --- رد الشبهات عن فصل الخطاب

বাস্তবে তবরিযীর এ দু'টি গ্রন্থ শিয়াদের জন্যে পরিবর্তন আকীদা অস্বীকার করার কোন অবকাশ বাকী রাখেনি।

কোরআনের একটি সূরা যা বর্তমান কোরআনে নেইঃ

পরিবর্তনের বিষয়বস্তুর উপর লেখা এ পর্যন্তই শেষ করে দেওয়া হয়েছিল। এরপর আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমতে এ বিষয়বস্তু সম্পর্কেই এমন একটি বিষয় পেয়ে গেলাম, যাকে এ আলোচনার পরিশিষ্ট করা সমীচীন মনে হল।

এখন থেকে প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে ইরাকের আল্লামা সাইয়েদ মাহমুদ শুকরী আলূসী (রহঃ) "তুহফকায়ে ইছনা আশারিয়া " গ্রন্থের আরবীতে সারসংক্ষেপ লিখেছিলেন, যা مختصر التحفة الاثناعشريه নামে প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে মিসরের উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন আলেম শায়খ মহীউদ্দীন আল খতীব (যিনি কয়েক বছর পূর্বেই ওফাত পেয়েছেন এবং যার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা শিয়াবাদ প্রসঙ্গে অনেক কাজ নিয়েছেন) এর সম্পাদনা করেন এবং প্রান্তটীকা ও ভূমিকার সংযোজন সহকারে একে প্রকাশ করেন। এতে তিনি ইরানে লিখিত কোরআনের একটি পাণ্ডুলিপির কপি থেকে নেওয়া একটি সূরার (সূরা বেলায়েতের) ফটোও প্রকাশ করেন, যা বর্তমান কোরআনে নেই। এ সম্পর্কে তিনি লিখেনঃ

"প্রফেসর নলডিকি (NOELDEKE) তার HISTORY OF THE COPIES OF THE QURAN গ্রন্থে এ সূরাটি শিয়া সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ دبستان مذاهب (মুহসিন ফানী কাশ্মীরী কৃত ফারসী গ্রন্থ)-এর বরাত দিয়ে উদ্ধৃত করেছেন। এ ফারসী গ্রন্থের একাধিক সংস্করণ ইরানে প্রকাশিত হয়েছে। মিসরের একজন বড় আইন বিশেষজ্ঞ প্রফেসর মোহাম্মদ আলী সউদী খ্যাতনামা প্রাচ্য শিক্ষাবিশারদ ব্রাউনের (BROWN) কাছে ইরানে লিখিত কোরআনের একটি পাণ্ডুলিপি কপি দেখেছিলেন। তাতে এই সূরা বেলায়েতও ছিল। তিনি এর ফটো নিয়ে নেন, যা মিসরের সাময়িকী "আল ফাতাহ" ৮৪২ সংখ্যার নবম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল।"

শায়খ মহীউদ্দীন আল খতীব এরই প্রতিচ্ছবি তার গ্রন্থের ৩১ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করেছেন। আমরা তার ফটো পাঠকবর্গকে উৎসর্গ করছি। ছত্রের মধ্যস্থলে ফারসী অনুবাদও রয়েছে, যা খুব মিহিন কলমে লেখা। প্রতিচ্ছবিতে কতক শব্দ পরিস্কার নয়। এ সূরা সম্পর্কে এটাও উল্লেখযোগ্য যে, আল্লামা নূরী তবারিযী ও তার ফছলুল খেতাবে এ সূরার আলোচনা করেছেন এবং লিখেছেন যে, এটা সেই সকল সূরার একটি, যেগুলোকে কোরআন মজীদ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। (২২ পৃঃ)

সূরা বেলায়েতের ফটো দেখুন।

سورة الولاية سبع آيات

بسم الله الرحمن الرحيم

يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي وبالولي اللذين بعثناهما

يهديانكم إلى صراط مستقيم ○ نبي وولي بعضهما من بعض

وأنا العليم الخبير ○ إن الذين يوفون بعهد الله لهم جنات النعيم

والذين إذا تليت عليهم آياتنا كانوا بآياتنا مكذبين ○

إن لهم في جهنم مقاما عظيما إذا نودي لهم يوم القيامة أين

الظالمون المكذبون للمرسلين ○ ما خلفهم المرسلين إلا

بالحق وما كان الله ليظهرهم إلى أجل قريب ○ وسبح بحمد ربك

وعلي من الشاهدين ○

আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আকীদা ও মসআলা ঃ

এ পর্যন্ত এ পুস্তকে যা লিখা হয়েছে, আমার ধারণায় তা আহলে সুন্নতকে শিয়া মযহাব সম্পর্কে জ্ঞাত করানোর জন্যে অনেকটা যথেষ্ট। তবুও এখন আলোচনা শেষে শিয়াদের আরও দু'তিনটি মসআলাও পাঠকবর্গকে উৎসর্গ করা অতিরিক্ত জ্ঞান লাভের পক্ষে সহায়ক হবে।

হুবহু খৃষ্টানদের প্রায়শ্চিত্ত আকীদার অনুরূপ আকীদা ঃ

আল্লামা বাকের মজলিসী ইমাম জাফর ছাদেকের বিশেষ মুরিদ মুফাসসাল ইবনে ওমরের এক প্রশ্নের জওয়াবে তার এই এরশাদ উদ্ধৃত করেছেন ঃ

"হযরত ইমাম জাফর ছাদেক বললেন ঃ হে মুফাসসাল, রসূলে খোদা দোয়া করেছেন—"হে খোদা, আমার ভাই আলী ইবনে আবী তালেবের শিয়া এবং আমার সেই সন্তানদের শিয়া যারা আমার ভারপ্রাপ্ত—তাদের অগ্রপশ্চাৎ কিয়ামত দিবস পর্যন্ত সময়ের সকল গোনাহ্ আপনি আমার উপর চাপিয়ে দিন এবং শিয়াদের গোনাহের কারণে পয়গাম্বরগণের মধ্যে আমাকে অপমানিত করবেন না।" এ দোয়ার ফলস্বরূপ আল্লাহ্ তায়ালা সকল শিয়ার গোনাহ্ রসূলুল্লাহ্ (রাঃ)-এর উপর চাপিয়ে দিয়েছেন, অতঃপর সেই সকল গোনাহ্ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কারণে মার্জনা করেছেন। (হক্কুল এয়াকীন, ১৪৮ পৃঃ)

পাঠকবর্গ, ইনছাফ সহকারে (শিয়ারাও) চিন্তা করুন, এটা কি খৃষ্টানদের প্রায়শ্চিত্ত আকীদা থেকে কিছুটাও ভিন্ন?

এরপর এ রেওয়ায়েতেই আরও আছে—

মুফাসসাল প্রশ্ন করল ঃ যদি আপনাদের শিয়াদের মধ্য থেকে কেউ এই অবস্থায় মারা যায় যে, তার যিম্মায় কোন মুমিন ভাইএর (অর্থাৎ কোন শিয়ারই) কর্জ থাকে, তবে তার কি পরিণতি হবে? ইমাম জাফর ছাদেক বললেন ঃ যখন ইমাম মেহদী আত্মপ্রকাশ করবেন, তখন সর্বপ্রথম সারা বিশ্বে এই ঘোষণা করবেন যে, আমাদের শিয়াদের মধ্যে যদি কারও যিম্মায় কারও কর্জ থাকে, তবে সে আসুক এবং আমার কাছ থেকে উসল করুক। অতঃপর তিনি সকল কর্জদারদের কর্জ আদায় করবেন। (১৪৮ পৃঃ)

কারবালা কা'বা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঃ

এ গ্রন্থেই আছে ইমাম জাফর ছাদেক তার এই মুরিদ মুফাসসালকে ধর্মতত্ত্ব বলতে যেয়ে এরশাদ করেন ঃ

বাস্তব ঘটনা এই যে, ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশ একে অপরের উপর গর্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করল। তখন কা'বা মোয়াযযমা কারবালায়ে মোয়াল্লার মোকাবিলায় শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করল। আল্লাহ তাআলা কা'বাকে ওহী পাঠালেন যে, চুপ থাক এবং কারবালার মোকাবেলায় গৌরব ও প্রাধান্য দাবী করোনা।

এরপর রেওয়ায়েতে আল্লাহ তাআলা কারবালার এমন বৈশিষ্ট্য ও ফযিলত বর্ণনা করলেন, যার কারণে তার মর্তবা কা'বা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হল। (১৪৫ পৃঃ)

কতক চরম লজ্জাজনক মাসায়েল ঃ

শিয়াদের প্রামাণ্যতম গ্রন্থাবলীতে নিষ্পাপ ইমামগণ থেকে কতক এমন মসআলাও বর্ণনা করা হয়েছে, যা চরম নির্লজ্জ। এক্ষেত্রে অন্তর সাক্ষ্য দেয় যে, এই পবিত্র মনীষীগণ কখনও এরূপ কথা বলেননি। এসব কথা উদ্ধৃত করাও কষ্টদায়ক ও অসহনীয়। কিন্তু পাঠকবর্গের অবগতির জন্যে মনের উপর জোর দিয়ে এগুলোর মধ্য থেকে কেবল একটি মসআলা নমুনা হিসেবে এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। তাদের বিশুদ্ধতম গ্রন্থ আল জামিউল কাফীর দ্বিতীয় খণ্ড ফুরুয়ে কাফীতে পূর্ণ সনদ সহকারে ইমাম জাফর ছাদেকের এই উক্তি ও ফতোয়া রেওয়ায়েত করা হয়েছে ঃ

عن ابی عبد الله علیه السلام النظرالی عورة من لیس بمسلم مثل نظرك الی عورة الحمار

ইমাম জাফর ছাদেক থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, কোন অমুসলিম মহিলা অথবা পুরুষের লজ্জাস্থানের দিকে দৃষ্টিপাত করা এমনই, যেমন গাধার (অর্থাৎ কোন জন্তুর) লজ্জাস্থানের দিকে দৃষ্টিপাত করা। (উদ্দেশ্য এই যে, এরূপ দেখা কোন গোনাহ্ নয়।) (৬১ পৃঃ)

শিয়ারাও চিন্তা করুন, হযরত ইমাম জাফর ছাদেক তো একজন বুযুর্গ ব্যক্তি—কোন সুস্থ-স্বভাবসম্পন্ন ভদ্র মানুষ এমন নির্লজ্জ কথা মুখে আনতে পারে কি? তাও শরীয়তের মসআলা ও ফতোয়ার আকারে?

ফুরুয়ে কাফীর এ অধ্যায়ে এমনি ধরনের আরও কয়েকটি নির্লজ্জ ও অশ্লীল মসআলা নিষ্পাপ ইমামগণের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে রেওয়ায়েত করা হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, এগুলো সব এই বুযুর্গগণের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ। তারা এসব প্রলাপোক্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

মুতআ কেবল জায়েয ও হালালই নয়—নামায, রোযা ও হজ্ব থেকেও উত্তম এবাদত ঃ

মুতআ ইছনা আশারিয়া শিয়াদের একটি প্রসিদ্ধ মসআলা। কিন্তু খুব কম লোকই হয়তো জানে যে, ইছনা আশারী মযহাবে মুতআ কেবল জায়েয ও হালালই নয়; বরং উচ্চস্তরের এবাদত। এর পুরস্কার ও ছোয়াব নামায, রোযা ও হজ্বের মত এবাদতের তুলনায় বহুগুণ বেশী। নিঃসন্দেহে এটা শিয়া মযহাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য। আমাদের জানা মতে বিশ্বে এমন কোন দ্বিতীয় মযহাব নেই; যাতে এমন কোন কর্মকে এতদূর এবাদত ও মর্তবা বৃদ্ধির ওছিলা বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তাদের এক প্রামাণ্য তফসীর منہج الصادقین এর বরাত দিয়ে একটি রেওয়ায়েত পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, যার সারমর্ম ওই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি একবার মুতআ করে, সে ইমাম হাসানের মর্তবা পাবে। যে দু'বার করে, সে ইমাম হুসায়নের মর্তবা পাবে। যে তিনবার করে, সে আমিরুল মমিনীন আলীর মর্তবা পাবে। আর যে চারবার এই পূণ্য কাজ করে, সে আমার (অর্থাৎ রসূলে পাকের) মর্তবা পাবে। (নাউযুবিল্লাহ)

শিয়াদের কাছে মুতআ যে একটি উতকৃষ্ট স্তরের এবাদত, একথা জানার জন্যে একা এ শিয়া

রেওয়ায়েতটিই যথেষ্ট। তাদের কোন গ্রন্থে আমাদের নজরে পড়েনি যে, নামায, রোযা অথবা হজ্জ করলে কোন ব্যক্তি এই নিষ্পাপ ইমামগণ ও স্বয়ং রসূলে খোদা (সাঃ)-এর মর্তবায় অধিষ্ঠিত হতে পারে।

এরপর পাঠকবর্গ এ বিষয়বস্তু সম্পর্কে আরও দু'তিনটি রেওয়ায়েত দেখে নিন।

আল্লামা মজলিসীর বিভিন্ন গ্রন্থের বরাত দিয়ে অনেক রেওয়ায়েত পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ কথাও বলা হয়েছে যে, তিনি হিজরী দশম ও একাদশ শতাব্দীর বড় শিয়া মুজতাহিদ, মুহাদ্দিস ও মহান গ্রন্থকার। (তার জীবনী লেখকরা তার রচনাবলীর সংখ্যা ষাট বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে ২৫ খণ্ডে সমাপ্ত "বেহারুল আনওয়ার।" এছাড়া "হায়াতুল কুলূব", "জিলাউল উয়ূন", "যাদুল মায়াদ", "হক্কুল এয়াকীন" ইত্যাদিও তার মোটা গ্রন্থ। নিঃসন্দেহে তার এ সকল গ্রন্থ শিয়া মযহাব সম্পর্কে তার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের প্রমাণ।) তার অধিকাংশ রচনা ফারসী ভাষায়। এ কথাও পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রুহুল্লাহ্ খোমেনী তার "কাশফুল আসরার" গ্রন্থে ফারসী ভাষীদেরকে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের জন্যে তার গ্রন্থাবলী অধ্যয়ণের পরামর্শ দিয়েছেন এবং নিজের রচনাবলীতেও তার গ্রন্থাবলীর বরাত দিয়ে অনেক রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। মোটকথা, এই আল্লামা মজলিসীরই মুতআ সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা আছে। এটাও ফারসী ভাষায়। উদূর্তে এর অনুবাদ ("ওজালা হাসানা" নামে) এখন থেকে প্রায় সত্তর বছর পূর্বে এক শিয়া আলেম সাইয়েদ মোহাম্মদ জাফর কুদসী করেছিলেন। যা তখন থেকে সর্বাদাই ছাপা হচ্ছে। এক্ষণে আমাদের সামনে ইমামিয়্যা জেনারেল বুক এজেন্সী—লাহোর কর্তৃক প্রকাশিত এর সর্বশেষ সংস্করণ রয়েছে। আল্লামা মজলিসী এ পুস্তিকায় মুতআর রীতিনীতি, বিধানাবলী এবং প্রয়োজনীয় মাসায়েলও লিপিবদ্ধ করেছেন—ফজিলতও লিখেছেন। ভূমিকার পর প্রথমে এর ফযিলত ও অসামান্য ছোয়াবই বর্ণনা করেছেন। এ প্রসেঙ্গ সর্বপ্রথম নিম্নোক্ত দীর্ঘ হাদীসটি উদ্ধৃত করে একে "ছহীহ হাদীস" লিখেছেন। নিম্নে ওজালা হাসানা থেকে হাদীসের উর্দূ (বাংলা) তরজমাই লিখা হচ্ছে। দেখুনঃ

হযরত সালমান ফারেসী, মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ কিন্দী ও আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) ছহীহ্ হাদীস বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ যে ব্যক্তি জীবনে একবার মুতআ করবে, সে জান্নাতী। যখন কোন মহিলার সাথে মুতআ করার ইচ্ছায় কেউ বসে, তখন এক ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং যে পর্যন্ত এই মজলিস থেকে সে বাইরে না যায়, তার হেফাযত করে। তাদের উভয়ের পরস্পরে কথাবার্তা বলা তসবীহের মর্যাদা রাখে। যখন তারা একে অপরের হাত ধরে, তখন তাদের অঙ্গুলি থেকে তাদের গুনাহ টপকে পড়ে। যখন পুরুষ মহিলাকে চুম্বন করে, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক চুম্বনের বিনিময়ে তাদেরকে হজ্জ ও ওমরাহ্র ছোয়াব দান করেন। যখন তারা সহবাসে মশগুল থাকে, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক কামানন্দের বিনিময়ে তাদের অংশে পাহাড়সম ছোয়াব দান করেন। যখন সহবাসের পর গোসল করে, (এই শর্তে যে, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং মুতথা যে রসূলের সুন্নত, তা বিশ্বাস করে) তখন আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে উদ্দেশ করে বলেন, আমার এই বান্দাদেরকে দেখ, যার উঠেছে এবং এই বিশ্বাস সহকারে গোসল করছে যে, আমি তাদের প্রতিপালক। তোমরা সাক্ষী

থাক—আমি তাদের গোনাহ্ মাফ করে দিলাম। গোসলের সময় যে পানির ফোঁটা তাদের শরীর থেকে টপকে পড়ে, তার প্রত্যেকটির বিনিময়ে দশটি ছোয়াব দান, দশটি গোনাহ্ মাফ এবং তাদের মর্তব্য দশ সিড়ি করে উচ্চ করা হয়। রাবীগণ (সালমান ফারেসী প্রমুখ) বর্ণনা করনে, আমিরুল মুমিনীন আলী ইবনে আবী তালেব মুতআর ফযিলত শুনে আরয করলেন: হুযুর, যে ব্যক্তি এ পূণ্যকাজে চেষ্টা করে, তার জন্যে কি ছোয়াব? তিনি বললেন: যখন সহবাস সমাপ্ত করে গোসল করে, আল্লাহ তাআলা তাদের শরীর থেকে টপকে পড়া প্রতিটি ফোঁটা দিয়ে একজন ফেরেশতা সৃষ্টি করেন, যে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনায় মশগুল থাকে। এর ছোয়াব মুতআকারী পুরুষ ও মহিলা পায়। (১৪-১৬ পৃঃ)

এই দীর্ঘ হাদীসের পরে গ্রন্থকার এই সংক্ষিপ্ত হাদীসটি লিখেছেন:

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন—যে ব্যক্তি ঈমানদার মহিলার সাথে মুতআ করে, সে যেন সত্তর বার কা'বা গৃহের যিয়ারত করে। (১৬ পৃঃ)

এরপর আরও কয়েকটি হাদীস উল্লেখিত হয়েছে। সর্বশেষ হাদীসটি এই— যে ব্যক্তি এই পূণ্য কাজ (মুতআ) বেশী করবে, আল্লাহ তাআলা তার মুর্তবা উঁচু করবেন। এ ধরনের লোক বিদ্যুতের ন্যায় পুলসিরাত অতিক্রম করে যাবে। তাদের সঙ্গে সঙ্গে ফেরেশতাদের সত্তরটি কাতার থাকবে। দর্শকরা বলবে: তারা নৈকট্যশীল ফেরেশতা, না নবী ও রসূল? ফেরশতারা জওয়াব দিবে: এরা পয়গাম্বরের সুন্নত পালন করেছে (অর্থাৎ মুতআ করছে)। তারা বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করবে। হে আলী, মুমিন ভাইয়ের জন্যে যে চেষ্টা করবে, সে-ও তাদেরই মত ছোয়াব পাবে। (১৭ পৃঃ)

আল্লামা মজলিসী এসব শিয়া রেওয়ায়েতকে রসূলে পাক (সাঃ)-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে তার পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করেছেন। এগুলো থেকে পাঠকবর্গ বুঝে নিয়ে থাকবেন যে, শিয়া মযহাবে মুতআ নামায, রোযা, হজ্ব ইত্যাদি সকল এবাদত থেকে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম এবাদত।

মুতআ কি?

আমাদের অনুমান, পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই মুতআর স্বরূপ সম্পর্কে অবগত নন। তাই সংক্ষেপে আরয করা হচ্ছে। মুতআর মানে হচ্ছে কোন পুরুষের কোন স্বামীহীনা গায়র মাহরাম (যার সাথে বিবাহ চলে) নারীর সাথে এই মর্মে চুক্তিতে উপনীত হওয়া যে, আমি তোমাকে এই সময়কাল পর্যন্ত এই পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে ভোগ করব। এতে সমায়কাল নির্দিষ্ট হওয়া অর্থের পরিমাণ নির্দিষ্ট হওয়া এবং মুতআ (অর্থাৎ ভোগ করা) শব্দ ব্যবহার করা শর্তা নারী যায়। এই প্রস্তাব কবুল করে নিলেই মুতআর চুক্তি সম্পন্ন হয়ে যায়। নির্দিষ্ট সময় কালের ভিতরে উভয়েই সহবাস ও মঙ্গম করতে পারে। এতে সাক্ষী, কাযী, উকিল, ঘোষণা বরং তৃতীয় কোন ব্যক্তির অবহিত হওয়ারও প্রয়োজন নেই। সম্পূর্ণ সংগোপনেও এসবকিছু হতে পারে। (বেশীর ভাগ এমনিই হয়ে থাকে। والله اعلم) যে পুরুষ মুতআ করে, তার উপর মহিলার অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান তথা ভরণপোষণের কোন দায়িত্ব থাকে না। কেবল নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকই

পরিশোধ করতে হয়। নির্দিষ্ট সময় শেষ হয়ে গেলে মুতআও শেষ হয়ে যায়। খোমেনীর গ্রন্থের বরাত দিয়ে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, দেশপসারিণী, বাজারী বেশ্যা নারীদের সাথেও মুতআ করা যায় এবং তা কেবল ঘন্টা দু'ঘন্টার জন্যেও হতে পারে।

শিয়াদের নির্ভরযোগ্যতম গ্রন্থ আল জামেউল কাফীর শেষ খণ্ড কিতাবুর রওযায় ইমাম জাফর ছাদেকের একজন অকৃত্রিম মুরিদ মোহাম্মদ ইবনে মুসলিমের মুতআর ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। মুতআর স্বরূপ বুঝার ব্যাপারে এটা সহায়ক হতে পারে। তাই সংক্ষেপে উল্লেখ করা হচ্ছে।

স্বয়ং মোহাম্মদ ইবনে মুসলিম বর্ণনা করেনঃ আমি একটি স্বপ্ন দেখে তা হযরত ইমাম জাফর ছাদেকের খেদমতে আরয করলাম এবং ব্যাখ্যা চাইলাম। তিনি এর ব্যাখ্যা দিলেন যে, তুমি কোন মহিলার সাথে মুতআ করবে। তোমার স্ত্রী তা টের পাবে এবং তোমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। সে তোমার কাপড় ছিড়ে ফেলবে। এরপর মোহাম্মদ ইবনে মুসলিম বলেনঃ এটা ছিল জুমুআর দিন। সকালে হযরত ইমাম আমার স্বপ্নের এই ব্যাখ্যা বলেছিলেন। এরপর মূল রেওয়ায়েতের ভাষা পাঠ করুন।

فلماكان غداة الجمعة واناجالس بالباب ان مرت جارية فاعجبتنى فامرت غلامى فردها ثم ادخلها لذى فتمتعت بها فاحست بى وبها اهلى فدخلت علينا البيت فبادرت الجارية نحوالباب فبقيت انافمزقت على ثياباجددا كنت البسهاقى الاعياد ٥

অতঃপর সেই জুমুআরই দুপুরে এই ঘটনা ঘটল যে, আমি বাড়ীর দরজায় উপবিষ্ট ছিলাম। আমার সম্মুখ দিয়ে একটি বালিকা গমণ করল। সে আমার কাছে খুব ভাল লাগল। আমি আমার গোলামকে বললাম তাকে ডেকে আনতে। সে বালিকাকে নিয়ে এল এবং আমার কাছে পৌঁছিয়ে দিল। আমি তার সাথে মুতআ করলাম। আমার স্ত্রী কোনরূপে এটা টের পেয়ে গেল। সে হঠাৎ আমার কক্ষে প্রবেশ করল। বালিকাটি কালবিলম্ব না করে দরজার দিকে পালিয়ে গেল। আমি একা রয়ে গেলাম। আমার স্ত্রী আমার সেইসব কাপড় ছিঁড়ে টুকরা কুটরা করে ফেলল, সেগুলো আমি ঈদ উপলক্ষে পরিধাণ করতাম। (১৩৭ পৃঃ)

আমাদের ধারণা, মুতআর স্বরূপ বুঝার জন্যে একা এ রেওয়ায়েতটিই যথেষ্ট। এখানে প্রকৃত প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, এটা হচ্ছে সেই মুতআ, যার মর্তবা, পুরস্কার ও ছোয়াব উপরোক্ত রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত হয়েছে।

উপসংহার

একটি বিনয়াবনত ও আন্তরিক আবেদন

পুস্তকের "পূর্ব কথা"য় সবিস্তারে আরয করা হয়েছে যে, ইরানে আয়াতুল্লাহ্ খোমেনীর নেতৃত্বে বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পর থেকে পূর্ণ জোরেসোরে এবং পোপাগাণ্ডার সকল মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে একথা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, আয়াতুল্লাহ্ রুহুল্লাহ খোমেনীর সত্তার মধ্যে মুসলিম বিশ্ব এমন একজন আদর্শ পথপ্রথর্শক, নেতা ও ইমাম পেয়ে গেছে, যার জন্যে বহু শতাব্দী ধরে অপেক্ষা করা হচ্ছিল। তিনি ইসলামী রেনেসাঁর প্রতীক। তার বজ্রকঠোর আওয়াযে কুফরের প্রাসাদসমূহ থর থর করে কেঁপে উঠেছে। তার ব্যক্তিত্ব দ্বারা সমাজে আলেম ও ফকীহ্ শ্রেণীর নেতাসুলভ পদ বহাল হয়ে গেছে। পূর্ণ শক্তিতে এবং কোন রাখ্ঢাক ছাড়া একথাও বলা হচ্ছে যে, খোমেনী না ঐতিহ্যগত শিয়া, না ঐতিহ্যগত সুন্নী। বেশীর বেশী তার সম্পর্কে একথাই বলা যায় যে, তিনি ফিকাহ্ জাফরী অনুসরণ করেন (এবং এটা কোন আপত্তির কথা নয়)। নতুবা চিন্তা, মতবাদ, মেযাজ ও তরিকা, মূলনীতি ও আকায়েদের দিক দিয়ে তিনি ইসলাম এবং শুধু ইসলামের আহ্বায়ক। ইসলামী ঐক্য তার সর্ববৃহৎ স্বপ্ন। তিনি শিয়া-সুন্নী মতভে পছন্দ করেন না। তিনি খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রতি শ্রদ্ধাবান। যারা শিয়া-সুন্নী মতভেদ নিয়ে হৈ চৈ করে, তাদেরকে তিনি শয়তানী ও পৈশাচিক শক্তিসমূহের ক্রীড়নক মনে করেন। তার বিপ্লবের বিশ্বজোড়া শ্লোগানসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে— ثورة اسلامية لاشيعية ولاسنية (ইসলামী বিপ্লব—শিয়াও নয়, সুন্নীও নয়।) সুতরাং তার পরিচালিত বিপ্লব কেবল এবং কেবল "ইসলামী বিপ্লব"।

চিন্তা করুণ, একজন সাধারণ মুসলমান— যে খেমেনীর রচনাবলী স্বয়ং অধ্যয়ন করেনি, ইরানী বিপ্লবরে চিন্তাগত ভিত্তি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেনি, শিয়াবাদের সূচনা, ইতিহাস, চিন্তা ও আকায়েদ সম্পর্কে কিন্তু জানে না, ঈমানের স্বাদ, কোরআন-হাদীস ও ইসলামী মেযাজের গভীর ও সরাসরি মারেফাতও অর্জন করেনি, যা কেবল এসব গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিবর্গের কাছে প্রশিক্ষণ লাভের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে এবং যা ভুল বুঝাবুঝি, ভুল অনুমান ও প্রতারণাপূর্ণ শ্লোগানের শিকার হওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যাপারে সর্বাধিক কার্যকর হয়ে থাকে; অথচ আপন ধর্ম, আপন সভ্যতা ও আল্লাহর নামকে সমুন্নত দেখার অদম্য বাসনা রাখে; কিন্তু নিজের চারপাশে, মুসলিম বিশ্বের পরিস্থিতিতে সে কেবল নৈরাশ্যজনক দৃশ্যই অবলোকন করে, যা তার মনোবলকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়—এরূপ মুসলমানকে যদি আমরা দেখি যে সে ইরানী বিপ্লবের উপরে বর্ণিত পরিচিতি দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে এবং খোমেনী ও তার পরিচালিত বিপ্লবকে সমর্থন করছে, তবে আমার মতে এতে বিস্মিত হওয়ার ও ভর্ৎসনা করার কিছু নেই। বরং আমাদের মতে এই সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও সরলপ্রাণ ভাইটি সহানুভূতি পাওয়ার যোগ্য।

আলোচ্য পুস্তকে আমি প্রয়াস পেয়েছি যাতে এমন সকল মুসলমানের সামনে—

(১) ইরানী বিপ্লবের বিশেষ বিশেষ চিন্তাগত ভিত্তি ফুটে উঠে;
(২) খোমেনীর চিন্তাধারা, মতবাদ এবং তার মত ও পথ তারই গ্রন্থাবলী থেকে সামনে এসে যায় এবং
(৩) শিয়াবাদের সূচনার ইতিহাস এবং তার মৌলিক নীতি ও আকীদা শিয়া মযহাবেরই প্রামাণ্যতম উৎসসমূহের আলোকে পাঠকবর্গ দেখে নেন।
এর ফলশ্রুতিতে যাতে এ তিনটি বিষয়বস্তু সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান সহকারে মতামত স্থির করা যায়। বিগত পৃষ্ঠাসমূহে আপনি যা পাঠ করেছেন, তার সারমর্ম কয়েক লাইনে এইঃ
(১) ইরানী বিপ্লব খোমেনীর পেশ করা ولاية فقيه এর ভিত্তির উপর কায়েম। ولاية فقيه দর্শনটি ইমাম মেহেদীর অন্তর্ধান আকিদার উপর ভিত্তিশীল। ইমাম মেহদীর অন্তর্ধানের কাহিনীটি কেবল ঐতিহাসিক দিক দিয়েই বাজে নয়; বরং এটা মেনে নেওয়ার অর্থ হচ্ছে ইছনা আশারী ইমামী মযহাবের ভিত্তি ইমামত ও ইমামগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। এটা তওহীদ ও খতমে নবুওয়ত আকীদার সম্পূর্ণ বিপরীত। এ প্রসঙ্গে একথাও লক্ষ্যণীয় যে, খোমেনীর মতে ইমাম মেহদীর আত্মপ্রকাশ পর্যন্ত ইসলামী হুকুমত এই ولاية فقيه দর্শন অনুযায়ী কায়েম করা যায়। এছাড়া এর কল্পনাও করা যায় না। এটা তার الحكومة الاسلامية গ্রন্থে সবিস্তারে লেখা হয়েছে।

(২) আপনি খোমেনীর চিন্তাধারা ও মতবাদ এই দেখেছেন যে,

(ক) ইমামগণ সম্পর্কে তিনি সেই মনোভাবই রাখেন, যা শিয়া মযহাবের পূর্ববর্তী আলেম ও গ্রন্থকারগণ রাখতেন। তিনি পরিস্কার ভাষায় ইমামগণকে নবী ও রসূলগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাব্যস্ত করেন; বরং তাদের জন্যে ঐশ্বরিক গুণাবলীও সপ্রমাণ করেন।
(খ) খোমেনী ছাহাবায়ে কেরাম বিশেষতঃ খলিফাত্রয় সম্পর্কে চরম জঘন্য ও নাপাক অভিমত রাখেন। তিনি তাঁদের ঈমান ও ইসলাম অস্বীকার করেন এবং তাদের আলোচনাহীন চরিত্র, স্বার্থপর, ক্ষমতালিপ্সু কুচক্রী ও রাজনৈতিক দুরভিসন্ধিধারী মুনাফিকদের একটি গ্রুপরূপে করেন। তাঁর প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা রাখার অপরাধেই খোমেনী পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সুন্নীদেরকে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধী, আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাসঘাতক ও জাহান্নামী সাব্যস্ত করেন। মোটকথা, মৌলিক গুরুত্ববাহী এ দু'টি প্রশ্নে তিনি তার পূর্বসুরী ইছনা আশারী আলেমগণ থেকে তার সেই গ্রন্থসমূহেও বিন্দুমাত্র ভিন্ন দৃষ্টিগোচর হন না, যেগুলো মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে; অথচ মসুলিম বিশ্বের নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক হচ্ছে সুন্নী وماتخفى صدورهم اكبر

(৩) ইরানী বিপ্লবের ভিত্তি শিয়া মযহাবের কয়েকটি মৌলিক আকায়েদের উপর ভিত্তিশীল মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে এবং ইমাম খোমেনী খাঁটি ইছনা আশারী ইমামী শিয়া মযহাবের একজন দৃঢ়বিশ্বাসী আলেম ও আহবায়ক—এসব বিষয় জানার পর এটা জানা জরুরী যে, এই ইছনা আশারী ঈমামী মযহাব কখন এবং কিরূপে অস্তিত্ব লাভ করল? এর বুনিয়াদী নীতি ও আকায়েদ কি? এটা জানা হয়ে গেলে এর আলোকে আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি স্বয়ং এ সম্পর্কে স্বাধীন মতামত কায়েম করতে পারবে যে, এসব আকীদা ও মতবাদের বাহক ব্যক্তি এবং এগুলোর উপর ভিত্তিশীল বিপ্লব ও বিপ্লবের দাওয়াতের কতটুকু সম্পর্ক রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আনীত ইসলামের সাথে স্বীকার করা যায়।সে মতে এ প্রয়োজনের তাগিদেই আমি

এ মযহাবের প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ উৎস নতুনভাবে অধ্যয়ন করেছি। এ অধ্যয়নের কেবল সারসংক্ষেপই এ পুস্তকে পেশ করা সম্ভবপর হয়েছে। আপনি এতে দেখেছেন যে,

(ক) শিয়া ইসলামের অভ্যন্তর থেকে ধ্বংসকারিতা এবং মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টি করার জন্যে ইহুদীবাদ ও অগ্নিবাদের অভিন্ন প্রচেষ্টার মাধ্যমে যখন অস্তিত্ব লাভ করেছিল, যখন এই উভয় শক্তি গায়ের জোরে এর বিদ্যুৎবেগে ছড়িয়ে পড়া দাওয়াতকে স্তব্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। এ কারণেই শিয়াবাদের দৈর্ঘ্য-প্রস্থের সূতা পোলোস আবিষ্কৃত খৃষ্টবাদের দৈর্ঘ্য-প্রস্থের সূতার সাথে অনেকটা মিল রাখে। পোলোস খৃষ্টান হয়ে ভিতর থেকে খৃষ্টবাদে পরিবর্তন সাধন এবং হযরত ইসা (আঃ)-এর আনীত সত্য ধর্মের ধ্বংস সাধন করার সকল প্রচেষ্টা চালিয়েছিল, যার ফলশ্রুতি বর্তমান খৃষ্টধর্ম।

(খ) শিয়াবাদ বিশেষতঃ ইছনা আশারী মাযহাবের বুনিয়াদী আকীদা ইমামত। এতটুকু কথা এতটুকু অস্পষ্টতা সহকারে সাধারণভাবে আমরা সুন্নীরা জানি। কিন্তু ইমামত পদের যে স্বরূপ, ইমামগণের যে মর্তবা এবং তাদের ক্ষমতার যে আওতা আপনি এ পুস্তকে দেখেছেন, তাতে ইমামতের একটি সম্পূর্ণ নতুন চিন্তা সামনে আসে, যার সারসংক্ষেপ এই যে, ইমামত উপাস্যতা ও নবুওয়তের একটি মিশ্রণ এবং ইমামগণ ঐশ্বরিক গুণাবলী ক্ষমতা এবং নবুওয়তের মর্যাদা উভয়টির বাহক; অর্থাৎ ইমামত আকীদার আঘাত সরাসরি তওহীদ ও খতমে নবুওয়ত আকীদার উপর পতিত হয়।

এরপর আপনি বিগত পৃষ্ঠাসমূহে ইছনা আশারী মযহাবের আরও কতিপয় আকীদা ও মসআলা দেখেছেন, যা প্রকৃতপক্ষে ইমামত আকীদারই অন্যতম অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি। এগুলোর মধ্যে তালিকার শীর্ষের রয়েছে কোরআনে পরিবর্তনের আকীদা, সকল ছাহাবায়ে কেরাম, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্রাত্মা পত্নীগণ ও বিশেষতঃ খলিফাত্রয়ের উদ্দেশ্যে গালিগালাজ এবং তাদেরকে মুনাফিক, কাফের, যিনদীক ও মুরতাদ বলে ফতোয়া, যা কোন ঘৃণ্যতম কাফের ও যিনদীক সম্পর্কেই প্রযোজ্য হতে পারে।

এ প্রসঙ্গেই আপনি ইছনা আশারী মযহাবের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি 'কিতমান' ও "তাকিয়্যা" সম্পর্কিত কতিপয় রেওয়ায়েত প্রত্যক্ষ করেছেন, যা ইসলামকে এমন এক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার আকারে পেশ করে, যে তার প্রত্যেক অনুসারীকে ঘৃণ্য ধরনের নিফাক, কপটতা, প্রতারণা, ভীরুতা ও ধূর্ততা শিক্ষা দেয়।

এরপর ইমামত আকীদারই অন্যতম অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি একটি গুরুত্বপূর্ণ আকীদা—রাজআত আকীদা সম্পর্কে আপনি পাঠ করেছেন। চিন্তা করুন, ইসলামী আকীদার সাথে এর কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় কি?

এছাড়া ইমাম মেহ্‌দীর জন্ম, অন্তর্ধান, অতঃপর আত্মপ্রকাশ সম্পর্কে আপনি এমন পৌরাণিক কাহিনীও পাঠ করেছেন, যার ফলে মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রদত্ত স্বচ্ছ, বিবেক ও স্বভাবসিদ্ধ এবং পরিমার্জিত ইসলামের জায়গায় এক অদ্ভুত, অত্যাশ্চর্য ও তেলেসমাতী ধর্ম দৃষ্টির সামনে আসে, যা কুসংস্কার, বাজে মনগড়া কাহিনী এবং আদি অন্তহীন রেওয়ায়েত দ্বারা গঠিত অন্য কোন পৌরাণিক ধর্মের চেয়ে কম নয়। অতঃপর আপনি ইছনা আশারী মযহাবের আরও কিছু আকীদা ও মসআলা প্রসঙ্গে কতক নির্লজ্জ মসআলা এবং মুতআর বিবরণ পাঠ করেছেন।

এগুলো পাঠ করা আপনার সুরুচির উপর নিশ্চয়ই দুঃসহ বোঝা হয়ে থাকবে এবং এগুলো লিখতে যেয়ে আমার কলমাও বারবার থেমে গেছে। কিন্তু অবশেষে ইছনা আশারী মযহাবের পরিচিতিতে এটি ছাড়া বিরাট ত্রুটি থেকে যাবে—একথা চিন্তা করে বাধ্য হয়ে তা লিখতে হয়েছে।

এখন আমি আমার সকল ভাই ও প্রিয়জনের কাছে— তারা পৃথিবীর যেকোন অংশেই থাকুক না কেন এবং যে কোন স্তর অথবা চিন্তাধারার সাথে তাদের সম্পর্ক থাকুক না কেন—খাঁটি আল্লাহর ওয়াস্তে, আন্তরিকভাবে সবিনয়ে আরয করছি যে, ইরানী বিপ্লব ও তার নেতা আয়াতুল্লাহ্ রুহুল্লাহ্ খোমেনীর চিন্তাধারা ও মযহাব সম্পর্কে উপরোক্ত তথাবলী জেনে নেওয়ার পর আপনারা এ প্রশ্নে নতুনভাবে চিন্তাভাবনা করুন। বাস্তব তথ্যাবলী বিস্তারিত জানার পূর্বের প্রশ্নের যে প্রকার থাকে, বিস্তারিত জেনে নেওয়ার পর তা বদলে যায়। আমার সে সকল ভাই বিশেষতঃ মুসলিম উম্মাহ্র যে সকল প্রিয় যুবক দীর্ঘদিনের অকর্মন্যতা ও অচলাবস্থার কারণে অতিষ্ঠ হয়ে গেছে এবং ইসলাম বিরোধী শক্তিসমূহের অবমাননা ও ইসলামকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখার জন্যে উদগ্রীব, তারা কেবল ইসলামী বিজয়ের আশায় ইরানী বিপ্লব ও তার নেতা খোমেনীর অভ্যর্থনা, উষ্ণ সমর্থন ও ভালবাসা সহকারে করেছিল, আমার বিশ্বাস, এখন তারা নিজেদের এই আচরণ ও কর্মপন্থা একজন সত্যিকার খোদাভক্ত মুসলমানের ন্যায় পুনর্বিবিচনা করে দেখবে।

নিঃসন্দেহে এ ব্যাপারে সেই সকল দল, সংগঠন ও পত্রপত্রিকার দায়িত্ব সমধিক, যাদের তরফ থেকে এ ব্যাপারে বাস্তব তথ্যাবলী সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই ভুল হয়ে গেছে। আশা করি এ ভুল সংশোধন করার এবং মুসলিম জনগণের উপর এর সম্ভাব্য কুপ্রভাব দূরীকরণের চেষ্টায় তারা ত্রুটি করবেন না।

কোরআন মজীদের একেবারে প্রারম্ভে এরপরেও স্থানে স্থানে ভুল ও পতিত দু'টি চরিত্রের উল্লেখ আমাদের পথ প্রদর্শন ও শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি চরিত্র ইবলিসের। সে-ও একটি ভ্রান্ত কাজ করে এবং আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা করে। এরপর আল্লাহর পক্ষ থেকে হুশিয়ারী ও কৈফিয়ত চাওয়ার পরও সে ভুল স্বীকার করেনি এবং তওবা ও এস্তেগফারের মাধ্যমে তা শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করেনি। বরং সে ভিন্ন অর্থ ও কারণ বর্ণনা করে এ ভুলকে বিশুদ্ধ প্রমাণ করার চেষ্টা করে। এর বিপরীতে দ্বিতীয় চরিত্র আমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)-এর উল্লেখ করা হয়েছে। তার তরফ থেকেও একটি ভুল এবং বাহ্যতঃ আল্লাহর অবাধ্যতা হয়ে যায়। কিন্তু যখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ভুলের জন্যে তাকে সতর্ক করা হয়, তখন তিনি নিজের ভুলের ভিন্ন কোন অর্থ বর্ণনা করেননি এবং আপন ত্রুটি স্বীকার করে আরয করেনঃ

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ (হে

আমাদের রব, আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি। যদি আপনি ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি রহম না করেন, তবে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।) এরপর কোরআন মজীদে উভয়ের সাথে আল্লাহ তাআলার ব্যবহার এবং পরিণতিও উল্লেখ করা

হয়েছে।

মোটকথা, আমাদের যে সকল ভইয়ের তরফ থেকে খোমেনীর ব্যাপারে ভুল হয়ে গেছে (যা নিশ্চিতঃই মারাত্মক ভুল), আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে সাইয়েদুনা আদম (আঃ)-এর সুন্নত অনুসরণের তওফীক দান করুন, যাতে তারা রবে করীমের মাগফেরাত, রহমত ও জান্নাতের যোগ্য হয়। আল্লাহ্ তাআলা এ অক্ষমকেও সদাসর্বদা নিজের ভুল ভ্রান্তির অনুভূতি, স্বীকারোক্তি এবং তওবা ও এস্তেগফারের তওফীক দান করুন।

ويتوب الله على من تاب

ওলামায়ে কেরামের খেদমতে—

এ পুস্তকে আপনারা ইছনা আশারিয়া শিয়াদের প্রামাণ্যতম গ্রন্থাবলী এবং তাদের স্বীকৃত আলেম ও মুজতাহিদগণের সুস্পষ্ট বর্ণনার আলোকে দেখেছেন যে, তাদের মৌলিক আকীদার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ইমামতের স্বরূপ কি, আরও লক্ষ্য করেছেন যে, তাদের সেই আকীদা অনুযায়ী ইমামতের মর্তবা নবুওয়াতের উপরে এবং ইমামগণের মর্যাদা ও স্থান নবী ও রসূলগণেরও উর্ধ্বে। তারা ঐশ্বরিক গুণাবলী এবং ক্ষমতারও বাহক। আরও দেখেছেন যে, রসূলুল্লাহ্র প্রথম তিন খলিফা ও তাঁদের সহকর্মী সকল প্রধান প্রধান ছাহাবী মুনাফিক, আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাসঘাতক, জাহান্নামী ও অভিশপ্ত এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা ও হযরত হাফছা (রাঃ) মুনাফিকা ছিলেন। তাঁরা বিষ প্রয়োগে হুযুরে আকরাম (সাঃ)-কে খতম করেছেন। এছাড়া আরও বলা হয়েছে যে, কোরআন মজীদেও পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত ইছনা আশারিয়াদের আরও যে সকল আকীদা আপনাদের সামনে এসেছে, আশা করি এরপর এ মযহাবের ও তার অনুসারীদের ইমান-আকীদা তথা ধর্মমতের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে আপনারা কোরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে অকাট্যরূপে ফয়সালা করতে পারবেন। আপনারা দীনের রক্ষক। বক্রতা ও পথভ্রস্টা থেকে উম্মতকে হেফাযত করা আপনাদের কর্তব্য।

والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

মোহাম্মদ মনযূর নো'মানী
(আফাল্লাহু আনহু)